কিশোরগঞ্জের লোকসাহিত্য

তৌহিদা জেসমিন শম্পা

401852

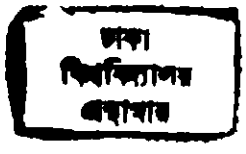

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য
উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

জুন, ২০০৪ ইং

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪২০২; ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৬১৫৫৮৩
ই-মেইল bangla@du.bangla.net

Department of Bangla
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Call: 9661900-59/4202; Fax: 880-2-8615583
E-mail: bangla@du.bangla.net

Date:
২৩/০৬/২০০৪

তত্ত্বাবধায়কের
প্রত্যয়ন পত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এম.ফিল গবেষক তৌহিদা জেসমিন শম্পা আমার তত্ত্বাবধানে 'কিশোরগঞ্জের লোকসাহিত্য' শিরোনামায় অভিসন্দর্ভ প্রস্তুত করে এম,ফিল ডিগ্রির জন্য যথা নিয়মে জমা দিয়েছেন। তাঁর রেজিস্ট্রেশন নম্বর-২১/৯৭-৯৮ এবং যোগদানের তারিখ ১৮-১১-৯৯।

401852

অভিসন্দর্ভটি গবেষকের জ্ঞানবুদ্ধিপ্রসূত রচনা এবং এটি অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বা গবেষণা-প্রতিষ্ঠানে উপস্থাপিত হয় নি এবং এর অংশ বিশেষ কোথায়ও ছাপা হয় নি।

আহমদ কবির

আহমদ কবির
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এবং
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক।

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গ কথা

১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষে অধ্যাপক আহমদ কবিরের তত্ত্বাবধানে এম.ফিল.কোর্সে ভর্তি হই। আমার অভিসন্দর্ভের শিরোনাম 'কিশোরগঞ্জের লোকসাহিত্য'। অধ্যাপক আহমদ কবির এবং ডক্টর ওয়াকিল আহমদের কাছে প্রথম পর্বের কোর্সসমূহ অধ্যয়নের পর গবেষণার কাজ শুরু করি। কর্মজীবনের বিবিধ ব্যস্ততার কারণে আমি যথাসময়ে অভিসন্দর্ভের কাজ সমাপ্ত করতে পারিনি। তাই ২০০৪ সালে আমি এই অভিসন্দর্ভ পরীক্ষার জন্য উপস্থাপন করছি।

বর্তমান অভিসন্দর্ভের সামগ্রিক পরিকল্পনা-প্রণয়নে ও রূপরেখা নির্মাণে আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক আহমদ কবিরের নিরন্তর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার কথা আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ, অনাবিল আন্তরিকতা এবং অর্থবহ নির্দেশনা আমার অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হতে অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে। গবেষণাকালে নানা পর্যায়ে প্রাজ্ঞ পরামর্শ ও মূল্যবান অভিমত দিয়ে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর ওয়াকিল আহমদ আমাকে গভীর কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

401852

গবেষণার কাজে আমি প্রধানত ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয় গ্রন্থাগার এবং বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এ সূত্রে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। গবেষণাকালে বাংলা একাডেমীর ফোকলোর উপবিভাগের সহপরিচালক জনাব মোহাম্মদ ইসহাক আলী ও সহপরিচালক জনাব শাহিদা খাতুন নানাভাবে আমাকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন।এতদসঙ্গে ক্যাটালগার জনাব আব্দুর রশীদের সহায়তার কথাও বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
১. প্রথম অধ্যায়	
ভূমিকা	১ - ২
২. দ্বিতীয় অধ্যায়	
কিশোরগঞ্জের লোকসাহিত্য সৃষ্টির পটভূমি	৩ - ১২
৩. তৃতীয় অধ্যায়	
কিশোরগঞ্জের লোকসাহিত্যের নানাদিক	১৩ - ৭৮
৪. চতুর্থ অধ্যায়	
কিশোরগঞ্জের গীতিকাসমূহের বিশিষ্টতা	৭৯ - ৯৩
৫. পঞ্চম অধ্যায়	
গীতিকার সাহিত্যিক মূল্যায়ন	৯৪ - ১১১
৬. ষষ্ঠ অধ্যায়	
লোকসাহিত্যের অন্যান্য ধারার সাহিত্যিক মূল্য	১১২ - ১২০
৭. উপসংহার	১২১ - ১২২
৮. গ্রন্থপঞ্জি	১২৩ - ১২৪

Dhaka University Institutional Repository

১. ভূমিকা

লোকসাহিত্য বাংলা সাহিত্যের একটি শাখা। বৈচিত্র্য-ব্যাপকতায় এবং জীবনের সঙ্গে একাত্মতায় উজ্জ্বল নিদর্শন হিসাবে তা সমাদৃত।সাধারণভাবে লোকসাহিত্য বলতে জন-মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত সাহিত্যকেই বুঝিয়ে থাকে। অর্থাৎ কোন সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠীর অলিখিত সাহিত্যই লোকসাহিত্য। সুপ্রাচীন কাল থেকে লোকসাহিত্যের বৈচিত্র্যপূর্ণ সৃষ্টি লোকমুখে প্রচলিত হয়ে আসছে এবং পুরাতন সৃষ্টি হলেও তা আধুনিক মানবসমাজে সমাদৃত হচ্ছে। লোকসাহিত্য একটি সমগ্র জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দ-বেদনাকে মূর্ত করে। লোকসাহিত্যের রচয়িতাগণ আধুনিক জীবনের জটিল ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত না হওয়ায় তাদের সাহিত্যে সমাজের যে চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে তা তুলনামূলকভাবে স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকসাহিত্যের পরিবর্তন ঘটলেও তা বাঙালির অতীত জীবনের রূপটি বহন করে নিয়ে এসেছে।

বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি জেলায় প্রচলিত লোকাচার ও আবহমান সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে জন্ম নিয়েছে একটি মৌখিক সাহিত্য,সৃষ্টিশীল কথা কাব্যের এক লৌকিক সহিত্যধারা।সাধারণ মানুষের সুকুমার হৃদয়বৃত্তির এই সমৃদ্ধ সমাহার বিভিন্ন জেলার বৈচিত্র্যময়তাকে ধারণ করে আছে। কিশোরগঞ্জ জেলার লোকসাহিত্যের ভাণ্ডার বেশ সমৃদ্ধ। ব্রহ্মপুত্র নদ বৃহত্তম ময়মনসিংহ জেলাকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছে।পশ্চিম ময়মনসিংহ ও পূর্ব ময়মনসিংহ। ব্রহ্মপুত্র নদ বিধৌত এই পূর্ব ময়মনসিংহে কিশোরগঞ্জ জেলার অবস্থান। কিশোরগঞ্জ জেলা যথার্থ নদীমাতৃক এলাকা।বিভিন্ন নদ-নদী,বিল-হাওর প্লাবিত কিশোরগঞ্জের ভাটি অঞ্চলে বাংলার শ্রেষ্ঠ লোকসাহিত্যগুলি বিকশিত হয়েছিল।

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'মৈমনসিংহ গীতিকা' বাংলা লোকসাহিত্যের এক অনন্য দলিল।'মৈমনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা 'র অধিকাংশ কাহিনীই কিশোরগঞ্জ জেলার পটভূমিতে রচিত। এর মধ্যে 'চন্দ্রাবতী','মলুয়া','দেওয়ান ইসাখাঁ মসনদালি','ফিরোজ খাঁ দেওয়ান','শ্যাম রায়ের পালা' ইত্যাদির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কবি চন্দ্রাবতী কেবল কিশোরগঞ্জ জেলার নয়,তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি। কিশোরগঞ্জ জেলার সদর থানার মাইজখাপন ইউনিয়নের পাতুয়াইর গ্রামে কবি চন্দ্রাবতী জন্মগ্রহন করেছিলেন। বাংলার আদি কবি চন্দ্রাবতীর জন্মস্থান কিশোরগঞ্জ এ কথা মনে করে কিশোরগঞ্জবাসীরা আজও গৌরববোধ করেন। কবি চন্দ্রাবতীর ব্যক্তি জীবনকাহিনী ছিল করুণ-বিষাদাত্মক। তাঁর ব্যক্তি জীবনকাহিনীকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে 'চন্দ্রাবতী' গীতিকাটি।

কিশোরগঞ্জ শহরের অদূরে করিমগঞ্জ থানায় জঙ্গলবাড়ী নামক স্থানটি বাংলার বারো ভূঁইয়াদের এক বীর সেনাপতি ঈশা খাঁর স্মৃতি বিজড়িত। জঙ্গলবাড়ীর বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে লোকমুখে সৃষ্টি হয়েছে বেশ কিছু গীতিকা, কথা-কাহিনী বা কিংবদন্তির।এর মধ্যে 'দেওয়ান ইসা খাঁ মসনদালি','ফিরোজ খাঁ দেওয়ান'উল্লেখযোগ্য।

কিশোরগঞ্জ জেলার লোকসংগীত বেশ সমৃদ্ধ।বিশেষ করে এই অঞ্চলের ভটিয়ালি গান কিশোরগঞ্জের আঞ্চলিক সীমাকে অতিক্রম করে হয়ে গেছে সার্বজনীন। এই জেলার অধিকাংশ এলাকাই নিম্নভূমি।খাল-বিল,হাওর ও বিভিন্ন নদ-নদী বিধৌত এই এলাকার মানুষের জীবন-যাত্রা নদীকেন্দ্রিক।এই নদীকেন্দ্রিক মানুষের মুখের গান ভাটিয়ালি গান নামে পরিচিত।কিশোরগঞ্জের জারিগান,সারিগান,আঞ্চলিক গীত,মেয়েলি

Dhaka University Institutional Repository

গীত ইত্যাদিও বেশ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া এই এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে নানা রকম কিস্‌সা-কাহিনী,কিংবদন্তি,ছড়া,ধাঁধাঁ,প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদি।

বিপুল সাহিত্য সম্পদে সমৃদ্ধ কিশোরগঞ্জের এই সাহিত্য সম্পদ আজ প্রায় অবলুপ্তির পথে। অথচ এই সাহিত্যসম্ভার আমাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীতের সুষমামন্ডিত এক অমূল্য দলিল। আধুনিক প্রজন্ম এবং আগত কালের বাংলা ভাষাভাষীর কাছে এই সকল সাহিত্যসম্পদেও সৃষ্টির নান্দনিকতা , সুষমা ও স্বরূপ তুলে ধরার কাজটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কিশোরগঞ্জের লোকসাহিত্য বাংলার শেকড় সন্ধানী মানুষের সামনে খুলে দেয় আমাদের বিস্মৃত ঐতিহ্যের এক সমৃদ্ধ দ্বার। কিশোরগঞ্জের লোকসাহিত্য তাই উচ্চতর গবেষণার দাবী রাখে।

আমার গবেষণা কর্মটিকে সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এর প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে ভূমিকা। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে কিশোরগঞ্জে লোকসাহিত্য সৃষ্টির পটভূমি।' মৈমনসিংহ গীতিকার' কাহিনী সমূহের পটভূমি বৃহত্তর ময়মনসিংহের সর্বত্র জন্মলাভ না করে কেবলমাত্র একটি বিশেষ অঞ্চলে বিকশিত হওয়ার পশ্চাতে অবশ্যই কারণ থাকতে পারে।রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত অবস্থা কোন এলাকার সাহিত্য সৃষ্টির পেছনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। তাই এই অধ্যায়ে ঐতিহাসিক , রাজনৈতিক , ভৌগোলিক , নৃতাত্ত্বিক , সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে লোকসাহিত্য সৃষ্টির প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত' কিশোরগঞ্জের লোকসাহিত্যের নানা দিক'- মূলত সংগ্রহ বা সংকলন। এখানে কিশোরগঞ্জে প্রাপ্ত লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে গীতিকা,লোকসংগীত,ছড়া,ধাঁধা,প্রবাদ-প্রবচন,লোক কাহিনী ও কিংবদন্তি। দীনেশচন্দ্র সেনের 'মৈমনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা'(২য় খণ্ড ও ৩য় খণ্ড) এবং বদিউজ্জামানের 'মোমেনশাহী গীতিকা'য় সঙ্কলিত গীতিকাসমূহ থেকে কেবলমাত্র কিশোরগঞ্জের প্রেক্ষাপটে রচিত গীতিকাসমূহের কাহিনীসংক্ষেপ বর্ণনা করা হয়েছে । লোকসংগীত ও ছড়াগুলিকে শ্রেণীবিন্যাস করে সেই শ্রেণীবিন্যাসের আলোকে এদের পরিচয় প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে। ধাঁধা এবং প্রবাদ-প্রবচনগুলি বিভিন্ন তথ্য,লোকমুখে প্রাপ্ত এবং সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে সংগ্রহ করা হয়েছে। লোককাহিনীগুলিও লোকমুখ থেকে প্রাপ্ত। তবে এই কাহিনীগুলি ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকীর 'কিশোরগঞ্জের লোক-কাহিনী'(২য় খণ্ড) গ্রন্থেও আছে। এর মধ্যে 'পাঁচ তোলা কন্যা' রূপকথার এই গল্পটি উক্ত গ্রন্থ সংগ্রহ করা হয়েছে। অসংখ্য কিস্‌সা-কাহিনী এখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এর মধ্যে থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর মাত্র কয়েকটি কাহিনী এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। কিংবদন্তিগুলি কিশোরগঞ্জের বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক জনাব মোশাররফ হোসেন শাজাহানের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

চতুর্থ এবং পঞ্চম অধ্যায়ে অভিসন্দর্ভে উল্লেখিত গীতিকাসমূহের ভিত্তিতে কিশোরগঞ্জের গীতিকাসমূহের সামগ্রিক রূপ, এর বিশিষ্টতা ও সাহিত্যিক মূল্য নিরূপণ করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখা যেমন-লোকসংগীত,ছড়া,ধাঁধা,প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদির সাহিত্যিক মূল্য নির্ণয় করা হয়েছে এবং সপ্তম অধ্যায়ে রয়েছে উপসংহার।

Dhaka University Institutional Repository

২. কিশোরগঞ্জের লোকসাহিত্য সৃষ্টির পটভূমি

আবহমান কাল থেকে বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি জেলার সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে গড়ে উঠেছে একটি মৌখিক সাহিত্য। এই সাহিত্যগুলিই বিভিন্ন জেলার লোকসাহিত্য হিসাবে স্বীকৃত। ব্রহ্মপুত্র নদ দ্বারা বিভক্ত সাবেক বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার পূর্বাংশে কিশোরগঞ্জ জেলা অবস্থিত। ব্রহ্মপুত্রের পূর্বতীর ও মেঘনার পশ্চিমতীরের সমৃদ্ধ জনপদ কিশোরগঞ্জের সাহিত্য অঙ্গনের খ্যাতি বহুদুর পর্যন্ত বিস্তৃত। বিভিন্ন নদ-নদী ও বিল-হাওর দ্বারা প্লাবিত কিশোরগঞ্জের ভাটি অঞ্চলেই বাংলার শ্রেষ্ঠ লোকসাহিত্যের জন্ম হয়েছিল। কিশোরগঞ্জের লোকসাহিত্য সৃষ্টির প্রেক্ষাপট আলোচনার পূর্বে কিশোরগঞ্জ জেলার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা আবশ্যক মনে করি।

কিশোরগঞ্জ জেলা ব্রহ্মপুত্র নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত এক সমৃদ্ধ জনপদের নাম। ১৯৮৪ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী তেরটি থানা নিয়ে কিশোরগঞ্জ জেলা আত্মপ্রকাশ করে। এর আগে কিশোরগঞ্জ বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার একটি মহকুমা ছিল।ইতিহাস থেকে জানা যায়, "প্রাচীন লৌহিত্য অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্রের পূর্বতীরের এই জনপদটির একমাত্র গৈরিক উচ্চভূমি ছাড়া সমগ্র অঞ্চলই ছিল জলমগ্ন আর বিশাল হাওরে নিমর্জ্জিত। সম্ভবত খ্রিষ্টীয় অষ্টম অথবা নবম শতাব্দীর দিকে এই জেলার পশ্চিমাঞ্চলটি স্থায়ীভাবে জেগে ওঠে। ফলে এই অঞ্চলের বিশাল জলরাশির উপর বিক্ষিপ্ত অবস্থানে গড়ে ওঠা ভূমি সংস্থানের বিষয়টি হাওর,বিল, জলাশয় ও নিম্নজলাভূমি প্রত্যক্ষ করলে সহজে অনুমান করা যায়। দশম শতাব্দীর পর থেকে এই জেলার পূর্বাঞ্চলে হাওর এলাকায় আসামের পার্বত্যাঞ্চল থেকে এবং নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে প্রাকৃতিক অবস্থার সাথে জন মানুষের প্রচেষ্ঠায় গড়ে ওঠে বিক্ষিপ্ত জনপদসমূহ।"(১)তবে এ বিষয়টি সত্য যে প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগের বিভিন্ন সময়ে শাসন ক্ষমতার পরিবর্তনের সাথে সাথে বিভিন্ন যুগে এই জনপদের পরিসীমা বিস্তৃতি লাভ করেছে এবং আধুনিক যুগের প্রারম্ভে পূর্ব মোমেনশাহী হিসাবে এক বিরাট অঞ্চলকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। প্রথম মধ্যযুগ থেকে দ্বিতীয় মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগের প্রারম্ভ পর্যন্ত কিশোরগঞ্জের ভৌগোলিক অবস্থান যে ভূমিসংস্থানের উপর গড়ে উঠেছে তার সৃষ্টি প্রায় এক হাজার বছরের দীর্ঘ ঐতিহাসিক পটভূমিতে। "ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বতীরে অবস্থিত এই সমৃদ্ধ জনপদটি ভৌগোলিক ভাবে ৯০° ০২ থেকে ৯০° ১৩ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। ২,৫৫৭ বর্গ কি:মি: আয়তন বিশিষ্ট কিশোরগঞ্জ জেলায় ইসলাম এবং হিন্দু ধর্মাবলম্বী লোকের সংখ্যাই বেশী ।"(২) তবে অল্প কিছু খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর সাক্ষাৎ এখানে পাওয়া যায়। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকের সমাবেশ ঘটলেও প্রাচীনকাল থেকেই এখানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অপূর্ব নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। এ সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

অসংখ্য নদ-নদী ও বিল-হাওর দ্বারা প্লাবিত কিশোরগঞ্জ জেলার বর্ণিল চিত্রপটে জন্ম নিয়েছে বাংলার শ্রেষ্ঠ লোকসাহিত্য।'মৈমনসিংহ গীতিকা' বাংলা লোকসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। উল্লেখ্য যে,'মৈমনসিংহ গীতিকা' সমূহের উদ্ভব বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের সর্বত্র ঘটেনি । ব্রহ্মপুত্র নদ বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলকে যে প্রধান দুই ভাগে অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে বিভক্ত করেছে , তা রাজনৈতিক, ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত দিক থেকেও ভিন্ন বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। এর মধ্যে পূর্ব ময়মনসিংহ অঞ্চলই 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র লীলাভূমি হিসাবে স্বীকৃত। উল্লেখ্য যে, কিশোরগঞ্জ জেলা এই পূর্ব ময়মনসিংহ অঞ্চলের অর্ন্তভুক্ত। মৈমনসিংহ গীতিকা'র উৎপত্তি স্থল সম্পর্কে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য -

"মৈমনসিংহ গীতিকা মৈমনসিংহ জেলার পূর্বভাগে বিশেষত: নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ মহকুমাতেই প্রচলিত। সদর মহকুমার পূর্বাংশও এই সীমার সহিত সংযুক্ত। যে ব্রহ্মপুত্র নদ মৈমনসিংহ জেলাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে,সাধারণভাবে বলিতে গেলে,তাহার পূর্বভাগই 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র উৎপত্তি ও প্রচার স্থল,পশ্চিমভাগ নহে। (৩)

Dhaka University Institutional Repository

মানবিকতা, সমাজ-বাস্তবতা, প্রণয়াবেগ,অসাম্প্রদায়িক চেতনা, অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও কাব্যমূল্য প্রভৃতি দিক থেকে কিশোরগঞ্জের লোকসাহিত্য আমাদের এক অমূল্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে. বিস্তীর্ণ জলাভূমি আকীর্ণ কিশোরগঞ্জ জেলার উর্বর ভূমিতেই ঘটেছিল এই সাহিত্যের উদ্ভব ,পরিপুষ্টি ও বিকাশ । স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে ময়মনসিংহের লোকসাহিত্য বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের সর্বত্র জন্মলাভ না করে কেবলমাত্র বিশেষ একটি অঞ্চলে বিকশিত হওয়ার পশ্চাতে কী কারণ থাকতে পারে ? আমরা জানি, রাজনৈতিক , সামাজিক , প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত অবস্থা কোন এলাকার সাহিত্যসৃষ্টির ধারাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে । তাই কিশোরগঞ্জের লোকসাহিত্য সৃষ্টির প্রেক্ষাপট আলোচনায় ঐ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও ভৌগোলিক অবস্থার গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপুঞ্জ উপস্থাপন অপরিহার্য।

২.১ *ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট*

প্রাচীন যুগে কিশোরগঞ্জের সঠিক অবস্থান কি ছিল , তা স্পষ্ট করে জানা যায় না। 'কিশোরগঞ্জের ইতিহাস'গ্রন্থে উল্লেখ আছে, খ্রিঃ পূঃ ৩০২ অব্দে প্রখ্যাত পর্যটক মেগাস্থিনিসের ভারত ভ্রমণের অনন্য দলিল 'ইন্ডিকা' গ্রন্থের মানচিত্র থেকে জানা যায় যে কিশোরগঞ্জসহ বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চল ছিল বিশাল কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। কামরূপ শাসনে এই অঞ্চলটি সে সময়ে হিন্দুধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে সমুদ্র গুপ্তের শাসনামলে বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলসহ কামরূপ রাজ্যধীন সমগ্র এলাকা মগধের অধীন হয়। গুপ্ত সম্রাটেরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অনুরক্ত ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। গুপ্ত বংশের শাসনাধীনে থাকার ফলে এই অঞ্চলেও ধর্মীয় সংযম ও সহনশীল পরিবেশ বিরাজ করেছিল। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, গুপ্ত সম্রাটগণ সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় যথেষ্ট সহযোগিতা প্রদান করেছিল বলেই এখানে প্রাচীনকাল থেকেই সাহিত্যচর্চার অনুকূল পরিবেশ বিরাজ করছিল।

এরপর শুরু হয় সেন রাজাদের রাজত্ব। কিন্তু বৃহত্তর ময়মনসিংহের উপর তাদের কর্তৃত্ব পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয় নি। "সময়ের আবর্তে ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিমতীর সেন রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত হলেও ব্রহ্মপুত্রের পূর্বতীর কামরূপ শাসনমুক্ত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে ।এ সকল রাজ্যের নেতৃত্বে ছিলেন কোচ , হাজং , গারো , রাজবংশী প্রভৃতি আদিম সম্প্রদায়। আজকের কিশোরগঞ্জের জঙ্গলবাড়ী ছিল এই স্বাধীন ক্ষুদ্র রাজ্যের অন্যতম পীঠস্থান।"(৪) শ্রী খগেশকিরণ তালুকদারের বিশ্লেষণ অনুযায়ী ঈশাখাঁ ১৬শ শতকে জঙ্গলবাড়ীর কোচ রাজা লক্ষণ হাজোকে পরাজিত করে এখানে তার দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। তাই ধারণা করা হয় , তবে ষোড়শ শতাব্দীতে হাজংদের পদচারণা কিশোরগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল । প্রাচীন জনসমাজের সুস্পষ্ট ইতিহাস পাওয়া না গেলেও প্রাচীন কিশোরগঞ্জের যে সকল আলোচনা বিভিন্ন গাথা , কাব্য পুথি ও ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের বিশ্লেষণ থেকে পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে, জলময় হাওর অরণ্যবহুল কিশোরগঞ্জ অঞ্চল ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত হিন্দু ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব ও শাসনমুক্ত ছিল এবং এটি ছিল মূলত বিভিন্ন উপজাতি ও অন্যান্য এলাকা থেকে বিতাড়িত নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের নিরাপদ আবাসস্থল। পরবর্তী দুইশত বছরের মধ্যে অর্থাৎ দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যথাক্রমে পাল ও সেন আমলে এ জনপদে বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণের লোকজন পার্শ্ববর্তী অন্যান্য রাজ্য থেকে নানা কারণে এখানে এসে বসতি স্থাপন করে। এ দীর্ঘ সময়ে অর্থাৎ পাল , সেন এমনকি মুসলিম শাসনের প্রাক্কালেও এ জনপদে বাইরের তেমন কোন প্রভাব পড়েনি। কারণ তখন এ অঞ্চলটি খাল বিল ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল । ফলে সে সময়ে এ অঞ্চলজুড়ে কার্যত এখানে একটি স্থিতিশীল পরিবেশ বিরাজ করছিল, যা সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে অনুকূল প্রভাব ফেলেছিল।

সেন রাজত্বের পরে মুসলমান শাসনের সূত্রপাত হয়। পূর্ব মৈমনসিংহে মুসলমান শাসনের প্রভাব সম্পর্কে জানা যায় "খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আলাউদ্দিন হোসেন শার শাসনামলে (১৪৯৩ - ১৫১৯) সমগ্র ময়মনসিংহ অঞ্চল মুসলিম রাজত্বের অর্ন্তভূক্ত হয় ।আলাউদ্দিন হোসেন শার শাসন বাংলাদেশের ইতিহাসে গৌরবজনক অধ্যায় হিসাবে স্বীকৃত। মুসলিম শাসনের প্রারম্ভকালীন উগ্রতা পরিহার করে হোসেন শাহ্ সংযত আচরণের পরিচয় দিয়েছিলেন। তার শাসনামলে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে যথেষ্ঠ সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল। সেন বংশের নব্য ব্রাহ্মণ্য শাসন ও প্রথম তিন শতাব্দীকালের মুসলিম

Dhaka University Institutional Repository

শাসনের উগ্রতা থেকে পূর্ব ময়মনসিংহ অঞ্চল রক্ষা পেয়েছিল–এমন ইতিহাস-সাক্ষ্যই পাওয়া যায়। হুসেনশাহ-র শাসনামল থেকে অনুকূল পরিস্থিতিতে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্নমুখী বিকাশ যেমন ত্বরান্বিত হয়েছিল,তেমনি ঐ সময়েই ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহেরও বিকাশ গতিময়তা লাভ করেছিল,– ইতিহসে এমন তথ্যই সুলভ।"(৫)

সম্রাট আকবরের শাসনামলে সমগ্র কিশোরগঞ্জ অঞ্চল মুসলিম শাসনের অধীনে আসে। এর পূর্বে জঙ্গলবাড়ী,এগারসিন্ধুরসহ অন্যান্য এলাকায় কোচ,অহমসহ বিভিন্ন আদিম সম্প্রদায়ের নৃপতিদের শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। মোগল শাসনামলে যার নাম সবচেয়ে বেশী আলোচিত তিনি হলেন বিখ্যাত বার ভূঞার অন্যতম ঈশাখাঁ । ঈশাখাঁ স্বীয় বুদ্ধিমত্তা ও শক্তিবলে তখন ময়মনসিংহের বৃহত্তর অঞ্চলের শাসক ছিলেন। ইতিহাস পাঠে জানা যায়,সম্ভবত ১৫৮০খ্রি: ঈশাখাঁর নিকট জঙ্গলবাড়ীর কোচ সর্দারের পরাজয় হয় এবং মোগল সেনাবাহিনীর নিকট ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে এগারসিন্ধুর অহমরাজের পরাজয় ঘটে। তবে কিশোরগঞ্জের ইতিহাসের পাতায় যে ঘটনা সবচেয়ে বেশী আলোচিত তা হচ্ছে মোগলদের সাথে দেওয়ান ঈশাখাঁ ও তৎপুত্র মুসাখাঁর দীর্ঘ সময়ের সশস্ত্র সংগ্রাম।মোগলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী বারো ভূঞাদের মধ্যে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ চরিত্র। শক্তি ও বুদ্ধিমত্তায় শ্রেষ্ঠত্বের কারণেই বিশাল অঞ্চল তার শাসনাধীন হয়েছিল এবং তার শাসনামলও ছিল তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ। ঈশাখাঁর শৌর্য, বীর্য এবং তার পারিবারিক অনেক ঘটনাকে কেন্দ্র করে লোকমুখে এই অঞ্চলে বিভিন্ন কাহিনীর জন্ম হয়। 'ইশাখান মসনদালি' , 'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান' ইত্যাদি গীতিকায় এর প্রমাণ মেলে।

২.২ *নৃতাত্ত্বিক কারণ*

কিশোরগঞ্জের লোকসাহিত্য সৃষ্টির আর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে এই অঞ্চলের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এখানে আদিবাসী জনগণের সমাবেশ হয়েছিল অধিক মাত্রায়। প্রাচীন কিশোরগঞ্জের জনসমাজের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক সম্ভবত কোচদের প্রভাব। যদিও এ শতাব্দীর প্রথমভাগেই কোচদের উপস্থিতি একেবারেই নগণ্য;তথাপি লোকশ্রুতি,মৈমনসিংহ গীতিকা,পূর্ববঙ্গ গীতিকা,সর্বোপরি নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের আলোকে কোচ অধ্যুষিত কিশোরগঞ্জ তথা পূর্ব ময়মনসিংহের আলোচনা অগ্রাধিকার পাবার যোগ্য। ঈশাখাঁ ১৬শ শতকে জঙ্গলবাড়ীর কোচ রাজা লক্ষণ হাজোকে পরাজিত করে এখানে তার দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। শুধু জঙ্গলবাড়ী নয় , কিশোরগঞ্জের সর্বত্র কোচ , অহম , রাজবংশী , হাজং, মনিপুরী , কাচারী প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বের প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়।আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলার লোকসাহিত্য'গ্রন্থ থেকে জানা যায়, এদের মূল ইন্দো-মোঙ্গলয়েড জাতির অন্যতম শাখা বোড়ো জাতি হতে উদ্ভূত। অতএব দেখা যাচ্ছে , ইন্দো-মোঙ্গলয়েড জাতির একটি প্রধান শাখা বোড়ো জাতির মৌলিক ভিত্তির উপরই এই অঞ্চলের মানব সমাজ গঠিত। বোড়ো জাতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে , এরা মাতৃতান্ত্রিক। একটি প্রবল মাতৃতান্ত্রিক সমাজের সংস্কার ময়মনসিংহ গীতিকার ভিত্তিমূলে কার্যকর ছিল। সুতরাং মাতৃতান্ত্রিক সমাজের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা সম্যক বুঝতে পারা গেলেই গীতিকাগুলির প্রধান তাৎপর্য বুঝতে পারা যাবে।মাতৃতান্ত্রিক সমাজ স্ত্রী প্রধান ,এতে নারীর স্বাধীন প্রেমের অধিকার সামাজিকভাবে স্বীকার করা হয়। বাল্যবিবাহ কিংবা গৌরীদান মাতৃতান্ত্রিক সমাজে সম্পূর্ণ অপরিচিত। শুধু মাতৃতান্ত্রিক সমাজেই নয়, পৃথিবীর কোন আদিম অধিবাসী সমাজেই বাল্য বিবাহের প্রচলন নেই তাই দেখা যায় , পূর্ব ময়মনসিংহের গীতিকাগুলি প্রধানত পরিণতবয়স্কা কুমারীর স্বাধীন প্রেমের অধিকার ও ব্যক্তিগত হৃদয় -বেদনা নিয়েই রচিত। "মাতৃতান্ত্রিক সমাজ স্ত্রীপ্রধান সেই জন্যেই এই গীতিকাগুলির মধ্যে স্ত্রী চরিত্র প্রাধান্য লাভ করেছে। গীতিকাগুলি প্রেমমূলক , অতএব প্রেমের ক্ষেত্রেই এদের প্রাধান্য দেখা যায় অন্যান্য কর্মের ক্ষেত্রে নহে। একটি বলিষ্ঠ নারীত্বের মর্যাদা গীতিকাগুলির ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। নারীর ব্যক্তিত্ব , আত্মবোধ, স্বাতন্ত্র্য ইহাদের মধ্য দিয়ে গৌরব লাভ করিয়াছে।"[৬]

মুক্ত জীবন-ভাবনা কিংবা স্বাধীন প্রেমাকাঙ্ক্ষা এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা এখানকার নারী চরিত্রসমূহকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। কুমারী নারীর স্বাধীন প্রেম,পতি নির্বাচনে নিজস্ব বিবেচনাবোধ,সতীত্ব সম্পর্কে গতানুগতিক ধারণার বাইরে থেকে মৈমনসিংহ গীতিকার নায়িকাগণ তাদের চরিত্রের যে দৃঢ়তা ও বৈচিত্র্যময় রূপের বহি:প্রকাশ ঘটিয়েছে তাতে এ অঞ্চলে আদিবাসী জনসমাজের জীবনধারা ও মাতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর প্রভাবই অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

Dhaka University Institutional Repository

২.৩ ভৌগোলিক কারণ

ময়মনসিংহ জেলার মধ্যভাগ দিয়ে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র নদটি এই জেলাকে পশ্চিম ময়মনসিংহ ও পূর্ব ময়মনসিংহ এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছে। বর্তমানে ব্রহ্মপুত্র নদীর পূর্বাঞ্চলে কিশোরগঞ্জ জেলা অবস্থিত। কিশোরগঞ্জ জেলা যথার্থ নদী-মাতৃক এলাকা । মোহাম্মদ আলী খানের 'কিশোরগঞ্জের ভৌগোলিক বিবরণ'থেকে জানা যায়, কিশোরগঞ্জের পূর্ব সীমানায় রয়েছে মেঘনা নদী, পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র, উত্তরে নেত্রকোনা জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়েছে কংস, মগরা, বাউলাই এবং এদের অসংখ্য শাখা ও সংযুক্ত নদী এবং খালসমূহ। এই নদীগুলি দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে মোটামুটি ভৈরবের নিকট মিলেছে। সৃষ্টি হয়েছে একটি তোড়াসদৃশ আকৃতি যার এক দিকে মেঘনা ও অপর দিকে ব্রহ্মপুত্র আর ডালপালা হিসেবে আছে উপরোক্ত নদী, সংযোগ নদী ও খালগুলি। তবে কিশোরগঞ্জের মাটি ও মানুষের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও বৈচিত্র্যময় প্রভাব বিস্তার করেছে যে নদী তা হল ব্রহ্মপুত্র।"তিব্বতের মানস সরোবরের নিকটবর্তী 'চেমাইয়াং ডুং ' হিমবাহ থেকে এর উৎপত্তি। তিব্বত মালভূমির উপর দিয়া পূর্বদিকে সানপো নামে প্রায় এক হাজার মাইল(প্রায় ১৬০৯ কি:মি) প্রবাহিত হবার পর দক্ষিণে ঘুরে ৪৪২ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত সদিয়ার নিকট আসামে প্রবেশ করেছে।এটি আসামে ডিহাং এবং পরে ব্রহ্মপুত্র নামে পশ্চিম দিকে প্রায় ৪৫০ মাইল প্রবাহিত হবার পর গারো পাহাড়ের নিকট দক্ষিণে ঘুরে বর্তমান কুড়িগ্রাম জেলার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। ব্রহ্মপুত্র কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দক্ষিণ অভিমুখী তিস্তানদীর সাথে মিলিত হয়েছে। আরো দক্ষিণে যেয়ে ব্রহ্মপুত্র বিভক্ত হয়ে এক শাখা যমুনা এবং অপর শাখা ব্রহ্মপুত্র নামে জামালপুর ও ময়মনসিংহ জেলা হয়ে কিশোরগঞ্জ জেলায় পড়েছে। কিশোরগঞ্জের সীমানা বরাবরে হোসেনপুর, পাকুন্দিয়ার টোক হয়ে কটিয়াদী,কুলিয়ারচর ও ভৈরবের প্রান্ত ছুয়ে ভৈরব বাজারের নিকট পতিত হয়েছে। এই অংশটি পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নামে সমাধিক পরিচিত যা মৃতপ্রায়।'[৭] কিশোরগঞ্জ জেলার লোক সাহিত্য সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে রয়েছে এই জেলার অসংখ্য নদ-নদী এবং হাওর ও বিল। কিশোরগঞ্জের এই নদীগুলি উচ্চভূমি থেকে প্রচুর পলি বহন করে এই জেলার নিম্নভূমিকে গড়ে তুলেছে। একদিকে মেঘনা অন্যদিকে ব্রহ্মপুত্র বৃহত্তর এই দুটি নদীর অসংখ্য শাখা-প্রশাখা এই জেলাকে করেছে আকর্ষণীয় ও বৈচিত্র্যময়। মধ্যযুগের কিশোরগঞ্জের নদ-নদীগুলোর প্রবাহ বিষয়টি পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার অসংখ্য নদ-নদীর মৃত্যু ঘটেছে, কিন্তু প্রাকৃতিক ভাবে নতুন নদীর জন্ম হয়নি। ষোড়শ শতকে সৃষ্ট এই অঞ্চলে লোক সাহিত্যে কিশোরগঞ্জের নদীগুলোর নাম পাওয়া যায়। যেমন-মলুয়া পালায় বর্ণিত আছে-

কামলার কাম বিনোদ তাও ভাল জানে।
ভাল কইরা বান্ধে বাড়ী সূত্যা নদীর কানে॥

'সিংগুয়া নদীর একটি শাখা হিসাবে সূতী নদী পরিচিত।মালিকখালীর নিকট চাঁনপুর ইউনিয়নের পূর্ব পাশ দিয়ে নদীটি প্রবাহিত হয়ে রওহা বিলের মধ্যদিয়ে ঘোড়াউতরা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে।সূতী নদীর অবস্থান কিশোরগঞ্জ থেকে ২০/২২মাইল পূর্ব-দক্ষিণ দিকে।তবে নদীটির দৈর্ঘ্য খুব বেশী নয় ,মাত্র ৮/৯ মাইল।'[৮] আবার, রূপবতী পালায় বলা হয়েছে -

চারিদিকে নানা গ্রামে নেহালিয়া দেখে।
ফুলেশ্বরী উথারিয়া পড়ে নরসুন্দার মুখে॥
সেই নদী ছড়াইয়া যায়,ঘোড়াউত্রয়া বাইয়া।
মেঘনা সায়রে পাশী চলিল ভাসিয়া॥

নরসুন্দা নদীটির কথা নয়ান চাঁদ ঘোষের ' চন্দ্রাবতী ' পালাতেও দেখতে পাওয়া যায় -

Dhaka University Institutional Repository

পরথমে হইল দেখা সুন্দা নদীর কূলে।
জল ভরিতে যায় কন্যা কলসী কাকলে॥

কিশোরগঞ্জের প্রাচীন কবি নয়ানচাঁদ ঘোষ এবং মুন্সী আবদুর রহিম নরসুন্দাকে ' সুনন্দা ' নামে অভিহিত করেছেন।মুন্সী আব্দুর রহিম তার বিখ্যাত 'গাজী কালু চম্পাবতী'পুথির ভণিতায় উল্লেখ করেছেন-

আব্দুর রহিম আমি হীনের বচন।
পরিচয় শোন মোর কোথায় ভবন॥
মোমেনশাহী জেলা বিচে গলা চিপা গ্রামেতে।
আশুতার বাজারে উত্তর দক্ষিণে॥
বাটির দক্ষিনে নদী সুনন্দা নামেতে।

এক সময় কিশোরগঞ্জ শহরের প্রধান আকর্ষণ ছিল এই নরসুন্দা নদী এবং এখনও তা কিশোরগঞ্জ শহরকে দুই ভাগে বিভক্ত করে রেখেছে। একে নিয়ে রচিত অনেক গল্প,কাহিনী,কিংবদন্তি,রোমান্টিকতা কিশোরগঞ্জবাসীর মনে এখনও গেঁথে থাকলেও সেই খরস্রোতা নরসুন্দা বর্তমানে মৃত, স্থানে স্থানে তার বুকে ধানের সবুজ চারা শোভা পায়। ব্রহ্মপুত্রের গতি পরিবর্তনের ফলে কালের প্রবাহে নরসুন্দা হারিয়ে ফেলেছে তার যৌবন।

এই জেলার ভৌগোলিক বৈচিত্র্যময়তাকে আরো বিশিষ্টতা দিয়েছে এর হাওর অঞ্চল। হাওরাঞ্চল কিশোরগঞ্জের লোকজ জীবনধারার এক আকর্ষণীয় দিক। এখানে দেখা মেলে বিস্তীর্ণ চরাঞ্চল, চরের বুক চিরে প্রবাহিত অসংখ্য ছোট ছোট নদী, শাখানদী এবং সে নদীগুলোর গতি পরিবর্তনকালে সাবেক চর ভেঙ্গে গড়ে ওঠা নতুন নতুন চর ও হাওর। আবার কোন কোন সময় নদী বাহিত বালি-পালি মাটির স্তর বিন্যাসেও গহীন নদীর গর্ভ থেকে জেগে ওঠে দ্বীপ সদৃশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমি ও বিশাল হাওর। আর এ হাওর বা বিস্তীর্ণ জলাভূমিই এতদাঞ্চলকে বিশেষ করে সমগ্র ভাটি অঞ্চলকে মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে বরাবর। বৈচিত্র্যময় হাওর অঞ্চলে জল সরবরাহকারী নদীগুলোর মধ্যে সুরমা,কুশিয়ারা, ধনু , বউলাই , ঘোড়াউতরা, মেঘনা অন্যতম। বর্ষাকালে বিশাল হাওর এলাকায় অথৈ জলরাশি সাগর রূপ ধারণ করে। কেবল ভূ-প্রকৃতিগত বৈচিত্র্যের কারণে নয়,অর্থনৈতিক,সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দৃষ্টিকোণ থেকেও হাওর এক বিরাট স্থান জুড়ে আছে।

শীতকালে যে প্রান্তর ফসলে পূর্ণ থাকে , বর্ষাকালে সেখানে প্রচুর জলধারা চারিদিক প্লাবিত করে ফেলে। চারিদিকে অথৈ পানি আর প্রচণ্ড ঢেউ এর বিস্তার দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশি সাগরের বিশালত্বের কথাই মনে করিয়ে দেয়। দ্বীপের মতো গ্রামগুলি যেন ভেসে থাকে জলের বুকে। বর্ষাকালে হাওরগুলি শুধু পানিতে পরিপূর্ণ থাকে না, প্রচণ্ড খরস্রোতে ভাঙ্গন দেখা দেয় আশে-পাশের গ্রামগুলি। আবার শুষ্ক মৌসুমে সেখানে এক ফোঁটা পানিও থাকেনা, তখন সোনালি ধানের বিপুল সমারোহে হাওর অঞ্চল সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। যেদিকে চোখ যায় কেবল ধান আর ধান।প্রকৃতির এই পরিবর্তন হাওর অঞ্চলের মানুষকে দিয়েছে বৈচিত্র্য। কিশোরগঞ্জ জেলার এই হাওর অঞ্চলই হচ্ছে লোকসাহিত্যে বিশ্বখ্যাত শিল্প-সম্ভার ময়মনসিংহ গীতিকার ভূগোল এবং গীতিকা সমূহের অধিকাংশ ঘটনারই অভিনয় ক্ষেত্র। কিশোরগঞ্জের বিখ্যাত জালিয়ার হাওরের কথা'দস্যু কেনারামের পালা'য় বর্ণিত হয়েছে। জালিয়ার হাওরেই চন্দ্রাবতীর পিতা দ্বিজবংশী দাসের সাথে দস্যু কেনারামের সাক্ষাৎ হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। তাছাড়া বিভিন্ন নদ-নদী,চর-হাওর,বিল,জঙ্গলের কথা নায়িকা চরিত্রকে কেন্দ্র করে বার বার গীতিকাসমূহে বর্ণিত হয়েছে।ব্রহ্মপুত্র,ফুলেশ্বরী,নরসুন্দা ও ধনু নদীর কথা বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে বার বার উচ্চারিত হয়েছে।এগুলিই এই অঞ্চলের মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে এবং তারই বাস্তব রূপ গীতিকায় প্রতিফলিত হয়েছে।

পূর্ব মৈয়মনসিংহের মনোমুগ্ধকর বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশ সেখানকার মানুষের হৃদয়াবেগকে স্ফীত ও গতিময় করেছে। এ সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য নিম্নরূপ ঃ

Dhaka University Institutional Repository

"ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বাঞ্চল বিস্তৃত জলাভূমি দ্বারা আচ্ছন্ন। এই জলাভূমি হাওর নামে পরিচিত। সাগর কথাটিই পূর্ব ময়মনসিংহের প্রাদেশিক ভাষায় 'হাওর' বলিয়া উচ্চারিত হয়। এই সকল জলাভূমির পূর্ব ও পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্ত দিয়া কংশাই, ধনু, ঘোড়াউৎরা, আড়িয়াল খাঁ ও মেঘনা নদী প্রবাহিত। এতদ্ব্যাতীত ইহার মধ্যভাগ দিয়াও ইহাদের শাখা-উপশাখা যথা-ফুলেশ্বরী, নরসুন্দা, সূতী প্রভৃতি নদী প্রবাহিত। এই বিল, হাওর ও বিভিন্ন নদ-নদী প্লাবিত বিস্তীর্ণ নিম্নভূমি বা ভাটি অঞ্চলই 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র জন্মভূমি। প্রকৃতির নিত্য সলিল সেকে এই অঞ্চলেরই পঙ্কিল মৃত্তিকায় বাংলার শ্রেষ্ঠ গীতিকার শতদল গুলি বিকশিত হইয়াছিল।"[৯] চারিদিতে জলমগ্ন, দুর্গম অরণ্য, ভৌগোলিক ভাবে বিচ্ছিন্ন এই এলাকা বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকায় এখানে স্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করেছিল যা ছিল সাহিত্য সৃষ্টির অনুকূলে। প্রকৃত পক্ষে পূর্ববঙ্গের ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা ও দুরধিগম্যতার দরুন এখানকার গড়ে উঠা স্বাধীন সমাজ, মানুষের মন ও মানসকে বস্তুনিষ্ঠ ও জীবন নির্ভর করে তুলেছিল। ফলে এ সমাজের নর-নারীর শাশ্বত হৃদয়-বৃত্তির ক্ষেত্রেও এক অনাবিল স্বকীয়তা উজ্জীবিত হয়েছিল - যা কোনরকম আধ্যাত্মিকতা ,সংস্কার বা বিধি-নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ না হয়ে বরং অনুকুল পরিবেশে কিছুটা হলেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে সুযোগ দিয়েছে। এটাই আদিম বা প্রাচীন যুগের স্বাভাবিক মানবিক ধারা যা গীতিকাগুলোকে অপরিসীম অনন্যতা দান করেছে।কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে ,"এই প্রত্যন্ত মুক্তাঞ্চলগুলো দস্যুদের জন্যও ছিল অবাধ বিচরণ ভূমি, যেখানে তারা ইচ্ছামত যে কোন ধরনের সন্ত্রাস সৃষ্টির সুযোগ পেত।মনে হয় এ ধরনের দস্যুবৃত্তির নির্মমতাই যেন 'দস্যু কেনারামে'র পালায় বিধৃত হয়েছে।সেখানে ইতিহাসসিদ্ধ জালিয়ার হাওরের নির্জন অনুকূল পরিবেশে দস্যু কেনারামের নির্মমতা যেন এক বিস্ময়কর রোমাঞ্চের ব্যঞ্জনাবহ। তা ছাড়া পর্তুগীজ কিংবা মগ জলদস্যুদের কথাও গীতিকার ছত্রে ছত্রে বাস্তব সম্মতভাবে স্থান লাভ করেছে।"(১০)

প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য ছিল দেবনির্ভর। একমাত্র পুথিসাহিত্য ছাড়াও বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় নিদর্শনসমূহ মূলত দেব-দেবী ও পীর পয়গম্বর কেন্দ্রিক। তখন মানুষ ছিল প্রকৃতির হাতে বন্দী। প্রকৃতির প্রতিকূল অবস্থা থেকে আত্মরক্ষার জন্য মানুষ বিভিন্ন দেব-দেবীর যেমন-ধর্মঠাকুর, চণ্ডী, মনসা, শীতলা বা অন্যান্য দেবতার গুণকীর্তন বা পূজা অর্জনা করত। এরই ফলশ্রুতিতে আমাদের দেশে রচিত হয়েছে মঙ্গলকাব্য ঃ চন্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল প্রভৃতি। কিশোরগঞ্জের ভৌগোলিক পরিবেশ আলোচনায় দেখা যায় যে, এর বিরাট এলাকা জুড়ে রয়েছে হাওর। হাওর ছাড়া অন্যান্য অংশও পলিমাটি সমৃদ্ধ। সারা এলাকা জুড়ে রয়েছে নদী,নালা, খাল, বিল দীঘি ইত্যাদি। তাই স্বাভাবিক ভাবেই এই অঞ্চলে সাপের উপদ্রব ছিল বেশী। সর্পদংশনে মৃত্যুর ঘটনা ছিল যথেষ্ট।"বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব কিশোরগঞ্জ এলাকায় প্রসার লাভ করেনি। বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আলোও ছিল স্তিমিত। বৌদ্ধগণের দেবতা ধর্মঠাকুর অথবা বৈদিক দেব-দেবী নিয়ে কাব্য রচনার সজ্ঞান প্রয়াস এখানে হয়নি। মহাপ্রভু চৈতন্য দেবের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও ভক্তিবাদ প্রচার পেয়েছে অনেক পরে। কাজেই রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক বৈষ্ণব পদাবলীও রচিত হয়নি কিশোরগঞ্জে। জলাভূমিতে সাপের উপদ্রব বেশী বলে কিশোরগঞ্জে প্রাধান্য লাভ করেছে লৌকিক দেবী মনসা। মনসা বৈদিক দেব-দেবীর শত্রু অথচ সর্পের বিষজ্বালা হতে মানুষকে অব্যাহতি দিতে পারেন, সর্পদৃষ্ট মৃত জনকে দিতে পারেন পুর্নজীবন। এ কারণে কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে মধ্যযুগে রচিত কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসা বা বিষহরি।"[১১] প্রকৃতির এই দৈবদুর্বিপাকের কারণ কিশোরগঞ্জে সৃষ্টি হয়েছে মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য মনসামঙ্গল। কবি নারায়ণ দেব, দ্বিজবংশীদাস প্রমুখ কবি মনসা দেবীর কাহিনীভিত্তিক কাব্য 'পদ্মাপুরাণ' রচনা করেছেন । ধারণা করা হয়,এভাবেই কিশোরগঞ্জে সাহিত্য রচনার একটি সুদৃঢ় ক্ষেত্র তৈরী হয়েছিল।

২.৪ ধর্মীয় প্রভাব

পূর্বে আলোচিত ঐতিহাসিক পটভূমি থেকে একটি সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে যে, পূর্ব মৈমনসিংহ অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিদ্যমান ছিল। কারণ এই অঞ্চলে সেনবংশীয় শাসকদের প্রারম্ভকালীন

Dhaka University Institutional Repository

উগ্রতা প্রবেশ করতে পারেনি। পূর্ব মৈমনসিংহ ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামী ও সংস্কার থেকে মুক্ত কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে সেই সময় থেকেই সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার এক অনুকূল পরিবেশ বিরাজমান ছিল।

মধ্যযুগে মুসলমান শাসনের সূত্রপাতে বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে একধরনের অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছিল। তবে কোন কোন শাসক মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে ব্যাপক পৃষ্টপোষকতা দান করেছেন। তাদের মধ্যে আলাউদ্দিন হুসেন শাহের নাম উল্লেখযোগ্য। যিনি ছিলেন ঐ অঞ্চলের অধিকর্তা। তিনি তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী নমনীয় ও সংযত মন-মানসিকতার অধিকারী ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের বিকাশে তার পৃষ্ঠপোষকতাও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর সময়কালকে বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করা হয়। ডক্টর এনামুল হকের মতে "বাংলার ইতিহাসে হুসেনী বংশের পয়তাল্লিশ বর্ষব্যাপী রাজত্বকাল (১৪৯৩-১৫৩৮) রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক তৎপরতার জন্য, অধিকন্তু সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য চির বিখ্যাত। এই বংশ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও বিস্তৃতির জন্য যাহা করিয়াছে, তাহার তুলনা ইতিহাসে বিরল।"

আলাউদ্দিন হুসেন শাহের শাসনামলেই এদেশে চৈতন্য দেব কর্তৃক বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার বিস্তৃত হয়। ময়মনসিংহ অঞ্চলে একজন প্রধান চৈতন্যভক্তের বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের ইতিহাস সাক্ষ্য পাওয়া যায়। ধর্মীয় উগ্রতামুক্ত বৈষ্ণবধর্মের অর্ন্তনিহিত সুর ছিল অসাম্প্রদায়িক, সমন্বয়বাদী, প্রণয়াবেগী ও শান্তিধর্মী।

কিশোরগঞ্জ অঞ্চলভিত্তিক গীতিকাসমূহে প্রেমের স্বাধীন বিকাশ,সামাজিক শ্রেণী বৈষম্যহীনতা,ধর্মীয় গোঁড়ামীর শিথিল বিন্যাস, হৃদয়াবেগের প্রাধান্য এবং সর্বোপরি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যে পরিচয় পাওয়া যায়, তার পেছনে ঐ অঞ্চলের নব্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও ইসলাম ধর্মের বিশিষ্ট ভূমিকা সহজেই অনুভব করা যায়। তবে কেবল পূর্ব-ময়মনসিংহের ক্ষেত্রেই যে একথা প্রযোজ্য, তা নয়; বাংলাভাষাভাষী যেসব অঞ্চল ব্রাহ্মণ্য শাসনমুক্ত ছিল সেসব অঞ্চলেই গীতিকাসমূহের উদ্ভব হয়েছে বলে মনে করা হয়। এসম্পর্কে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য ঃ "সেনবংশীয় রাজাগণ পশ্চিম ময়মনসিংহ অধিকার করিলেও বহু বিল-সমন্বিত, নদীমাতৃক, বর্ষার দুর্গম অরণ্য ও বহুল পূর্ব প্রদেশ কিছুতেই আয়ত্ত করিতে পারে নাই। সুতরাং এই পূর্ব-ময়মনসিংহ চিরকালই সেনবংশ প্রতিষ্ঠিত নব ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও কৌলীন্য হইতে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল। প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজনৈতিক প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়াও রাজবংশীয় নৃপতিগণ তদ্দেশ-প্রচলিত প্রাচীন হিন্দু ধর্মের আদর্শ বিস্তৃত হয় নাই। কামরূপ শাসনকালে তান্ত্রিকতার কেন্দ্রে পরিণত হয়, কিন্তু তখন পূর্ব্ব-ময়মনসিংহ সে দেশ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল। তান্ত্রিকাধিকারের পূর্ব্বে কামরূপে যে হিন্দু ধর্মের আদর্শ ছিল পূর্ব্ব মৈমনসিংহ তাহাই গ্রহণ করিয়া ছিল। এই হিন্দু ধর্ম উদার, তাহাতে বৌদ্ধ কর্ম্মবাদ ও হিন্দু নিষ্ঠার অপূর্ব মিশ্রণ ছিল। সেই হিন্দু ধর্মের বল্লাল সেন-প্রবর্তিত গৌরীদান; আচার-বিচারের চুলচেরা হিসাব, ছোঁয়াছে রোগ ও ভক্তিবাদের আতিশয্য ছিল না।"(১২)

ধর্মীয় কুসংস্কার,কঠোর জাতিভেদ প্রথা,সামাজিক বিধি-নিষেধ ইত্যাদির অনুপস্থিতিই পূর্ব-ময়মনসিংহ অঞ্চলের লোকায়ত জনজীবনকে স্বাধীন প্রণয়বাসনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। নব্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং কৌলিন্য প্রথার অনুপস্থিতি সেখানকার সমাজের অন্তর্ময় বৈশিষ্ট্য ছিল।

হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় বিভিন্ন বর্গে বিভক্ত হলেও মূলত দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সুসম্পর্কের কথা গীতিকাগুলিতে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।গায়ক যে ধর্মের হোক না কেন পালার শুরুতে তারা সকল ধর্মের লোকদের সালাম জানাতো। যেমন–

সভা কইরা বইছ ভাইরে ইন্দু মুসলমান।
সভার চরণে আমি জানাইলাম ছেলাম॥

Dhaka University Institutional Repository

সাম্প্রদায়িক সুসম্পর্কের কথা বিভিন্ন গ্রন্থেও স্পষ্ট উল্লেখ আছে। মৈমনসিংহ গীতিকার ভূমিকাংশে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, "মুসলমান কবি কালিদাস গজদানী এবং মমিনা খাতুনের প্রেম অকুণ্ঠিতভাবে বর্ণনা করেছেন, পার্শ্বেই আবার ঈশাখাঁর প্রতি অনুরক্ত কেদার রায়ের ভাগিনীর চিত্রটি আছে। আর একটি গাথায় ব্রাহ্মণ জয়চন্দ্র এক মুসলমানীর প্রেমে পড়িয়াছেন ও অপর একটিতে সুরৎজামালও ব্রাহ্মণ রাজকন্যা অধুরায় প্রেম প্রসঙ্গ আছে। এই সকল পালাগানের শ্রোতা হিন্দু-মুসলমান উভয়েই। হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলির উপর যে দেবতা হাসিয়া খেলিয়া ফুলশর সন্ধান করিয়া থাকেন, তিনি হিন্দুর পরিকল্পিত দেবতা হইলেও আদবেই জাতিভেদ স্বীকার করেন না। এই গাথাগুলিতে জাতীয় বিদ্বেষের কণিকা মাত্র নাই। সত্য ঘটনা স্বকীয় গৌরবের বেদীর উপর দাঁড়াইয়া শ্রোতার অনুরাগ আকর্ষণ করিতেছে। হিন্দু ও মুসলমান যে বহু শতাব্দীকাল পরস্পরের সহিত প্রীতির সম্পর্কে আবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছিলেন, এই গীতিকাগুলিতে তাহার অকাট্য প্রমাণ আছে।" (১৩)

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এই ধারণা জন্মে যে, প্রাচীন কাল থেকেই এই অঞ্চলে ধর্মীয় সম্প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। এখানকার নর-নারীর জীবনবোধ কোন প্রকার ধর্মীয় বিশ্বাস বা সাম্প্রদায়িক মানবিকতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল না, ছিল একান্তই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যময় বা ব্যক্তি অভিরুচি আশ্রয়ী। যার ফলে এখানে সাহিত্য সৃষ্টির একটা অনুকূল পরিবশে অনেক পূর্ব থেকেই বিরাজ করেছিল।

২.৫ সামাজিক কারণ

কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের সাহিত্যসৃষ্টির পেছনে ঐ এলাকার সামাজিক অবস্থা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। লোক সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। কেননা লোকসাহিত্য স্থান-কাল ও প্রতিবেশ নিরপেক্ষ নয়।তাই কিশোরগঞ্জের লোকসাহিত্যে ঐ অঞ্চলের প্রকৃতি ও পরিবেশ,সমাজ তথা সামাজিক মানুষের জীবনাচারণ ও চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন সহজেই পরিলক্ষিত হয়।

আমরা জানি,প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্য মানব হৃদয়কে উজ্জীবিত করে থাকে। কিশোরগঞ্জের প্রকৃতির রূপ-মাধুর্য যে কোন মানুষকেই বিমোহিত করে তোলে।এখানকার ভাটি অঞ্চলে রয়েছে নানা রকম নদ-নদী,হাওর ও বিল-ঝিলের সমাহার। প্রকৃতির এই মনোরম সৌন্দর্য এখানকার মানুষের চিত্তকে করেছে উদার এবং কল্পনাকে দিয়েছে সীমাহীন বিস্তার। চিত্ত বিনোদনের উপায় হিসাবে এখানকার মানুষ কল্পনায় গেঁথে নিয়েছে নানা রকম গাথা, গান,কিস্‌সা ও কাহিনী।

কৃষিকাজ হচ্ছে ভাটি এলাকার মানুষের জীবিকা নির্বাহের প্রধান অবলম্বন।বর্ষাকালে হাওর অঞ্চলের যেখানে থাকে সীমাহীন পানির বিস্তার,শীতকালে সেখানেই দেখা যায় সোনালি ধানের বিপুল সমারোহ।বৎসরের প্রথমদিকে কৃষকেরা সেই ফসল ঘরে তুলে সারা বৎসরের জন্য মজুত করে।দেখা যায় বৎসরের বাকিটা সময় তাদের হাতে আর কোন কাজ -কর্ম থাকেনা। তাই অলস অবসর যাপনের জন্য চিত্ত বিনোদনের উপায় হিসাবে তারা নানা রকম সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে।যেমন-নৌকা বাইচের আয়োজন করে,ঘাটু গানের উৎসব করে,কিস্‌সা বা পালাগানের আয়োজন করে এখানকার মানুষ স্বত:স্ফুর্তভাবে সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা করে আসছে। দেখা গেছে ধনী-অবস্থাসম্পন্ন বাড়ীতেই এসব কিস্‌সা বা পালাগানের আসর বসতো। কিন্তু তা উপভোগ করতো গ্রামের সকল স্তরের মানুষ। পালাগান শেষে গায়কদের নানা রকম উপঢৌকন দিয়ে সম্মানিত করার বর্ণনা গীতিকাগুলিতে পাওয়া যায়। যেমন–

মরমের চান্দে আমরা আইলাম তার বাড়ী।
ফিরোজ খাঁর পালা গাইয়া পাইছি পরিস্কারি॥
ধুতি পাইছি চাদর পাইছি আর পাইছি ধান।

Dhaka University Institutional Repository

রাঙ্গ মিয়ার গোচরে আমি জানাই ছেলাম॥
ধন পুত্র বাড়ুক তার নাতি পুতি।
সরু শস্যি ভইরা উঠুক তার চইদ্দ আড়া খেতি॥
দোয়া দিয়া বাড়ীৎ যাই শুন মিয়াগণ।
যার যে কামনা আল্লা করকাইন পূরণ॥
(দীনেশচন্দ্র সঙ্কলিত, পূর্ব্ববঙ্গ:মৈমনসিংহ-গীতিকা, পৃ:১৫৮)

উপর্যুক্ত চরণগুলি থেকে জানা যায় সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার একটা অনুকূল পরিবেশ সেই সময়ে সমাজে বিরাজমান ছিল। সমাজের সকল স্তরের মানুষের পারস্পরিক সহমর্মিতাই এই পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে।কোন রাজা মহারাজাকে খুশি করার জন্য নয়, কেবলমাত্র চিত্ত বিনোদনের উপায় হিসাবে তারা এই সমস্ত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছে। হৃদয়বৃত্তির এই স্বতঃস্ফূর্ততা এখানকার সাহিত্যিক পরিবেশকে করেছে অভিনবত্ব।

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন জনপদ নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে কিশোরগঞ্জ জেলা। এসব বিচ্ছিন্ন জনপদে নানা শ্রেণীর মানুষের বসবাস লক্ষ্য করা যায়। তবে অধিকাংশ মানুষেই দরিদ্র এবং নিরন্ন। প্রকৃতির প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে তারা বেঁচে থাকে। তাই এদের স্বভাবের মধ্যে এক ধরনের দুর্ধর্ষতা ধরা পড়ে। নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে জানা যায়, "ময়মনসিংহ অঞ্চলের মানুষের রক্তে কিরাতীয় অষ্ট্রিক মঙ্গোলীয় ভেজ্ডিড রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে। কারণ, এখানে একসময় কোচ, গারো প্রভৃতি আদিবাসী রাজত্ব করেছে ও কিশোরগঞ্জের জলগণের সঙ্গে মিশেছে এবং হয়েছে রক্তের আদান প্রদান। আর এই মিশ্রণ জাত মানুষগুলো চর-হাওর অঞ্চলের অস্তিত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে বেঁচে থেকেছে। এমনকি এরা বিভিন্ন গোত্রের হামলা প্রতিরোধের জন্য হানাহানি, মারামারি ও দুধর্ষকাজেও লিপ্ত ছিল এবং এখনো তার দৃষ্টান্ত কোন কোন এলাকায় বিশেষ করে হাওর অঞ্চলে পাওয়া যায়।"[১৪] কাজেই দেখা যায় এই অঞ্চলের মানুষগুলো দরিদ্র নিরীহ হওয়া সত্ত্বেও তাদের স্বভাবের মধ্যে একধরনের দুর্গমতা, দুধর্ষতা ধরা পড়ে। এই জন্যেই এখানকার গীতিকার নারী চরিত্রগুলো দেখা যায় প্রায়েই দুধর্ষতার শিকারে পরিণত হয়েছে। এ থেকেই ধারণা করা যায় যে, এই অঞ্চলের মানুষ একদিকে প্রকৃতির স্বাভাবিক ও অনুকূল পরিবেশে নিজেদের মান সম্মত স্বাধীন সমাজ গড়ে তুলেছিল, অন্যদিকে তার মধ্যে তারা প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার অভিপ্রায়ে জীবন সংগ্রামে বলিষ্ঠ ও প্রত্যয়দীপ্ত ভূমিকাও পালন করেছে। বোধকরি সেজন্যেই অধিকাংশ গীতিকার নারী চরিত্র সমূহে প্রেম-প্রতিবাদ ও সংগ্রামের সমন্বিতরূপ পরিলক্ষিত হয়।

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, চর-হাওর অঞ্চলে মূলত বাস করত নিঃস্ব-নিরন্ন দরিদ্র লোকেরা। আর এই দরিদ্র নিরন্ন মানুষ স্বভাবতই পিছিয়ে পড়ে সভ্যতার রাজপথ থেকে। অতএব এখানকার অধিবাসীরা ছিল প্রত্যাশিত মানের শিক্ষা-সংস্কৃতি, রুচি-আচার বিহীন এবং শাস্ত্রের প্রভাব ছিল লঘু। তাই এখানে শাস্ত্রিক নীতি-নিয়ম বিধি বিধানের চেয়ে হৃদয়বৃত্তি এবং প্রাণধর্ম ছিল প্রবলতর।

ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, পূর্ব ময়মনসিংহের নর-নারীর জীবনবোধ কোন প্রকার ধর্মীয় বিশ্বাস কিংবা সাম্প্রাদায়িক মন-মানসিকতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল না। হিন্দু ধর্মের সমাজ-নীতি যেমন তারা স্বীকার করে নি, তেমনি মুসলমান সমাজনীতিও এদের মধ্যে অস্বীকৃত হয়েছে। অতএব এদের একমাত্র পরিচয় এরা মানুষ। তাই ধর্ম ও সমাজ নিরপেক্ষ শাশ্বত মানবিক বৃত্তিই ছিল এদের আচরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য। জাতি-ভেদ নিরপেক্ষ ধর্মীয় সম্প্রীতিযুক্ত এক স্বাধীন মুক্ত উদার সমাজ ব্যবস্থা এই এলাকায় দীর্ঘদিন বিরাজমান ছিল বলে মানুষ সহজেই তাদের হৃদয়বৃত্তি চর্চার সুযোগ পেয়েছিল।

ব্রহ্মপুত্রের পূর্বতীর ও মেঘনার পশ্চিম তীরের সমৃদ্ধ জনপদ কিশোরগঞ্জের সাহিত্য অঙ্গনের খ্যাতি বহুদূর বিস্তৃত।মেঘনার স্রোতধারার মতো তা আজও বয়ে চলছে। এখানকার লোককবিগণ নানারকম ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে,প্রকৃতির প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করে সাহিত্য

Dhaka University Institutional Repository

চর্চা করেছেন। তাঁরা পীর বা দেবতার পাঁচালী গেয়ে প্রকৃতির প্রতিকূল অবস্থা থেকে আত্মরক্ষার প্রয়াস পেয়েছেন। এরই ফলশ্রুতি স্বরূপ আমাদের দেশে রচিত হয়েছে মঙ্গল কাব্য- চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল প্রভৃতি কাব্য। আর এই সমস্ত সাহিত্যই কালক্রমে কিশোরগঞ্জের আঞ্চলিকতার প্রাচীর ভেঙ্গে হয়ে উঠেছে সার্বজনীন।

তথ্যনির্দেশ

১. মো:মোশাররফ হোসেন সাজাহান:কিশোরগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য -আজকের দেশ পত্রিকা, ১লা মে ২০০১

২. মো:সাইদুর -সম্পাদিত-কিশোরগঞ্জের ইতিহাস,জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত।পৃ:২৬ দ্রষ্টব্য

৩. আশুতোষ ভট্টার্চায, বাংলার লোক-সাহিত্য [প্রথম খণ্ড]তৃতীয় সংস্করণ,ক্যালকাটা বুক হাউস,কলিকাতা ,পৃ:৩৯২.

৪.মো:সাইদুর - সম্পাদিত-কিশোরগঞ্জের ইতিহাস,জেলা পরিষদ কতৃর্ক প্রকাশিত,পৃ:১৩ দ্রষ্টব্য।

৫. সৈয়দ আজিজুল হকের 'ময়মনসিংহের গীতিকা জীবন ধর্ম ও কাব্য মূল্য'বই থেকে গৃহীত[পৃ:৮] বাংলা একাডেমী,ঢাকা।

৬. আশুতোষ ভট্টাচার্য,বাংলার লোক-সাহিত্য.[১ম খণ্ড]পৃ:৩৯৪-৩৯৬ কিশোরগঞ্জের ইতিহাস-পৃ:৫৩.

৭.মো:সাইদুর সম্পাদিত-কিশোরগঞ্জের ইতিহাস,পৃ:৩১.

৮. মো:মোশাররফ হোসেন শাহজাহান,কিশোরগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য-আজকের দেশ পত্রিকা.২৯শে মে ২০০১

৯.আশুতোষ ভট্টাচার্য,বাংলার লোক-সাহিত্য,১ম খণ্ড,পৃ৩৯৩

১০.মো:শহীদুর রহমান,ময়মনসিংহ গীতিকায় নারী চরিত্রের স্বরূপ, ,পৃ:৪০-৪১ বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১১. মো:সাইদুর সম্পাদিত,কিশোরগঞ্জের ইতিহাস,পৃ:১৯৬

১২. দীনেশ চন্দ্র সেন,সম্পাদক মৈমনসিংহ গীতিকা,ভূমিকা,পৃ:৬

১৩. দীনেশ চন্দ্র সেন,সম্পাদক ,মৈমনসিংহ গীতিকা, ভূমিকা পৃ:১৬

১৪.মো:মোশাররফ হোসেন শাহজাহান,কিশোরগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য,আজকের দেশ পত্রিকা।

Dhaka University Institutional Repository

৩. কিশোরগঞ্জের লোকসাহিত্যের নানাদিক

কিশোরগঞ্জ একটি প্রাচীন জনপদ। ইত:পূর্বে কিশোরগঞ্জের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য থেকে আমরা অবগত হয়েছি যে, এখানকার অধিকাংশ স্থানই নিম্নাঞ্চল যা ভাটি অঞ্চল নামে পরিচিত।এই অঞ্চলে প্রবাহিত বিভিন্ন নদী-নালা লোকসাহিত্যের উৎস হিসাবেই বহমান।মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ এখানকার লোকসাহিত্যকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। তাছাড়া ষড়ঋতুর বিচিত্র প্রভাব পূর্ব ময়মনসিংহের নর-নারী নির্বিশেষে সবাইকে কাব্যিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে।যার ফলে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা ভাবুক হয়ে উঠেছে,হয়েছে শিল্প ও সংস্কৃতি চেতনা বিলাসী। তাই চিত্ত বিনোদনের উপায় হিসাবে বহুপূর্ব থেকেই এখানে সৃষ্টি হয়েছে মানুষের মুখনিঃসৃত নানারকম সাহিত্য। তাই এখানকার সৃষ্ট লোকসাহিত্য বেশ বৈচিত্র্যময়।

ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব তীরের উর্বর পলিমাটি সমৃদ্ধ জনপদ কিশোরগঞ্জের লোক সাহিত্যের ঐতিহ্যপূর্ণ ভাণ্ডারের কিছুটা বিবরণ ইত:পূর্বে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন নদ-নদী, খাল-বিল ও হাওর দ্বারা প্লাবিত কিশোরগঞ্জের ভাটি অঞ্চলেই বিকশিত হয়েছিল বাংলার শ্রেষ্ঠ লোকসাহিত্যসমূহ। লোকসাহিত্যের প্রতিটি শাখাই এই অঞ্চলের সাহিত্যিক পরিমণ্ডলকে করেছে সিক্ত যা কিশোরগঞ্জের আঞ্চলিক সীমাকে অতিক্রম করে হয়ে উঠেছে সার্বজনীন। নানা রকম গীতিকা, ছড়া, ধাঁধাঁ, লোক সঙ্গীত, প্রবাদ, কাহিনী ইত্যাদি কিশোরগঞ্জের লোক সাহিত্যের ভাণ্ডারকে করেছে সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট।

গীতিকা : গীতিকা লোকসাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য শাখা। বাংলা লোক সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। কিশোরগঞ্জের লোকসাহিত্যের সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ শাখা হল এই এলাকায় প্রাপ্ত গীতিকাসমূহ। দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত মৈয়মনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা এবং বদিউজ্জামান সম্পাদিত 'মোমেনশাহী গীতিকা'য় প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য গীতিকাসমূহ কিশোরগঞ্জের পটভূমিতে রচিত। এর মধ্যে চন্দ্রাবতী, মলুয়া, দস্যু কেনারামের পালা, ইসা খাঁ মসনদালি, বীরাঙ্গনা সখিনা,শ্যাম রায়ের পালা,সোনাই বিবি ইত্যাদির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

বিভিন্ন বিল হাওর ও নদী-নালা বিস্তৃত নিম্নভূমি বা ভাটি অঞ্চলেই এই সমস্ত গীতিকাগুলি জন্মলাভ করেছিল। ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে "প্রকৃতির নিত্য সলিল-সেকে এই অঞ্চলেরই পঙ্কিল মৃত্তিকায় বাংলার শ্রেষ্ঠ গীতিকার শতদলগুলি বিকশিত হয়েছিল। এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য গীতিকাগুলির প্রতিপদে যুক্ত হইয়া আছে, সেইজন্য একটি সার্বজনীন আবেদন সত্ত্বেও আঞ্চলিক আবেদনটি ইহাদের মধ্যে অধিকতর প্রত্যক্ষ বলিয়া বোধ হয়। এই জন্য এই গীতিকাগুলি ইহার নিজস্ব সীমা অতিক্রম করিয়া বাংলার অন্যত্র বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই।"[১]

কিশোরগঞ্জে প্রাপ্ত গীতিকাগুলোতে বিষয়ের বৈচিত্র্য থাকলেও স্বাধীন প্রেমের মহিমা কীর্তনই অধিকাংশ গীতিকার মূল লক্ষ্য। এই প্রেমকে ধারণ করে আছে নারী। একটি বলিষ্ঠ নারীত্বের মর্যাদা গীতিকাগুলোর ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। প্রেমের জন্য দুঃখ,যন্ত্রণা, আত্মত্যাগ, সর্বসমপণ করে নারী যে কি অসীম মহিমা লাভ করতে পারে, গীতিকাগুলিতে তারই প্রতিফলন দেখা যায়। গীতিকাগুলি মূলত প্রেমমূলক হলেও জাতীয় ভক্তিবোধ, মানবপ্রীতি বাঙালি চরিত্রের এই সকল উচ্চতর গৌরবের দিকগুলিও এদের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এই সমস্ত গীতিকার বিষয়গুলি নিতান্ত কিশোরগঞ্জের আঞ্চলিক বিষয় হলেও সাধারণ পল্লীকবির স্বাভাবিক কবিত্ব স্পর্শে পল্লী উপাদনে

Dhaka University Institutional Repository

অলংকৃত হয়ে যে রস ও ভাবটি নিবেদন করা হয়েছে তা বাংলা সাহিত্যের এক অভিনব ঐশ্বর্যে পরিণত হয়েছে।

লোককাহিনী : লোকসাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য শাখা হচ্ছে লোক কাহিনী। গল্প বলা বা গল্প শোনার প্রবৃত্তি এদেশের মানুষের মাঝে চিরদিনই বিদ্যমান ছিল। যুগ যুগ ধরে এদেশের মানুষ তাদের অবসর বিনোদনের উপায় হিসাব গল্প বা কাহিনীকে বেছে নিয়েছে। তাই আবহমান কাল ধরে এদেশে চলে এসেছে গল্প বলার রীতি। লোক-মুখে প্রচলিত এই গল্প বলার রীতি থেকে লোক কাহিনীর জন্ম হয়েছে। কিশোরগঞ্জ জেলার লোককাহিনীর ভাণ্ডার বেশ সমৃদ্ধ। কিশোরগঞ্জ জেলা থেকে সংকলিত লোক কাহিনীগুলিকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। যেমন এই অঞ্চলের লোক কাহিনীর রোমাঞ্চ কথা, রাক্ষস-খোক্কসের গল্প, সহজ-সরল মানুষের বোকামির গল্প, বিভিন্ন রকম রঙ্গ কথা ইত্যাদি। এই সমস্ত কাহিনীর মাধ্যমে এই অঞ্চলের মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা, সহজাত মনোবৃত্তি, ধর্মীয়- সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে।

কিংবদন্তি : লোকসাহিত্যের অপর একটি শাখা হচ্ছে কিংবদন্তি। অতীত সমাজ জীবনের অন্তর্ভুক্ত কোন বীর কিংবা সাধকের চরিত্র অথবা কোন ঐতিহাসিক স্থানকে অবলম্বন করে এটি রচিত হয়ে থাকে। তারপর যতদিন পর্যন্ত সমাজ তাদের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করে চলে ততদিন পর্যন্ত তাদের সম্পর্কিত কাহিনীগুলিও স্মৃতির মধ্যে রক্ষা করে। কালক্রমে সমাজে তাদের জীবনাদর্শ ভ্রষ্ট হয়ে পড়লে, সমাজের স্মৃতি হতে এরা লুপ্ত হয়ে যায়।

কিশোরগঞ্জ একটি প্রাচীন জনপদ। তাই এখানে জন্ম নিয়েছে নানা কিংবদন্তির। ব্রহ্মপুত্রের পূর্বতীরে অবস্থিত কিশোরগঞ্জ জেলা প্রাচীন কাল থেকেই ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে ধারণ করে আছে। কিশোরগঞ্জ শহরের অদূরে অবস্থিত জঙ্গলবাড়ী। বাংলার বার ভূঞার অন্যতম প্রধান ঈশা খাঁ মসনদে-ই- আলার দ্বিতীয় রাজধানী হিসাবে জঙ্গলবাড়ীর খ্যাতি সর্বজনবিদিত। বীরকেশরী ঈশাখাঁনের বীরত্ব, শৌর্য, বীর্য এবং মানবিক মহানুভবতা এখানকার ইতিহাসকে দিয়েছে অসাধারণ গৌরব। বার ভূইঁয়ার বীর ঈসা খাঁ ও দোর্দন্ড প্রতাপ মোগল সেনাপতি মানসিংহের ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের রক্ত চঞ্চল স্মৃতি বিজাড়িত বহু কাহিনী কিশোরগঞ্জ জেলার বিভিন্ন স্থানকে কেন্দ্র করে এখনও বহমান। এছাড়াও এখানকার বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান, নদ-নদী, এবং ব্যক্তিত্বকে নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে নানা রকম কিংবদন্তির। যেমন কোশাকান্দার কিংবদন্তি, ভেলুয়া সুন্দরীর কিংবদন্তি, শ্যায রায়ের কাহিনী, বেবুদ রাজার কাহিনী,প্রামাণিকের কাহিনী, কাতিয়ারচরের কাহিনী ইত্যাদি। এই সমস্ত কাহিনী সাধারণ মানুষের ভক্তি ও বিস্ময়বোধ থেকে জন্ম নিয়ে শত বৎসরের মধ্যে পরিণত হয়েছে কিংবদন্তিতে যা এই অঞ্চলে আজো অস্তিত্বমান।

লোকসংগীত : প্রত্যেক দেশেই লোকসাহিত্যের সংগীত বিষয়টি সমৃদ্ধতর হয়ে থাকে। বাংলা লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয় নাই। বাঙালি জীবনের বিচিত্র অনুষঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে- বাংলার লোকসংগীত। আধ্যাত্মিক ভাব- সম্পকিত সংগীত এদেশের সমাজে বিভিন্ন ধর্ম মতের প্রভাব বিস্তৃত হলেও লোকসংগীত রচনার ধারাটি এখানে অব্যাহতই রয়ে গেছে, কোন কোন স্থলে এদের উপর ধর্মীয় একটি রূপ প্রত্যক্ষ হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এদের মানবিকতার মূল্য অক্ষুন্ন আছে। কিশোরগঞ্জের লোকসংগীতের খ্যাতি সর্বজনবিদিত। বিশেষ করে এই অঞ্চলের ভাটিয়ালি গান কিশোরগঞ্জের আঞ্চলিক সীমাকে অতিক্রম করে হয়ে উঠেছে সার্বজনীন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে কিশোরগঞ্জ জেলা নদীমাতৃক। এখানে অসংখ্য নদী-নালা, বিল-ঝিল ও হাওরের সমাহার। তাই জলের সঙ্গে এই এলাকার মানুষের একটা বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। নদীর ধারে ও বুকের উপর বাস করে যে সমস্ত চাষী ও মাঝি, দৈনন্দিন জীবন-যাপনের মাধ্যমে নদীর সঙ্গে যাদের প্রাণের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, তাদের আনন্দ বেদনার প্রধান উৎসই হচ্ছে

Dhaka University Institutional Repository

ভাটিয়ালি গান। এই গানের মধ্য দিয়েই নিরক্ষর চাষী ও মাঝির সুখ-দুঃখের, প্রেম -ভক্তি -ভালবাসার নানা কথা সরল সৌন্দর্যে ফুটে ওঠে।

ভাটিয়ালি গানের পরেই এই এলাকার জারি ও সারি গানের নাম উল্লেখ করতে হয় কিশোরগঞ্জের লোকসংগীতে জারি ও সারি গান একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। কারবালার মর্মান্তিক কাহিনীই জারি গানের বর্ণনীয় বিষয়। মহররম মাস আসার সঙ্গে সঙ্গে এখানকার পাড়া-গাঁয়ে জারি গানের দল তৎপর হয়ে ওঠে।

মাঠের গান, নদীর গান হল সারি। সারি মূলত কর্মসংগীত। বিভিন্ন কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত যে গান তাই সারি গান। কিশোরগঞ্জের মানুষ মূলত কৃষি এবং নদীকে কেন্দ্র করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। ধান-নদী-নৌকা তাদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। তাই দেখা যায় নৌকা বাইচের সময় অথবা মাঠের কাজে চাষীরা সমস্বরে যোগান দিয়ে যে গান গেয়ে থাকে, তাই এই অঞ্চলের বিখ্যাত সারি গান।

ভাটিয়ালি জারি-সারি ছাড়াও এই অঞ্চলে আরো যে লোকসংগীতের সন্ধান পাওয়া যায় সেইগুলির শ্রেণীবিভাগ করা যায় এইভাবে- পার্বণাদি উপলক্ষ্যে গীত মেয়েলি গান, বিবাহের গান, ব্রতের গান ইত্যাদি; উৎসবাদি উপলক্ষ্যে গীত পুরুষের নৃত্যসম্বলিত গান, যেমন-ঘাটুগান, জারি-সারি ইত্যাদি। ব্যবসায়ীর গান, যেমন-বেদের গান, পটুয়ার গান ইত্যাদি। এছাড়াও রয়েছে প্রেম ও ভাব-সঙ্গীত। এই সমস্ত সংগীত ভাব ও সুরের বৈচিত্র্যে বাঙালির মনকে চিরদিন রসাসিক্ত করে আসছে।

ধাঁধা : লোক সাহিত্যে ধাঁধা অন্যতম প্রাচীন শাখা হিসেবে বিবেচিত। রূপকের সাহায্যে এবং জিজ্ঞাসার আকারে কোন একটি ভাব সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও চিন্তার অনুশীলনের মাধ্যমে ধাঁধায় রূপায়িত হয়ে ওঠে। ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, 'ইহার বাহিরের পরিচয়টি সংক্ষিপ্ত হইলেও সরস,অন্তর্নিহিত পরিচয়টি অপ্রত্যক্ষ হইলেও বুদ্ধিগম্য।{২}' কিশোরগঞ্জের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে নানা রকম ধাঁধা সংগ্রহ করা হয়েছে। এখানে তা শিলুক নামে পরিচিত। দৈনন্দিন জীবনের বিচিত্র উপকরণই এই সমস্ত শিলুকের বিষয়বস্তু। দরবারী শিলুকের মাধ্যমে চলে বুদ্ধির প্রতিযোগিতা। বিয়ে শাদীর আসরে বা অনুরূপ উৎসব-অনুষ্ঠানে এই জাতীয় শিলুক বা ধাঁধা পরিবেশিত হয়ে থাকে। এই সমস্ত ধাঁধার মাধ্যমে ফুটে ওঠে বুদ্ধির দীপ্তি, রসবোধ, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও আনন্দানুভূতি। মানুষের জীবন-যাত্রার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে এসব ধাঁধা রচিত ও প্রচারিত হয়ে অবসর বিনোদনের উপায় হিসাবেও কাজ করে আসছে।

ছড়া : লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি ছড়া। ছড়াগুলি বিশেষ কোন ব্যক্তির সৃষ্টি বলে মনে করা যায় না, এর সৃষ্টির পেছনে সমষ্টিমনের প্রভাব কার্যকর। বাংলা লোকসাহিত্যে ছড়ার বহু বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। ছড়া কেবলমাত্র শিশুর মনস্তুষ্টির জন্যই রচিত হয়নি। বয়স্কদিগের প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ করার জন্যও রচিত হয়ে থাকে। কিশোরগঞ্জের লোকসাহিত্যের অন্যতম আকর্ষণ এর ছড়া। এখানকার লোক জীবনজাত ছড়াগুলিতে আছে সেই ঐশ্বর্য যা আনন্দকে অবারিত করে, কল্পনাকে বর্ণায়িত করে। এই অঞ্চলের ছড়াগুলিকে বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন-ঘুম পাড়ানির ছড়া, ছেলে ভুলানো ছড়া, কৃষি ও গার্হস্থ্য জীবনের ছড়া। তবে কোন কোন সময় অঞ্চলভেদে একই ছড়ার পাঠে রূপান্তর ঘটে। কিন্তু তার আবেদন থাকে চিরন্তন।

প্রবাদ : লোক সাহিত্যের একটি অন্যতম শাখা হচ্ছে প্রবাদ। প্রবাদ বলতে সাধারণত মানুষের দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার একটি সংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তিকেই বোঝায়। ব্যক্তি বা সমাজ জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফলে প্রবাদের সৃষ্টি এবং নীতি ও উপদেশ বিতরণ করাই এর লক্ষ্য। জীবনের বিচিত্র পরিসরে মানুষ বিভিন্ন বিষয়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তাকে পরবর্তী পর্যায়ে কাজে লাগানোর জন্যই প্রবাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। কিশোরগঞ্জের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য

Dhaka University Institutional Repository

প্রবাদ। কোন প্রাচীনকালে কার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এই সমস্ত প্রবাদের প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল তার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে বাস্তব জীবনের প্রয়োজনে এই সমস্ত প্রবাদের ব্যবহার যুগ যুগ ধরে চলে আসছে এবং এর আবেদন ও উপযোগিতা এখনও বর্তমান রয়ে গেছে। কিশোরগঞ্জ জেলায় প্রাপ্ত প্রবাদগুলি এই অঞ্চলের বা জাতির বক্তব্য হলেও তা সকলের জন্যেই প্রযোজ্য হয়ে পড়ে। তাই ভৌগোলিক সীমায় প্রবাদকে সাধারণত সীমাবদ্ধ করা যায় না। দেখা যায় যে, একই ভাব -সম্বলিত প্রবাদ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাষায় প্রচলিত হয়ে থাকে। তাই কেবলমাত্র ভাব এবং ভাষার মাধ্যমেই এদের উৎপত্তি স্থল নির্ধারণ করতে হয়।

কিশোরগঞ্জের লোকসাহিত্যের বৈচিত্র্যময় সম্ভারের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ উল্লেখিত আলোচনায় তুলে ধরা হলো। কিশোরগঞ্জের লোকসাহিত্যে সংরক্ষিত রয়েছে এতদঞ্চলের জনগণের জীবন-যাত্রার সকল স্তরের অভিজ্ঞতাসার, সংসার জীবনের ও কর্ম বন্ধনের মৌল সূত্রাবলী, প্রকৃতিকে বশীকরণের অমোঘমন্ত্র। মানুষের মানুষ হয়ে উঠার প্রক্রিয়া এখানে রূপকে, উপমায়, আভাসে, সুরে বিশ্লেষিত ও বিস্তারিত। এ এক সামাজিক-পারিবারিক চিত্রশালা। সমাজতাত্ত্বিক-নৃতাত্ত্বিক ইতিহাসের এক দুর্লভ যাদুঘর। সেই নির্মাণাপেক্ষ ইতিহাস আমাদের মমতাময় স্পর্শের জন্য আকুল। তাই আমাদের বার বার ফিরে যেতে হয় ঐ লোকায়ত উৎসের কাছে।

৩.১ গীতিকা

গীতিকা বাংলা লোকসাহিত্যের একটি বিশ্বনন্দিত ধারা।এর উদ্ভবকালের সঠিক পরিচয় পাওয়া দুষ্কর।তবে ষোড়শ থেকে ঊনবিংশ এই তিন শতাব্দীর মধ্যবর্তীকালে গীতিকাগুলি রচিত হয়েছে বলে ফোকলোর বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেছেন।বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে শুরু হয় এগুলির সংগ্রহ;তৃতীয় দশক থেকে সম্পাদনা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগের অধ্যাপক ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের অনুপ্রেরণায় এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থানুকুল্যে চন্দ্রকুমার দে,কেদারনাথ মজুমদার,কবি জসীমউদ্‌দীন,আশুতোষ চৌধুরী প্রমুখ সংগ্রহ করেছিলেন পূর্ববঙ্গের অসংখ্য গীতিকা।পরবর্তীতে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন 'মৈমনসিংহ গীতিকা' এবং 'পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা'নামে চার খণ্ডে গীতিকাগুলি প্রকাশ করেন।তিনি এগুলিকে ইংরেজি ভাষাতেও অনুবাদ করেন।ফলে গীতিকাগুলি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফরাসি পণ্ডিত 'রমা রোঁলা' ও 'সিলভা লেভী,' জার্মান পণ্ডিত 'হানস মোডে' প্রমুখ পণ্ডিত পূর্ব বাংলার এইসব গীতিকার অনিন্দ্য সৌন্দর্যে এবং মানবিকতায় মুগ্ধ হন।

'মৈমনসিংহ গীতিকা' এবং 'পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা'র অন্তর্গত অধিকাংশ গীতিকাই কিশোরগঞ্জের পটভূমিতে রচিত। মানবিকতা, প্রণয়ে অসীম মহিমা, অসম্প্রদায়িক চেতনা, অপূর্ব কাব্য সৌন্দর্য প্রভৃতির দিক থেকে এই সমস্ত গীতিকাগুলো বাংলা সাহিত্যে অনন্য।এই অঞ্চলের নানাবিধ ঘটনাবলীর আলোকেই গীতিকাসমূহ রচিত হয়েছে।তবে অধিকাংশ গীতিকা প্রেমমূলক এবং এই প্রেমকে ধারণ করে আছে এই অঞ্চলের নারীগণ।পূর্বেই বলা হয়েছে, এই অঞ্চলে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় নারীই প্রধান।তাই গীতিকাগুলিতে নারীচরিত্রের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

কিশোরগঞ্জে প্রাপ্ত গীতিকাগুলির মধ্যে চন্দ্রাবতী,মলুয়া,দস্যুকেনারামের পালা, দেওয়ান ইসা খাঁ মসনদালি,ফিরোজ খাঁ দেওয়ান,শ্যাম রায়ের পালা,সোনাই বিবি,গকুল চান ও আইধর চান ইত্যাদি প্রধান। চন্দ্রাবতী মনসামঙ্গলের অন্যতম প্রধান কবি দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা। সম্ভবত তিনিই বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি। কিশোরগঞ্জ সদর থানার মাইজখাপন ইউনিয়নের পাতুয়াইর গ্রামে ষোড়শ শতকের মধ্যবর্তী সময়ের কিছু পরে কবি চন্দ্রাবতী জন্ম গ্রহণ করেছিলেন । বাংলার আদি মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর জন্মস্থান ও তাঁর রচনায় সিক্তভূমি কিশোরগঞ্জের কথা মনে করে যে-কোন কিশোরগঞ্জবাসী গৌরব বোধ করতে পারেন। চন্দ্রাবতী যেমন কবি ছিলেন তেমনি ছিলেন রোমান্টিক মনের অধিকারী। তবে কবির ব্যক্তি জীবনের ইতিহাস বড়ই করুণ যেন এক বিয়োগান্তক কাহিনী। কবির

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তি জীবনের প্রেমের করুণ পরিণতির জন্য নিজেই লোক কাব্যের নায়িকা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন।'মলুয়া' পালাটিতে মলুয়ার প্রেমের করুণ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ সমাজের উৎপীড়নে মলুয়ার জীবনে কিভাবে ট্রাজিডি নেমে আসে তাই এই পালার বর্ণিত বিষয়।শ্যাম রায়ের পালাটিতে জমিদার পুত্রের সঙ্গে ডোমবধুর এক অসম প্রেম কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।কিশোরগঞ্জে প্রাপ্ত পালাগুলোর মধ্যে 'দস্যু কেনারামের পালা' টি ব্যতিক্রম।নর-নারীর রোমান্টিক প্রেম নয়,মানবীয় প্রেমের মহিমাই এখানে বর্ণিত হয়েছে।'ইসা খাঁ মসনদালি'এবং 'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান'পালা দুটি এই অঞ্চলের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর আলোকে রচিত হলেও এর মধ্যে রোমান্টিক প্রেমাবেগের আভাস পাওয়া যায়।'সোনাই বিবি' এবং 'গকুল চান ও আইধর চান'পালা দুটিতে রোমান্টিক ঘটনাবলী সন্নিহিত হলেও পালা দুটির কাহিনী বাস্তবতার সঙ্গে অসামঞ্জস্য এবং অলৌকিক ঘটনাবলিতে পরিপূর্ণ।

৩.১.১ চন্দ্রাবতী

কবি নয়ানচাঁদঘোষ চন্দ্রাবতীর ব্যক্তিগত জীবনকাহিনী নিয়ে রচনা করেছেন 'চন্দ্রাবতী' গীতিকাটি। ১৭০০ শতকে রচিত ৩৫৪টি ছত্র ও ১২টি অঙ্কে বিভক্ত নয়ানঘোষ প্রণীত 'চন্দ্রাবতী' পালায় চন্দ্রাবতীর জীবনকাহিনী অতি সুন্দর ভাবে বিবৃত হয়েছে। সংক্ষিপ্ততার গুণে চন্দ্রাবতী পালাটির গীতিকাগত বৈশিষ্ট্য অধিকতর পরিস্ফুট হয়েছে। একটি মাত্র হৃদয়ভেদী দীর্ঘ নিঃশ্বাসে যেন এই ব্যর্থ প্রেমের কাহিনীটি শেষ হয়েছে। কাহিনীটি এই–

চন্দ্রাবতী ছিলেন পরমা সুন্দরী এবং বাল্যকাল থেকেই তিনি কাব্য রচনা করতেন। তাঁর রূপ ও গুণের খ্যাতি শুনে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তার পাণিগ্রহণে ইচ্ছুক হলো কিন্তু চন্দ্রাবতীর প্রাণের দেবতা ছিলেন পার্শ্ববর্তী গ্রামের জয়ানন্দ নামক এক ব্রাহ্মণ যুবক। পিতার শিব পূজার জন্য চন্দ্রাবতী যখন প্রতিদিন ফুল তুলতে নির্জন পুকুর ধারে যায়, জয়ানন্দ তখন তাকে ফুল তুলতে সাহায্যে করত ,এইভাবেই তাদের প্রেমের সূত্রপাত হয়। নয়ান চাঁদ ঘোষ তাঁর পালায় বর্ণনা করেন -

এক দুই তিন করি ক্রমে দিন যায়।
সকাল সন্ধ্যা ফুল তুলে কেউনা দেখতে পায়॥
ডাল যে নোয়াইয়া ধরে জয়ানন্দ সাথী।
তুলিল মালতী ফুল কন্যা চন্দ্রবতী॥
একদিন তুলি ফুল মালা গাঁথি তায়।
সেইত না মালা দিয়া নাগরে সাজায়॥

একদিন পত্র মারফত জয়ানন্দ তার মনের সমস্ত আবেগ-আকাঙ্ক্ষা ভালবাসার কথা চন্দ্রাবতীকে জানায় এবং মিনতি করে তার পত্রের জবাব দিতে, পালায় বর্ণিত হয়েছে -

যেদিন দেখ্যাছি কন্যা তোমার চান্দবন্দন।
সেই দিন হইয়াছি আমি পাগল যেমন॥
তোমার মনের কথা আমি জানতে চাই।
সর্বস্ব বিকাইবাম পায় তোমারে যদি পাই॥
আজি হইতে ফুল তোলা সাঙ্গ যে করিয়া।
দেশান্তরি হইব কন্যা বিদায় যে লইয়া॥
তুমি যদি লেখ পত্র আশায় দেও ভর।
বেতাল পদে হইয়া থাকবাম তোমার কিঙ্কর॥

Dhaka University Institutional Repository

পত্রপ্রাপ্তির পর চন্দ্রাবতীর হৃদয়ে প্রেমের ফল্গুধারা প্রবাহিত হতে লাগল। কিন্তু সে তার হৃদয়ের অব্যক্ত আশা গোপন করে পত্রের উত্তর দিল -

ঘরে মোর আছে বাপ আমি কিবা জানি।
আমি কেমনে দেই উত্তর অবলা কামিনী॥
যত না মনের কথা রাখিল গোপনে।
পত্রখানি লেখে কন্যা অতি সাবধানে॥

ক্রমান্বয়ে জয়ানন্দের প্রেমের ধারায় সিক্ত হয়ে চন্দ্রাবতী তাকে হৃদয়দান করে। চন্দ্রার প্রেমিক মন হয় উদ্বেলিত। মনে মনে চন্দ্রাবতী জয়ানন্দকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য দেবতার কাছে প্রার্থনা করে-

চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী করি মনের দিকে চাইয়া।
জায়ানন্দ মাগে বর ধর্ম সাক্ষী দিয়া॥

বাড়ীর আগে ফুট্যা রইছে মল্লিকা মালতী।
জন্মে জন্মে পাই যেন তোমার মতন পতি॥

উভয়ের মিলনে কোন বাধা ছিল না। তাই চন্দ্রা ও জয়ানন্দের বিয়ের প্রস্তাব যখন পিতা বংশীদাসের নিকট এল তখন তিনি বিয়েতে সম্মতি দান করেন এবং বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক সহ যাবতীয় আয়োজন সম্পন্ন হয়।

বিবাহের যত কিছু করে আয়োজন।
যতেক দেবতা গণের করিল পূজন॥

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘটে যায় আর এক দুর্ঘটনা। জানা যায়, চঞ্চলমতি জয়ানন্দ এক মুসলমান নারীতে আসক্ত। সেই রমণীর প্রেম জয়ানন্দকে এমনই উন্মত্ত করে তুলে যে, আবাল্য সাথী চন্দ্রাবতীর সঙ্গে তার বিয়ের সবকিছু সে বিস্মৃত হয় এবং ধর্মান্তরিত হয়ে ঐ মুসলমান রমণীকে বিয়ে করে। অপ্রত্যাশিত এই ঘটনায় এবং অনাকাঙ্ক্ষিত বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে যায় চন্দ্রাবতী। ভেঙে যায় তার কোমল হৃদয়, অন্তরে জাগ্রত হয় বৈরাগ্য। তিনি আমৃত্যু শুদ্ধাচারিণীর মত শিবপূজায় মনোনিবেশ করে সারা জীবন কাটিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। চন্দ্রাবতী পিতা দ্বিজবংশী দাসের নিকট নিবেদন করেন দুটি প্রার্থনা। একটি ফুলেশ্বরী নদীর তীরে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা {যে মন্দিরটি আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর জন্ম স্থানে}আর অন্যটি চিরকুমারী থাকার ইচ্ছা। স্নেহময় পিতা তাঁর দুটি প্রার্থনাই মঞ্জুর করলেন । নিদারুণ আঘাতে যাতে চন্দ্রাবতী একেবারে মুষড়িয়ে না পড়েন সেজন্য তাঁর মনকে অন্যদিকে ধাবিত করার জন্য বংশীদাস কন্যাকে রামায়ণ কাব্য রচনা করতে আদেশ দেন।

অনুমতি দিয়া পিতা কয় কন্যার স্থানে।
শিবপূজা কর আর লেখ রামায়ণে॥
নির্মাইয়া পাষান শিলা বানাইলা মন্দির।
শিবপূজা করে কন্যা মন করি স্থির॥

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু সীতার বনবাস পর্যন্ত লেখার পর চন্দ্রা সম্মুখীন হয় আর একটি দুর্ঘটনায়। কারণ জয়ানন্দ তার ভুল বুঝতে পেরে আত্মগ্লানিতে দিশেহারা হয়ে যায়। অপরাধবোধ আর অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে জয়ানন্দ চন্দ্রার দর্শন প্রার্থী হয়ে এক পত্র লিখলেন। পালার জয়ানন্দের অভিব্যক্তি ব্যক্ত হয়েছে এভাবে -

শুনরে প্রাণের চন্দ্রা তোমারে জানাই।
মনের আগুনে দেহ পুড়্যা হইছে ছাই॥
ক্ষমা কর চন্দ্রাবতী ধরি তোমার পায়।
একবার দেখিব তোমার জন্ম শেষ-দেখা॥

পত্র পাঠে চন্দ্রার মন আবার আলোড়িত হয়ে ওঠে। ভাল হোক মন্দ হোক সে তো জয়ানন্দকে প্রাণপণে ভালবাসত। তাই জয়ানন্দের শেষ ইচ্ছা পূরণ করার জন্য চন্দ্রা পিতার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করল -

শুন শুন বাপ আগো শুন মোর কথা।
তুমি সে বুঝিবে আমি দুঃখিনীর ব্যথা॥
জয়ানন্দ লেখে পত্র আমার গোচরে।
তিলকের ল্যাগ্যা চায় দেখিতে আমারে॥

কিন্তু যার কারণে কন্যার জীবনে এমন করুণ পরিণতি নেমে এসেছে, তার সঙ্গে সাক্ষাতের প্রশ্নই আসেনা বিধায় পিতা দ্বিজবংশী দাস উভয়ের সাক্ষাতে অসম্মতি প্রকাশ করলেন। চন্দ্রা জয়ানন্দকে পত্র লিখে সাক্ষাত দিতে অপারগতার বিষয়টি জানিয়ে দিলেন। অনুতপ্ত জয়ানন্দ পত্র পাঠ করে উদ্ভ্রান্তের মত চন্দ্রাবতীর মন্দিরের দ্বারদেশে উপস্থিত হল -

দ্বার খোল চন্দ্রাবতী তোমারে শুধাই।
জীবনের শেষ তোমায় একবার দেখ্যা যাই॥

কিন্তু মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করে চন্দ্রাবতী তখন শিব পূজায় নিমগ্ন হলেন। অভিমানী চন্দ্রা জয়ানন্দকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেন।

পাগল হইয়া নাগর কোন কাম করে।
চারিদিকে চাইয়া দেখে নাহি দেখে কারে॥
না খোলে মন্দিরের কপাট নাহি কয় কথা।
মনেতে লাগিল যেমন শক্তি শেলের ব্যাথা॥

হতভাগ্য জয়ানন্দ তখন মন্দিরের প্রাঙ্গনে সদ্য ফোটা সন্ধ্যামালতী ফুলের রস নিংড়িয়ে মন্দিরের কপাটের উপর চার ছত্র কবিতা লিখে যান -

শৈশব কালের সঙ্গী তুমি যৈবনকালের সাথী।
অপরাধ ক্ষমা করো তুমি চন্দ্রাবতী॥
পাপিষ্ঠা জানিয়া মোরে না হইলা সম্মত।
বিদায় মাগি চন্দ্রাবতী জনমের মত॥

ধ্যান ভাঙার পর চন্দ্রাবতী মন্দির স্থলে এ লেখা দেখতে পায়।জয়ানন্দের এই লেখা ধুয়ে মন্দিরকে পবিত্র করার জন্য চন্দ্রা কলসী নিয়ে জল আনতে নদীর ঘাটে গিয়ে দেখল -

Dhaka University Institutional Repository

জলে গেল চন্দ্রাবতী চক্ষে বহে পানি।
হেন কালে দেখে নদী ধরিয়ে উজানী॥
একেলা জলের ঘাটে সঙ্গে নাহি কেহ।
জলের উপরে ভাসে জয়ানন্দের দেহ॥

এই দৃশ্য দেখার পর চন্দ্রার মুখে আর কোন ভাষা নাই, তার চোখে কোন জলও নাই।

আখিতে পলক নাহি মুখে নাই সে বানী।
পারেতে খাড়াইয়া দেখে উমেদা কামিনী॥

চন্দ্রাবতীর আহত প্রেম নিরব অভিমানের ভিতর দিয়াই পরিসমাপ্ত হয়েছে। নয়ানচাঁদ ঘোষ প্রণীত চন্দ্রাবতী পালাটি এই পর্যন্তই জানা যায়। তবে কেউ কেউ বলেছেন বাল্যের খেলার সাথী ও যৌবনের সাথীকে মৃত অবস্থায় জলের উপর ভাসতে দেখে তীব্র অনুশোচনায় চন্দ্রাবতীও ফুলেশ্বরীর জলে ঝাঁপিয়ে জয়ানন্দের অনুগামী হন। আবার কারো মতে জয়ানন্দের মৃত্যুর অল্প কিছু দিন পরই শোকাভিভূত চন্দ্রাবতীও দেহ ত্যাগ করেন। তবে এটা ঠিক জয়ানন্দের মৃত্যুতে চন্দ্রাবতী মর্মান্তিক আঘাত পান ফলে তাঁর আর কবিতা লেখা হল না। রামায়ণও অসমাপ্ত রয়ে যায়। চন্দ্রাবতীর অসমাপ্ত রামায়ণ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কিশোরগঞ্জের এই মহিয়সী রমণীকে চির অমর করে রেখেছে।

৩.১.২ *মলুয়া*

কিশোরগঞ্জের প্রাপ্ত গীতিকাগুলোর মধ্যে মলুয়া অন্যতম। গীতিকায় সংযোজিত বন্দনা অংশটি থেকে জানা যায় এর রচয়িতা কবি 'চন্দ্রাবতী'। তবে দীনেশচন্দ্র সেন এই মত গ্রহণ করেননি। তাঁর মতে, এই গাথাটি ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে রচিত হতে পারে। যেহেতু চন্দ্রাবতী ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে সাহিত্য রচনা করেছেন সেহেতু তাঁর দ্বারা এই গাথাটি রচিত হতে পারে না। দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় সংযোজিত ভূমিকা থেকে জানা যায়, এই গাথাটি চন্দ্রকুমার দে কিশোরগঞ্জ জেলার তাড়াইল থানা থেকে সংগ্রহ করে ১৯২১ সালে ৩রা অক্টোবর দীনেশচন্দ্র সেনের নিকট প্রেরণ করেন।

কিশোরগঞ্জের সামাজিক পটভূমিতে এক তেজোদীপ্ত নারীর মর্মান্তিক কাহিনীই পালাটিতে ফুটে উঠেছে। নারীত্বের এই দুর্লভ রূপ আর কোন গীতিকাই এমন স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেনি। গীতিকায় বর্ণিত কাহিনীটি ছিল মোটামুটি এই- চান্দবিনোদ বিধবা জননীর একমাত্র সন্তান। কৃষিকাজই ছিল তাদের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র অবলম্বন। অকাল বৃষ্টিতে একবার ক্ষেতের ধান নষ্ট হয়ে গিয়ে সারা দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। চান্দবিনোদ তার মাকে নিয়ে অতিকষ্টে দিনযাপন করতে থাকে। পালায় বর্ণিত আছে -

চান্দ বিনোদ আসি কয় মায়ের কাছে।
আইশ্না পানিতে মাও সব শস্যি গেছে॥
মায়ে কান্দে পুত্র কান্দে সিরে দিয়ে হাত।
সারা বছরের লাগ্যা গেছে ঘরের ভাত॥
টাকায় দেড় আড়া ধান পইড়াছে আকাল।
কি দিয়া পালিব মায়া কুলের ছাওয়াল।

Dhaka University Institutional Repository

উপায়ন্তর না দেখে চান্দবিনোদ তার জমি ও হালের গরু বিক্রি করে দিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলনা। অভাব অনটন সমগ্র দেশকে গ্রাস করে ফেলল। অবশেষে একদিন চান্দ বিনোদ পিঁজরা হাতে নিয়ে কুড়া পাখি শিকার করতে বিদেশে যাত্রা করল। কুড়া শিকার করতে বিনোদ অবশেষে আসে ইটনা থানার আড়ালিয়া গ্রামে। সারা দিনের ভ্রমনক্লান্ত বিনোদ দুপুর বেলায় সেই গ্রামের এক পুকুর পাড়ে গাছের নীচে ঘুমিয়ে পড়ে। এই গ্রামেরই মোড়লের কন্যা মলুয়া কলসী নিয়ে পুকুর ঘাটে জল আনতে গিয়ে দেখতে পায় ঘুমন্ত বিনোদকে। অপরিচিত এক সুদর্শন পুরুষ, কোথায় তার বাড়ী কি নাম কি তার পরিচয় ইত্যাদি নানা কৌতুহল মলুয়ার মনে দানা বেঁধে ওঠে। সেই সঙ্গে জন্ম নেয় অনুরাগ। কিন্তু ঘুমন্ত বিনোদকে সে জাগাবে কি করে, অবশেষে সে শূন্য পিতলের কলসীতে জল ভরার শব্দ করে ,আর সেই শব্দে ঘুমন্ত বিনোদ জেগে উঠে, কবির ভাষায় -

শুনরে পিতলের কলসী কইয়া বুঝাই তরে।
ডাক দিয়া জাগাও তুমি ভিন পুরুষেরে॥
এত বলি কলসী কন্যা জলেতে ভরিল।
জল ভরণের শব্দে বিনোদ জাগিয়া উঠিল॥

ঘুম ভাঙ্গার পর বিনোদ মলুয়াকে দেখে তার রূপে মুগ্ধ হয়ে এবং সেই রূপের আগুনে দগ্ধ হতে থাকে -

এমন সুন্দর কন্যা না দেখি কখন।
কার ঘরের উজল বাতি চুরি করল মনা॥

মলুয়ার হৃদয়েও প্রবাহিত হয় প্রেমের শতধারা। দুজন দুজনকে ভালবেসে ফেলে। মলুয়া জল আনার ছল করে জলের ঘাটে চান্দ বিনোদের সাথে দেখা করতে যায়। কবির ভাষায়-

কিসের ছান কিসের পানি কিসের জল ভরা।
দুইয়ের প্রাণে টান পইরাছে এমন প্রেমের ধারা॥

মলুয়ার বাবার কাছে বিনোদের মা বিয়ের প্রস্তাব পাঠাল। কিন্তু দারিদ্র্যের জন্য মলুয়ার পিতা বিনোদের কাছে কন্যাদান করতে অস্বীকার করেন। বিনোদ অর্থোপার্জনের জন্য নানা উপায় সন্ধান করতে থাকে। অবশেষে সে পুনরায় কুড়া শিকার করতে বিদেশে যাত্রা করল। কিছুদিন পর যখন বিনোদ বিদেশ হতে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে দেশে ফিরে তখন মলুয়ার পিতা কন্যা সম্প্রদান করতে অস্বীকার করল না। বিনোদ মলুয়াকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে আসল। স্বামী শাশুড়ী সাথে মলুয়ার খুব সুখে দিন যাপন করতে ছিল।

বাড়ীর শোভা বাগবাগিচা ঘরের শোভা বেড়া।
কুলের শোভা বউ শাশুড়ীর বুক জুড়া॥
বউ পাইয়া বিনোদের মা পরম সুখী হইল।
ঘর গিরস্থি যত সব যতনে পাতিল॥

কিন্তু সেই সুখ মলুয়ার বেশী দিন সইল না। কারণ গ্রামের অত্যাচারী কাজীর কুদৃষ্টি পড়ে মলুয়ার উপর। সে মলুয়ার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে পাওয়ার জন্য নানা রকম বুদ্ধি বের করতে লাগল।সে এক কুটনী নারীকে তার পাপ অভিলাষ ব্যক্ত করার জন্য মলুয়ার নিকট পাঠাল ।মলুয়া কুটিনীর প্রস্তাবের রাজী না হয়ে তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিল। কাজি তার মনের অভিলাষ পূর্ণ করতে না পেরে প্রতিশোধপ্রবণ হয়ে ওঠে। সে নজর মরেচার নাম করে বিনোদের উপর পাঁচশত রৌপ্যমুদ্রার পরনা জারি করে। বিনোদ

Dhaka University Institutional Repository

সময়মত পরনা শোধ করতে না পারায় বিনোদের সমস্ত জমি-জমা বাজেয়াপ্ত করে ফেলে। ফলে বিনোদের পরিবার নিদারুণ অর্থ কষ্টে পতিত হয়। বিনোদ তার হালের বলদ, ঘর-বাড়ি সমস্তই বিক্রী করে ফেলে। দারুন দারিদ্র্যের যন্ত্রণা মলুয়া সইতে পারবেনা বিধায় বিনোদ মলুয়াকে বাপের বাড়ী চলে যেতে অনুরোধ করে। কিন্তু পতিপ্রাণা মলুয়ার স্বামীকে কষ্টে রেখে বাপের বাড়ীতে গিয়ে সুখে দিনযাপন করতে মন সায় দিলনা। বরং সে বিনোদকে জানিয়ে দেয় -

বনে থাক ছনে থাক গাছের তলায়।
তুমি বিনে মলুয়ার নাহিক উপায়॥
সাত দিনের উপাস যদি তোমার মুখ চাইয়া।
বড় সুখ পাইবাম তোমার চন্নামতি খাইয়া॥
রাজার হালে থাকি যদি আমার বাপের বাড়ী।
মলুয়া নহেত সেই সুখের আশারী॥

ঘরে বৃদ্ধা জননী ও প্রাণপ্রিয় স্ত্রীর দুঃখ কষ্ট বিনোদ সহ্য করতে না পেরে একদিন কাউকে কিছু না বলে বিদেশ যাত্রা করল। শাশুড়ীকে নিয়ে সূতা কেটে, পরের বাড়ীতে ধান ভেনে অতিকষ্টে মলুয়া জীবন-যাপন করতে থাকে। কিছুদিন পর বিনোদ অর্থ উপার্জন করে দেশে ফিরে আসলে আবার মলুয়া সুখের মুখ দেখতে পায়। কিন্তু এদিকে কাজী নতুন বিপদের সৃষ্টি করে, বিনোদের উপর এক পরওয়ানা জারি করে; সাতদিনের মধ্যে তার সুন্দরী স্ত্রীকে দেওয়ান সাহেবের হাউলিতে নিয়ে উপস্থিত করতে হবে, অন্যথায় বিনোদকে জ্যান্ত কবর দেওয়া হবে। বিনোদ তার প্রিয়তমা স্ত্রীকে দেওয়ানের হাউলীতে দিতে রাজী হল না। তাই আদেশ অমান্য করার অপরাধে কাজীর পাইক পেয়াদা বিনোদকে জ্যান্ত কবর দিতে ধরে নিয়ে যায়। বিনোদকে উদ্ধার করার জন্য মলুয়া কুড়ার মাধ্যমে তার পাঁচ ভায়ের কাছে খবর পাঠায়। পাঁচ ভাই খবর পেয়ে ছুটে এসে বিনোদকে রক্ষা করলেও মলুয়াকে রক্ষা করতে পারে না। কারণ দেওয়ানের লোকজন ইতোমধ্যে মলুয়াকে ধরে নিয়ে গেছে। মনের দুঃখে বিনোদ তার মাকে নিয়ে বাড়ী ঘর ছেড়ে দেশান্তরি হয়। এদিকে দেওয়ান মলুয়াকে পাওয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠে। দেওয়ানের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মলুয়া নানা রকম চিন্তা ভাবনা করে। অবশেষে মলুয়া দেওয়ানকে বলে সে বার মাসের ব্রত পালন করছে, এর মধ্যে নয় মাস পার হয়ে গেছে, আর মাত্র তিন মাস বাকি আছে। এই তিন মাস যেন দেওয়ান তার কাছে না আসে। মলুয়া তার বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে এ যাত্রায় বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছে কিন্তু দেখতে দেখতে যখন এই তিন মাসও চলে যায়, তখন দেওয়ান আবার উপস্থিত হয় মলুয়ার ঘরে। এই বার মলুয়া বাঁচার জন্য অন্য পথ বেছে নেয়। সে দেওয়ানের কাছে দুটি ইচ্ছা পূরণ করতে বলে, এক শয়তান কাজীকে শূলে দেওয়া, দুই মলুয়াকে নিয়ে কুড়া শিকার করতে যাওয়া। দেওয়ান অত্যন্ত খুশি হয়ে মলুয়ার দুটি ইচ্ছা পূর্ণ করে। কাজীকে শূলদণ্ড দেওয়া হল এবং মলুয়াকে নিয়ে শিকারে যাওয়ার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করা হল। এদিকে মলুয়া শিকারের দিন-ক্ষণ-স্থান জানিয়ে তার ভাই এর কাছে পত্র লেখে। সময় মত মলুয়ার পাঁচ ভাই এসে দেওয়ানের নৌকা আক্রমণ করে মলুয়াকে উদ্ধার করে। বিনোদ মনের সুখে মলুয়াকে নিয়ে নিজ বাড়ীতে ফিরে আসে। কিন্তু বিনোদের আত্মীয় স্বজন মলুয়াকে ঘরে তুলে নিতে অস্বীকার করল। তাদের মতে মলুয়া অসতী, কারণ সে তিন মাস মুসলমান দেওয়ানের অধীনে ছিল। পালায় বর্ণিত আছে -

কেহ বলে মলুয়া সে হইল অসতী।
মুসলমানের অন্ন খাইয়া গেল তার জাতি॥
তিন মাস ছিল মলুয়া দেওয়ান সাবের ঘরে।
কেমনে রাখিল প্রাণ না জানি কি মতে॥

Dhaka University Institutional Repository

আত্মীয় স্বজন-বন্ধু-বান্ধবের চাপে বিনোদ মলুয়াকে ত্যাগ করে পুনরায় বিয়ে করে। মলুয়ার ভায়েরা তাকে বাপের বাড়ী চলে আসতে বলে। কিন্তু মলুয়া তার প্রাণপ্রিয় স্বামী বিনোদকে না দেখে থাকতে পারবেনা বিধায় বলে -

বাইর কামুলী হইয়া আমি থাকবার সোয়ামীর বাড়ী।
গোবর ছিডা দিয়াম আমি সকাল সন্ধ্যায় বেলা॥
বাইরের যত কাম আমি করিবাম একালা।

মলুয়া স্বামী গৃহ ত্যাগ করল না। সেখানে দাসী বৃত্তি করতে লাগল। এভাবেই তার দিন কেটে যাচ্ছিল। এর মধ্যে একদিন বিনোদ কুড়া শিকার করতে গেলে তাকে সাপে কামড় দিল।

বাঁচার আর কোন আশাই ছিলনা। মলুয়া তার পাঁচ ভাই এর সহায়তায় গাড়রী ওঝার সাহায্যে পুনরায় বিনোদকে বাঁচাল। তথাপি বিনোদের আত্মীয়-স্বজন মলুয়াকে ঘরে তুলে নিতে অস্বীকার করল। এমনকি বিনোদকে একঘরে করার হুমকি দিল -

বিনোদের মামা বলে হালুয়ার সরদার।
যে ঘরে তুলিয়া লইবে জাতি যাইবে তার॥
বিনোদের পিশা কয় ভাবিয়া চিন্তিয়া।
ঘরেতে না লইব কন্যা জাতি ধর্ম ছাড়িয়া॥

মলুয়া অনেক ভেবে চিন্তা করে দেখল সে জীবিত থাকতে তার স্বামী কোন দিন সুখের মুখ দেখতে পাবে না। বেঁচে থাকলে স্বামীর কলঙ্ক ঘুচবে না মনে করে মলুয়া আত্মহননের পথ বেছে নিল।

ভাবিয়া চিন্তিয়া মলুয়া না দেখে উপায়।
আপনি থাকিতে নাহি স্বামীর দুঃখ যায়॥
বদনাম কলঙ্ক যত না যাইব সোয়ামীর।
পরান ত্যজিব কন্যা মনে কৈল স্থির॥

ঘাটে বাঁধা এক ভাঙ্গা নৌকা নিয়ে মলুয়া নদীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। ভাঙ্গা নৌকায় পানি উঠে মলুয়ার নৌকা গভীর নদীতে নিমজ্জিত হল আর মলুয়াও এই কলঙ্কিত পৃথিবীর দুঃখ-যন্ত্রণা কষ্ট থেকে রক্ষা পেল।

৩.১.৩ *দস্যু কেনারামের পালা*

'দস্যু কেনারামের পালা' টি থেকে জানা যায় , পালাটির রচয়িতা কবি চন্দ্রাবতী. পিতা দ্বিজ বংশীদাস এবং চন্দ্রাবতী নিজে মনসাদেবীর ভক্ত ছিলেন। কিশোরগঞ্জে প্রাপ্ত পালাগুলির মধ্যে 'দস্যু কেনারামের পালা' টি একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির। অন্যান্য গীতিকার মত নর-নারীর রোমান্টিক প্রেম এর বিষয়বস্তু নয়. সাধারণ মানবীয় প্রেমই এর বিষয়বস্তু। এ প্রসঙ্গে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য " পূর্ব ময়মনসিংহ হইতে সংগৃহীত গীতিকাগুলির মধ্যে'দস্যু কেনারামের পালা'র কতকগুলি স্বাতন্ত্র্য আছে।অন্যান্য গীতিকার মতো নরনারীর প্রেম ইহার ভিত্তি নহে-ইহার ভিত্তি সাধারণ মানব-প্রেম।ইহাতে মানুষেরই দু:খের কাহিনী শুনিয়া এক নর ঘাতক দস্যুর পাষাণ হৃদয় দ্রব হইয়াছে।ইহার মূল কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত,কিন্তু স্বতন্ত্র একজন বিশিষ্ট কবির রচিত মনসা-মঙ্গলের আনুপূর্বিক কাহিনীটি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য ইহার মূল কাহিনীর রসটি নিবিড় হইতে পারে নাই।এই পালাটির বিচার করিতে হইলে এই স্বাতন্ত্র্য অংশটি পরিত্যাগ করিয়াই লওয়া প্রয়োজন।"

Dhaka University Institutional Repository

ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের অনুসরণে এখানে পালায় বর্ণিত মনসামঙ্গলের কাহিনীটি বর্জন করে দস্যু কেনারামের জীবন কাহিনীটিই সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হল : -

কিশোরগঞ্জ জেলার জালিয়া হাওরের কাছে বাকুলিয়া গ্রাম। সেই গ্রামে বাস করত দ্বিজ খেলারাম ও তার স্ত্রী যশোধরা। তারা ছিল নি:সন্তান। যশোধরা পুত্র সন্তান কামনা করে মনসা দেবীর পূজা অর্চনা করে এবং দেবীর সন্তুষ্টির ফলে যশোধরার গর্ভে এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। দেবীমনসার বরে জন্ম বলে পিতা-মাতা তাদের সন্তানের নাম দিলেন 'কেনারাম'। শৈশবেই কেনারাম মাতৃহারা হয়ে মাতুলালয়ে আশ্রয় নেয়। খেলারাম এই সুযোগে তীর্থ ভ্রমণ করতে যায় আর ফিরে আসে না। কিন্তু দেশে তখন নিদারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল . মাতুল আর কষ্ট সহ্য করতে না পেরে কেনারামকে পাঁচ কাঠা ধানের বিনিময়ে এক হালুয়ার নিকট বিক্রি করে। হালুয়ার পুত্রগণ ছিল ডাকাত । তাই শৈশবেই কেনারাম ডাকাতি বিদ্যায় বেশ পারদর্শী হল। তার নাম শুনে লোকে শিহরিত হয়ে ওঠে ।

এক ডাকে চিনে তারে দস্যু কেনারাম।
উজান ভাটীয়াল জুড়িয়া হইল বদনাম॥
কেনার নামেতে সবে ভয়ে কম্পমান।
তাহার ভয়েতে কেউ না যান দূরস্থান॥
সন্ধ্যাকালে কেউ না হয় ঘরের বাহির।
আন্ধাইরে করায়ে বাস ভয়েতে অস্থির॥

একদিন দ্বিজবংশীদাস তার মনসা গানের দল নিয়ে জালিয়ার হাওরে উপস্থিত হল। এখানে তার সাক্ষাৎ হল দস্যু কেনারামের সাথে। কেনারাম তার দলবলসহ বংশীদাসের পথ রুদ্ধ করে দাঁড়াল। তার কাছে কোন টাকা কড়ি না পেয়ে এক পর্যায়ে বংশীদাসকে হত্যা করার জন্য খাণ্ডা তুলে ধরল। বংশীদাস বলেন -

------ 'দস্যু নর হত্যা পাপ ।
নরকে যাইবা তুমি না পাইবা মাপ॥
---------- ----------
মানুষ মারিয়া বল কোন প্রয়োজন।
টাকা কড়ি এ সকল নহে কোন ধন ॥'

বংশীদাসের এই কথা কেনারাম পরিহাস বলে মনে করে হেসে উড়িয়ে বলে -

সাত পাচে ভুলাইতে চাও অল্পমতি ॥
মানুষ মারিয়া মোর গেল তিন কাল।
--------- ----------
পাপপুণ্য নাহি জানি মানুষ মারিব।
তোমার কাছেতে ঠাকুর ধর্ম না শিখিব॥

বংশীদাস ধর্মের অনেক কথা শুনিয়েও কেনারামের মন ভুলাতে পারে নি। কেনারাম তাকে হত্যা করার জন্য পুনরায় খাণ্ডা তুলে ধরলে বংশীদাস জন্মের শেষবারের মত একবার মনসার গান করার প্রার্থনা করল :

দুই চক্ষু অশ্রু বহে মনসা স্মরিয়া ।
জীবনের শেষ গান লইব গাহিয়া॥
তাইতে একটু সময় দেও মোরে ধার।
গান শেষে কর তুমি কার্য্য আপনার॥----------

Dhaka University Institutional Repository

বংশীদাসের এই প্রার্থনায় কেনারাম সম্মত হল। বংশীদাস গান আরম্ভ করল, কেনারাম সদলবলে গান শুনতে লাগল ।

যখন বংশীদাস বেহুলার ভাসান অংশটুকু গাইল তখন কেনারাম হাত হতে খাণ্ডা ফেলে দিয়ে কেঁদে ওঠে -

গুরু গো কি গান শুনাইলা গুরু ফিরে কও শুনি।
শুনিয়া পাগল হইল পাষাণের প্রাণী॥
---------- ----------
মানুষ মারিয়া আমি কামাইয়াছি ধন।
জীবন ভরিয়া যত করছি উর্পাজন॥
সেই সব ধন আমি দিব যে তোমায়।
অন্ত কালে স্থান গুরু দিও রাঙ্গা পায়॥
ভিক্ষা না করিও আর বাড়ী বাড়ী ঘুরি।
জীবনের কামাই যত দিবাম ঘড়া ভরি॥

এই কথা বলে কেনারাম দ্বিজ বংশীদাসের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে। আজন্ম সঞ্চিত পাপের জন্য তার অনু শোচনার সীমা রইল না। দস্যুবৃত্তি করে সঞ্চিত সমস্ত ধন সে একে একে নদীর জলে ভাসিয়ে দিল। দু:খে অনুশোচনায় কেনারাম আত্মহত্যা করতে উদ্যত হল। অত:পর দ্বিজবংশী দাস তাকে মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষা দিলে কেনারামের জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হল। কেনারাম দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দ্বিজবংশী দাসের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মনসার গান গায়।

যাহারে দেখিলে লোকের উড়িত পরাণ।
শুনিলে তাহার গান গলয়ে পাষান॥
শিউরি উঠিত লোক যে কেনার নামে।
পাগল হইয়া যায় সেই কেনার গানে॥
পাষান মানুষ হইল মহাজনের বরে।
কেনারাম গায় গীত প্রতি ঘরে ঘরে॥

মনসার বরে এক দিন কেনারামের জন্ম হয়েছিল। দীর্ঘ দিন পর দ্বিজ বংশীদাসের নিকট মনসার গান শুনে তার পুনর্জন্ম হল। দস্যু কেনারাম একজন পরম ভক্তরূপে সমাজে পরিচিত হল।

৩.১.৪ *দেওয়ান ইশা খাঁ মসনদালি*

ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত লোক সাহিত্যের এক বিরল গাথা "দেওয়ান ইশাখাঁ মসনদালি"। ঈশাখাঁ পূর্ব ময়মনসিংহ অঞ্চলের অতি প্রোজ্জ্বল ঐতিহাসিক চরিত্র। কিশোরগঞ্জ শহরের অদূরে অবস্থিত জঙ্গলবাড়ী নামক স্থানে ঈশাখাঁর দ্বিতীয় রাজধানী ছিল। অতএব তাকে অবলম্বন করে এই গীতভূমির কবিগণ যে লৌকিক কাব্য রচনা করবেন , তা খুবই স্বাভাবিক। ঈশাখাঁ এবং তার বংশধরদের কীর্তি কাহিনী অবলম্বনে রচিত মোট চারটি পালা গান পাওয়া গেছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে কোন অজ্ঞাতনামা কবি কর্তৃক প্রথম পালাটি রচিত হয়। দ্বিতীয়

Dhaka University Institutional Repository

পালাটির রচয়িতা কিশোরগঞ্জ জেলার গলাচিপা গ্রামের মুন্‌শী আবদুল করিম বলে মনে করা হয়। (পূর্ববঙ্গ : মৈমনসিংহ গীতিকা শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন , রায় বাহাদুর , বি.এ. ডিলিট কর্তৃক সংকলিত , ২য় খণ্ড , ২য় সংখ্যা)। তবে ঈশাখাঁর কাহিনী অবলম্বনে রচিত পালা গানগুলিতে যে বিবরণ পাওয়া গেছে , তাতে বর্ণনায় সর্বত্র ঐক্য নেই। শ্রী দীনেশ চন্দ্র সেন সংকলিত পূর্ববঙ্গ গীতিকা ২য় খণ্ড , ২য় সংখ্যায় যে পালাটি সংকলিত হয়েছে তা নিম্নরূপ –

নবাব জালাল উদ্দিনের আমলে এক দেওয়ান ছিল নাম কালিদাস গজদানী : রূপ-গুণ, বিদ্যা-বুদ্ধি ,সততা, ন্যায় বিচার সকল কিছুতেই তার তুলনা মেলা ভার। মমিনা খাতুন নামে নবাবের এক সুন্দরী কন্যা ছিল। অনেক নবাবের পুত্র সেই কন্যার পাণিপ্রার্থী হল , কিন্তু কন্যা কাউকেই পছন্দ করতে পারেনা। একদিন মমিনা খাতুন সখীদের নিয়ে স্নান করতে যাওয়ার সময় পথে দেখতে পায় কালিদাসকে। প্রথম দেখাতেই ভাল লাগল। পালায় বর্ণিত আছে –

"তারে দেইখ্যা কইন্যা অইল উন্মত্ত পাগল।
নয়ান ভরিয়া তার সর্বাঙ্গ দেখিল॥
সেই দিন অইতে কইন্যা নাই সে খায় ভাত।
খানা পিনা ছাড়ল নাই সে ঘুম সারা রাইত॥"

মমিনা খাতুন বাদীর মারফতে কালিদাসের কাছে এক পত্র পাঠায়। পত্রে তার ব্যাকুল হৃদয়ের সমস্ত আকুলতা ব্যক্ত করে। পত্র পড়ে কলিদাস মনে মনে হাসে। তারপরে পত্রের উত্তর লিখল –

"আমি হই হিন্দু আর তুমি মুছুলমান।
সাদি কেমনে হয় নইলে সমানে সমান॥
পরান থাকিতে নাই সে মুছুলমান হইব ।
রূপের লাগিয়া আমি জাতি নাহি দিব॥ "

পত্র পড়ে মমিনা ভাত, পানি, নিদ্রা সমস্ত কিছু ত্যাগ করে এবং মনে মনে পণ করে সে প্রাণত্যাগ করবে। কিন্তু এর আগে কালিদাসের জাত নষ্ট করবে। এই উদ্দেশ্যে মমিনা খাতুন একদিন গরু ও ভেড়ার মাংস দিয়ে নানা রকম খাদ্য তৈরি করে চাকর মারফত কালিদাসের নিকট পাঠায়। কালিদাস আনন্দচিত্তে সকল খাদ্যদ্রব্যই গ্রহণ করে। পর দিন প্রভাতে সেই চাকর কালিদাসের জাত নষ্ট করার সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করে।এই কথা শোনার পর কালিদাস মনের দু:খে পাগল হয়ে আত্মহত্যা করার জন্য বের হয়ে পড়ে।
মমিনার পিতা জালালউদ্দিন কালিদাসকে পথ থেকে ধরে আনে এবং তাকে নানা রকম মধুর বচনে প্রবোধ দেয়।এক পর্যায়ে তাকে মমিনাকে বিয়ে করে তার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হতে বলে।

"খুব ছুরত কইন্যা আমার মমিনা খাতুন।
আমি কই তার সঙ্গে সাদির কারণ॥
বেটা পুত্র নাই মোর জান তুমি ভাল ।
আমি মইলে আমার যত পাইবা সকল॥
ধন দৌলত যত আছে সকল তোমার।
মুছুলমান অইছ তাতে সুখ অইল অপার॥"

মুসলমান হওয়ার পর মমিনার সঙ্গে তার বিয়ে হয় এবং তার নাম হয় দেওয়ান সোলেমান। বিয়ের পর তারা সুখে শান্তিতে বাস করে এবং তাদের গর্ভে দুই পুত্র সন্তান জন্ম নেয় - দাউদখাঁ আর ঈশাখাঁ । পনের বছর নবাবী করার পর সোলেমানের মৃত্যু হয় এবং তার বড় পুত্র দাউদখাঁ নবাব হয়। কিন্তু কিছুদিন পরেই দিল্লীর বাদশার ফৌজের সঙ্গে দাউদখাঁ'র যুদ্ধ হলে তিনি যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হন। দাউদখাঁ'র মৃত্যুর পর গৌড়ের নবাব হন

Dhaka University Institutional Repository

ঈশাখাঁ দেওয়ান । তিনি অত্যন্ত প্রজাবৎসল ছিলেন। কিন্তু তিন বৎসর পর ঈশাখাঁ দিল্লীর খাজনা বন্ধ করে দিলে দিল্লীর বাদশা তাঁর উপর অত্যন্ত রুষ্ট হন এবং তিনি শাহবাজ খাঁকে পাঠাল ঈশাখাঁকে বন্দী করার জন্য। শাহবাজখাঁর সাথে ঈশাখাঁর তুমুল যুদ্ধ হল। যুদ্ধে ঈশাখাঁর সকল সৈন্য মৃত্যু বরণ করল। উপায়ান্তর না দেখে ঈশাখাঁ একসময় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে পরে বন-জঙ্গল-নদী-নালা পার হয়ে চাটগাঁ এসে উপস্থিত হল। চাটগাঁ থেকে ঈশাখাঁ কিশোরগঞ্জের জঙ্গলবাড়ীতে উপস্থিত হন। জঙ্গলবাড়ীর কোচ রাজা রাম-লক্ষ্মণকে বিতাড়িত করে ঈশাখাঁ এই এলাকায় রাজত্ব করতে থাকলেন। দিল্লীর বাদশা ঈশাখাঁর প্রচুর দূর্গ ও সৈন্য-সামন্তের কথা শুনে তাকে দিল্লী আসার জন্য এক দূত পাঠালেন । ঈশাখাঁ সেই দূতকে পাথর চাপা দিয়ে রাখলেন। দুই বৎসর পরেও যখন দূতের কোন খবর পেলেননা ,তখন বাদশা ঈশাখাঁকে ধরে আনার জন্য সৈন্য-সামন্তসহ মানসিংহকে পাঠালেন। মানসিংহ তার ফৌজবাহিনীকে নিয়ে নানা রকম ছল-ছাতুরী করে অবশেষে বর্তমানে পাকুন্দিয়া থানার এগারসিন্দুর নামক স্থানে ঈশাখাঁকে বন্দী করেন এবং তাঁকে দিল্লীর বাদশার দরবারে হাজির করেন। বন্দী ঈশাখাঁর প্রতি বাদশা প্রথমে অতি রূঢ় ব্যবহার করলেও পরে তাঁকে নমনীয় হতে দেখা যায়। কারণ মানসিংহের কাছ থেকে বাদশা জানতে পারে ঈশাখাঁ এক মস্ত বীর এবং তাকে বাদশার আয়ত্তে রাখলে পরিণামে ঈশাখাঁ বাদশার অনেক উপকারে আসবে। মানসিংহের কথামত বাদশা আকবর ঈশাখাঁকে মুক্ত করে তাঁকে 'মসনদ আলী' উপাধি দেয় এবং বাইশ পরগনার মালিক ও দশ হাজার টাকা খাজনা দান করেন। টাকা নিয়ে ঈশাখাঁ বিশাল এক কোশা তৈরি করেন। দুই হাজার দড়িবিশিষ্ট সেই কোশা নিয়ে ঈশাখাঁ জঙ্গলবাড়ীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। যাত্রাপথে দেখা হল শ্রীপুরের রাজা কেদার রায়ের এক সুন্দরী ভগ্নীর সঙ্গে। পালায় বর্ণিত আছে–

"কোশাতে দেখিল কন্যা সুন্দর দেওয়ানে।
এক ধ্যানে চাইয়া কইন্যা রইল তার পানে॥
নয়ানে নয়ানে ভালা অইল মিলন।
এইমতে অইল দোহার প্রেমের জনম॥"

কৌশলে সেই কন্যা দেওয়ানের কাছে লিখে পাঠায় চৈত্র মাসের অষ্টমী তিথিতে সে জলের ঘাটে আসবে । সেই কথামত দেওয়ান ঈশাখাঁ অষ্টমী তিথিতে কোশা সাজিয়ে ফৌজ নিয়ে জলের ঘাট থেকে কন্যাকে তুলে নিয়ে আসে। ধর্মান্তরিত করে ঈশাখাঁ শুভদ্রাসুন্দরীকে বিয়ে করে এবং নাম রাখেন নিয়ামতজান।
তাদের সংসারে দুই পুত্র সন্তানের আগমন ঘটে' আদমখাঁ ও বিরামখাঁ '। কিন্তু বিধাতার বিধানে আদমখাঁর যখন পনের বছর তখন ঈশাখাঁ পরলোক গমন করেন। নিয়ামতজান তার দুই পুত্র সন্তান নিয়ে ঈশাখাঁ শূন্য জঙ্গলবাড়ীতে জীবন-যাপন করতে থাকে। তার অসহায়তার সুযোগ নিয়ে জঙ্গলবাড়ীতে এসে হাজির হয় দুষ্ট কেদার রায়। সে বোনকে অনুরোধ করে তার দুই কন্যাকে পুত্রবধূ হিসাবে গ্রহণ করতে, বোন তা অস্বীকার করে। কেদার রায়ের মনে জ্বলে উঠে প্রতিশোধের আগুন। সে কৌশলে তার দুই ভাগ্নেকে শ্রীপুর শহরে এনে বন্দী করে রাখে। এদিকে পুত্রের বিরহে মাতা পাগলপ্রায়। নিয়ামতজানের কান্না সইতে না পেরে জঙ্গলবাড়ীর বিখ্যাত বীর করিমুল্লা ফৌজবাহিনী নিয়ে ছলে-বলে শ্রীপুর আক্রমণ করে।

"জঙ্গলবাড়ীর ফৌজগণ শ্রীপুর ঘিরিল।
সর ছাইয়া যত ফৌজ খাড়া যে হইল॥
তারপর ঘরে ঘরে আগুন জ্বালাইয়া।
সোনার শ্রীপুর সর দিল ছারখার করিয়া॥
পলায়ে পরানে ভয়ে যত লোকজন।
শ্রীপুরের লোক গেল যমের ভবন॥"

অবস্থা বুঝে কেদার রায় আত্মগোপন করে। কিন্তু তার দুই কন্যা পিতার অসৎ কর্মের জন্য পূর্ব থেকেই তার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। তাই তারা পিতার আত্মগোপনের স্থান প্রকাশ করে দেয়।

"এই শত্রু যদি থাকে দুনিয়ার মাঝারে।

Dhaka University Institutional Repository

কোনদিন সর্বনাশ করে আর কারে॥
আমরা জানি কোথায় দুষ্ট আছে পলাইয়া।
নিজ হাতে গিয়া তুমি আসহ মারিয়া॥"

কন্যাদ্বয়ের কথামত করিমুল্লা ঘুমন্ত অবস্থায় কেদার রায়কে হত্যা করে। অত:পর করিমুল্লা কেদার রায়ের ছিন্ন শির এবং তার দুই কন্যা ও ভাগ্নেকে নিয়ে জঙ্গলবাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করে। জঙ্গলবাড়ীর ঘরে ঘরে খুশির বন্যা বইয়ে যায়।আদম ও বিরামের সঙ্গে কেদার রায়ের দুই কন্যার বিবাহের দিন-ক্ষণ ধার্য করা হল। জাঁকযমকপূর্ণ ভাবে বিবাহের সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন হয় । পালায় বর্ণনা আছে-

তখন উকীল আস্যা জিগায় বসিয়া
আদম বিরাম সাথে অইব নাকি বিয়া ॥
উকীলের কাছে কইনারা করিল স্বীকার
আদম বিরাম পরে করে অঙ্গীকার।

দীনেশচন্দ্র সেন সঙ্কলিত পূর্ববঙ্গ গীতিকার ২য় খন্ডে 'দেওয়ান ইশা খাঁ মসনদালি'পালাটিতে কাহিনীর এই পযর্ন্তই জানা যায়।

৩.১.৫ *ফিরোজ খাঁ দেওয়ান*

ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত পালার মধ্যে 'ফিরোজখাঁ দেওয়ান' অন্যতম। দীনেশচন্দ্র সেন তার পূর্ববঙ্গ গীতিকায় [২য় খণ্ড] দেওয়ান পরিবারের যে বংশলতার ছক দিয়েছেন,সেখানে ফিরোজ খাঁ দেওয়ান নামে কোন দেওয়ান নেই। তবে পালায় বর্ণিত ঘটনাবলী ও ফিরোজ খাঁর চরিত্র বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় ফিরোজ খাঁ ছিলেন ঈশাখাঁর বংশধর এবং তিনি সম্ভবত ঈশাখাঁর পুত্রদেরই একজন। পালা গানটিতেও পাওয়া যায় ফিরোজ খাঁ স্বীয় পূর্ব-পুরুষদিগের গৌরবে গৌরবান্বিত একজন সাহসী বীরপুরুষ এবং তিনি ছিলেন ঈশাখাঁর মতনই স্বাধীন এবং যশস্বী দেশনায়ক। 'দেওয়ান ইশাখাঁ মসনদালি পালা'র মতো 'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান' পালাটিরও রচয়িতার নাম পাওয়া যায় নাই, তবে পালাটির বিষয়বস্তু, বর্ণনাভঙ্গি এবং কবিত্বশক্তি পর্যবেক্ষণ করলে ধারণা করা যেতে পারে যে পালা দুটির রচয়িতা একজনই এবং তিনি সম্ভবত মুসলমান ছিলেন। পালায় বর্ণিত কাহিনীটি ছিল নিম্নরূপ :-

'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান নামে ' জঙ্গলবাড়ীর এক দেওয়ান ছিলেন । রূপে-গুণে-বংশ মর্যাদায় তিনি ছিলেন ঈশাখাঁর যোগ্য উত্তরসূরী। একদিন ফিরোজ খাঁ তার উজির-নাজিরসহ বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি দিল্লীর বাদশাকে এখন থেকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দিবেন এবং এতে যদি তার যুদ্ধ করে মৃত্যু বরণ করতে হয় তিনি তাতেও রাজী। এমন সময় ফিরোজ খাঁর মা তাকে ডেকে পাঠান। মা তাকে বলেন , তার জীবন প্রায় শেষ এবং তিনি শীঘ্রই পুত্রবধুর মুখ দেখতে চান। উত্তরে ফিরোজ খাঁ জানান এই জীবনে তিনি বিয়ে করবেন না এবং সারা জীবন রাজ্যের প্রজাদের সুখ-দু:খ নিয়েই কাটিয়ে দেবেন। এমন সময় এক তসবিরওয়ালী কিছু তসবিরসহ অন্দরে প্রবেশ করে। ফিরোজ দেখে শুনে এক তসবির ক্রয় করে এবং সেই তসবির কন্যার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়। তসবিরওয়ালীকে সেই কন্যার সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি জানতে পারেন এই সুন্দরী কন্যা কেল্লাতাজপুরের দেওয়ান উমরখাঁর কন্যা। কন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে ফিরোজখাঁ দেওয়ানগিরি ভুলে গিয়ে কন্যাকে দেখার জন্য অধীর হয়ে ওঠে। অবশেষে মার কাছে শিকারে যাওয়ার কথা বলে দেওয়ান কেল্লাতাজপুরে এসে উপস্থিত হন।এখানে এসে তিনি ফকিরের ছদ্মবেশ ধারণ করে এক গাছের নিচে পসরা সাজিয়ে বসে থাকেন। এমন সময় কেল্লাতাজপুরের দেওয়ান উমর খাঁ এক কঠিন বেমারে পতিত হন। অনেক হাকিম ফকির বহু চেষ্টা করেও তার অসুখ ভাল করতে ব্যর্থ হয়। এক পর্যায়ে উমরখাঁকে ভাল করার জন্য ফকির ফিরোজখাঁকে ডাকা হয়।ছদ্মবেশী ফকির ফিরোজখাঁ অন্দর মহলে প্রবেশ করার সময় পথে দেখা হয় সখিনার সাথে। পালায় বর্ণিত আছে -

Dhaka University Institutional Repository

দেখিয়া ফিরোজসাহেব সখিনায় চিনিল।
তসবীরে আর মানুষে আসমান পাতাল লাগিল॥
তসবীরে এমন রূপ আকা নাহি যায়।
অঙ্গের লাবনী যার মাটি বইয়া যায়॥

অল্প বয়সে ফকিরি বেশ ধারণ করার জন্য ফিরোজ খাঁকে দেখে সখিনার মনেও দু:খ জাগে-

"চেংড়া বয়সে কেবা কও ফকীরি লয় ।
তোমারে দেখিয়া মোর দিলে দরদ হয়রে॥

বাড়ি এসে ফিরোজ খাঁ এক মুহূর্তের জন্যেও সখিনা বিবির কথা ভুলতে পারে না। অত:পর সে কৌশলে দরিয়া বাদীকে ফেরিওয়ালার বেশে তার ফকিরবেশী তসবি দিয়ে সখিনার কাছে পাঠিয়ে দেয়। সখিনা এই ছবি দেখে আৎকে উঠে এবং দরিয়ার কাছে এই ফকির সম্পর্কে জানতে চায়। তখন দরিয়া জানায়, কেল্লাতাজপুরের দেওয়ান উমর খাঁর কন্যা সখিনা বিবির জন্য এই মানুষ জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানগিরি ছেড়ে ফকিরি বেশ ধারণ করে। এই কথা শোনার পর গলার হার দিয়া কন্যা এই তসবির ক্রয় করে।

"এই কথা শুনিয়া তবে সুন্দরী সখিনা।
ফকীরের লাগি কন্যা হইল দেওয়ানা॥
অঞ্চল ধরিয়া কন্যা মুছে চোক্ষের পানি।
পিরীতে মজিল মন কাতর হইল প্রাণি॥
লাখ টাকার কিম্মত যে গলার হাসুলী ।
তাহা দিয়া বিদায় কন্যা করিল ফিরুলী॥"

এ দিকে পুত্রের দেওয়ানা ভাব দেখে মা ফিরোজাসুন্দরী পুত্রকে বিয়ে দেয়ার জন্য আবার মনস্থির করে। এইবার পুত্র ফিরোজ খাঁ উজিরের মাধ্যমে মাকে জানায় উমর খাঁর কন্যা সখিনা ছাড়া আর কাউকে সে বিয়ে করবে না। কিন্তু কেল্লাতাজপুরের দেওয়ান উমরখাঁ ছিল জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানদের শত্রু। তাই মা এই বিয়েতে সম্মতি দিতে পারেন না –

"পুত্রে সাদি কেমনে করাই দুষ্মনের কন্যারে ।
এই কথা বুঝাইয়া কও পুত্রের গোচরে॥
সখিনা বিবির থাক্যা সুন্দর দেখিয়া ।
আনিয়া পুত্রেরে আমি করাই তবে বিয়া॥"

কিন্তু ফিরোজখাঁ এই কন্যা ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না বলে মনস্থির করে। তখন মা নিরুপায় হয়ে উজিরের মাধ্যমে উমরখাঁর নিকট কন্যার বিয়ের প্রস্তাব পাঠায়। কিন্তু উমরখাঁ এই প্রস্তাবে রাজীতো হয়ই নি বরং উজিরকে অপমান করে বলে–

"কাফেরের গোষ্ঠী জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান।
রোজা নমাজ ছাড়া যেই না মুছুলমান॥
না মুছুলমান পাঠাইল সাদির কারণ।
এই নি দু:খু সয় দেখ উজীর নাজীর গণ॥

Dhaka University Institutional Repository

বেইজ্জত করিলা আমায় সেইত কাফেরে।
উচিত শাস্তি দিবাম ভাব্যা চিন্ত্যা তারে॥ "

উজীর এসে ফিরোজখাঁর নিকট এই অপমানের কথা বলে। এই কথা শুনে ফিরোজখাঁর মনে প্রতিশোধের আগুন জ্বলতে লাগে। ফিরোজখাঁ জঙ্গলবাড়ীর সমস্ত ফৌজ নিয়ে কেল্লাতাজপুর আক্রমণ করেন এবং সখিনাকে উঠিয়ে নিয়ে এসে জঙ্গলবাড়ীতে বিয়ে করেন। এই ঘটনার পর দু:খে-অপমানে উমরখাঁ দিল্লীর বাদশার দরবারে উপস্থিত হয়ে এর সুবিচার প্রার্থনা করেন–

"হুজুর কর খাইন উচিত বিচার ।
পরাণে মরিবাম নইলে ঘরে আপনার ॥
পরাণে অপমান পাইলাম কাফেরর হাতে ।
উচিত না হয় বাস এই দুনিয়াতে॥ "

এই কথা শোনার পর বাদশা গর্জে ওঠেন এবং তৎক্ষণাৎ উমরখাঁকে এক লাখ সৈন্য দান করেন। উমরখাঁ এক লাখ সৈন্যের সর্দার হয়ে জঙ্গলবাড়ীর আক্রমণ করেন । যুদ্ধের কথা শুনে ফিরোজখাঁও জঙ্গলবাড়ীর সমস্ত ফৌজ নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। দুই দিন তুমুল যুদ্ধ হয় সমানে সমানে। কিন্তু তিন দিনের দিন ফিরোজখাঁ শত্রুর হাতে বন্দী হয়। তাকে বেঁধে নিয়ে আসা হয় কেল্লাতাজপুর শহরে।এদিকে রণপ্রত্যাগত বিজয়ী স্বামীর গলায় জয়ের মালা পরায়ে তাকে অভিনন্দিত করবেন এই আশায় সখিনা পথ চেয়ে বসে আছেন।এমন সময় দরিয়া দাসী এসে খবর জানায় ফিরোজখাঁ কেল্লাতাজপুরে বন্দী অবস্থায় আছেন। পরক্ষণেই সখিনা রৌদ্র মূর্তি ধারণ করেন –

"আমার স্বামী বন্দী করে শরীরের কত জোর ।
সাজাও দেখি রণের ঘোড়া গেল কতদূর॥ "

পুরুষের বেশ ধারণ করে সখিনা সৈন্য-সামন্তসহ কেল্লাতাজপুর আক্রমণ করেন এবং তিন দিন অবিরাম যুদ্ধ হয়। স্বামীকে উদ্ধার করার পণ করে তিনি শত্রুর আগ্নেয়াস্ত্রের সম্মুখীন হয়ে সিংহের ন্যায় বিক্রমে রাত্রি-দিন যুদ্ধ করে চলেছেন। এমন সময় এক দূত এসে সখিনাকে যুদ্ধ বন্ধ করার অনুরোধ জানায়। কারণ ফিরোজখাঁ শত্রুর সঙ্গে সন্ধি করেছে এবং যার কারণে এই যুদ্ধের সূত্রপাত সেই সখিনাকে ত্যাগ করেছেন। দূত যখন তার হাতে তালাকনামা ও সন্ধিপত্র প্রদান করে তখন বীরাঙ্গনার কোমল হৃদয়ে যে আঘাত লাগে তা তিনি সহ্য করতে পারেন নি, মুহূর্তকাল স্তব্ধ থেকে স্বামীর নামাঙ্কিত পত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সখিনা জ্ঞানশূন্য হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

আউলাইয়া পড়িল বিবির মাথার দীঘল কেশ ।
পিন্ধন হইতে খুলে কন্যার পুরুষের বেশ॥
সিপাই লস্কর সবে দেখিয়া চিনিল।
হায় হায় করিয়া সবে কান্দিতে লাগিল।

এই খবর শুনে ফিরোজখাঁ ও উমরখাঁ যখন একত্রে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন তখন সখিনা আর জীবিত নেই। প্রচণ্ড অনুশোচনায় ফিরোজখাঁ দেওয়ানগিরি ত্যাগ করে ফকিরি বেশ ধারণ করেন।

আজি হইতে তোমার পুত্র হইয়াছে ফকীর।
না যাইব জঙ্গলবাড়ী মন কইরাছি স্থির ॥
কয়বরে শুইবাম আমি সখিনারে লইয়া।
কি করলে মনের দু:খ যাইবে ঘুচিয়া

Dhaka University Institutional Repository

৩.১.৬ *শ্যাম রায়ের পালা*

শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'পূর্ব বঙ্গ গীতিকা'[২য় খণ্ড,২য় সংখ্যা]র ভূমিকা থেকে জানা যায়, প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে কিশোরগঞ্জ মহকুমার মাছুয়া গ্রামের কৈলাশচন্দ্র দে নামক এক ব্যক্তির নিকট থেকে চন্দ্রকুমার দে 'শ্যাম রায়ের পালা'টি সংগ্রহ করেন। পালাটির কাহিনী নিম্নে বিবৃত করা হল-

রাজার ছেলে শ্যাম রায় এক বিবাহিত ডোম নারীর রূপে আকৃষ্ট হয়।অপরূপ রূপবতী সেই রমণীর প্রতি মুগ্ধ হয়ে শ্যাম রায় তাকে প্রেম নিবেদন করে ।শ্যাম রায় ডোম বধুকে নানা রকম প্রলোভন দেখিয়ে তার প্রণয় লাভের চেষ্টা করে।পালায় বর্ণিত হয়েছে–

গজমতি হার কন্যা দিতাম পরায়া।
হাতেত দিতাম তার বাজু গলায়ত দিতাম হাসুলী॥
নিজ হাতে আক্যা দিতাম দুই নয়ানের কাজুলী।
আমায় যদি হইতে লো কন্যা পাইতাম মনে সুখ॥
জ্বালিয়া ঘিরতের বাতি দেখতাম চান্দ মুখ। (পূ:ব:গী:২য় খ:২য় স:পৃ:২৭৩-৭৪)

একদিন শ্যামরায় ডোম বধূর নিকট এক দূতীকে পাঠালো।দূতীর নিকট থেকে ডোম বধূ শ্যাম রায়ের প্রণয় নিবেদনের কথা জানতে পারলো।ডোম বধূ শ্যাম রায়ের প্রতি আকৃষ্ট হলেও সে ছিল বিবাহিতা,পরের অধীন। তার আছে নানা রকম বাধা।তারপরেও ডোম বধূর মন মানে না।সে শ্যামরায়ের সাথে দেখা করার জন্য গঙ্গা তীরে যায়।কিন্তু স্বয়ং রাজপুত্র তার প্রণয়প্রার্থী দেখে সে বিস্মিত ও চিন্তিত হয়ে পড়ে।এই প্রেমের পরিণাম সর্ম্পকে তার মনে সংশয় দেখা দেয়।সে শ্যামরায়কে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে এই ভাবে –

আমি ত ডোমের নারীরে বন্ধুরে হাত দিও না গায়।
ছোটর সঙ্গে বড়র পিড়ীত বড়র জাতি যায়] রে বন্ধু॥
রাজার ছাওয়াল তুমি রে বন্ধু আমি ডোমের নারী।
সমুদ্র থুইয়া বন্ধু শুকনায় বাইছ তরী রে বন্ধু॥ (পূ:গী:তৃ:দ্বি:স: পৃ: ২৭৭-৭৮)

কিন্তু শ্যামরায়ের মন কোনো কিছুতেই বাঁধা মানে না।ডোম নারীকে পাওয়ার জন্য সে রাজা- রাজত্ব,সুখ-শান্তি সমস্ত কিছুই ত্যাগ করতে রাজি।

তোমারে লইয়া কন্যা লো হইব দেশান্তরী।
রাজ্য না ছাড়িয়া আমি হইমু দণ্ডধারী॥
গির করব বিরক্ষ তলে লো কন্যা বসতি জঙ্গলা।
গজমতি থুইয়া গলে পরব হারের মালা॥ (পূ:গী:৩য়:খ:দ্বি:স:পৃ:২৮০)

শেষ পর্যন্ত শ্যামরায়ের সুগভীর একনিষ্ঠ প্রণয় বাসনায় ডোম বধুকে সাড়া দিতেই হয়েছে।এমন কি ডোমনারী স্বামীর অবর্তমানে শ্যামরায়কে নিয়ে নিজ গৃহে শাশুড়ির চোখকে ফাঁকি দিয়ে রাত্রি যাপন করার দু:সাহসী অভিযানেও ব্রতী হয়েছে।শ্যামরায়ের মা-বোন ডোম নারীর প্রতি শ্যামরায়ের আসক্তির কথা জেনে তাকে নিবৃত্ত করার জন্য নানা রকম চেষ্টা করেছে।কিন্তু শ্যামরায় তার সিদ্ধান্তে অনড়। এই কথা শ্যামরায়ের পিতা চান্দরায়ের নিকট পৌঁছলে তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন এবং লোকজনকে ডেকে ডোমের বাড়ী-ঘর ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিলেন।পালায় বর্ণিত আছে-

লোক লাট্যালে ডাক্যা রায় কোন কাম করিল।
বাড়ী ঘর ভাইঙ্গা ডোমের সায়রে ভাসাইল॥

Dhaka University Institutional Repository

এখানে শ্যামরায় কঠোর পরিশ্রম করে জীবন-যাপন করতে থাকলো। শ্রমে অনভ্যস্ত জমিদারপুত্র শ্যামরায়ের জীবন-যাপন একদিকে কষ্টকর হলেও ডোম নারীকে নিয়ে তার জীবন অত্যন্ত সুখকর ছিল।এই সুখের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে গাবর রাজা।সে গোপনে ডোমনারীকে রূপ লালসাবশত অপহরণ করেছে এবং শ্যামরায়ের বিরূদ্ধে ঘোষণা করেছে মৃত্যুর দন্ডাদেশ। ডোমনারী নিজের বুদ্ধিমত্তায় শ্যামরায় করেছে মুক্ত এবং নিজেও থেকেছে অক্ষত।কিন্তু দেশে ফিরে শ্যামরায যে যুদ্ধ আয়োজন করেছে তাতে গাবর রাজকুলের পতন ঘটলেও সে নিজে বিষাক্ত তীরের আঘাতে নিহত হয়েছে।শ্যামরায়ের মৃত্যু ডোমনারী সইতে না পেরে সেও বিষ পানে আত্মহত্যা করে।মৃত শ্যামরায়ের সঙ্গে ডোমনারীর সহযাত্রার মধ্য দিয়ে এ গাথার পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

৩.১.৭ *সোনাই বিবি*

মো:সাইদুর 'সোনাই বিবি' পালাটি কিশোরগঞ্জ জেলার পটধা কুঁড়ের পাড় গ্রামনিবাসী মিয়া হোসেন ভুঁইয়ার কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন।পরবর্তী কালে বদিউজ্জামান সম্পাদিত বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত 'মোমেনশাহী গীতিকা'য় তা সংযোজন করা হয়েছে। সেখানে 'সোনাই বিবি'পালার যে কাহিনীটি পাওয়া যায় নিম্নে বর্ণনা করা হলো-

বানিয়াচঙ্গের নবাব সুজা ও নুরা দুই ভাই।একদা তারা নব্বই লক্ষ লোক-লস্কর ও তের লক্ষ ঘোড়াসহ নানা রকম সাজ-সরঞ্জাম করে শিকারের উদ্দেশ্যে রওনা হয়।যাত্রাপথে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসলে তারা তাবু খাটিয়ে রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করে।প্রভাতে যখন সূর্যের আলোর তেজ আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে তখন তাদের ভীষণ পানির পিপাসা পায়।কিন্তু কোথাও পানি পাওয়া যাচ্ছে না।পানির সন্ধান করতে করতে দুই ভাই হয়রান হয়ে পড়ে।পানির খোঁজে নুরা জালাল শহরে এসে উপস্থিত হয়ে এক পুকুরের পানি পান করে পিপাসা নিবারণ করে।তৃষ্ণায় ক্লান্ত নুরা পুকুর পাড়েই ঘুমিয়ে পড়ে।

এদিকে জালাল পরগনার জমিদার সাহেবের এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল নাম সোনাই।একদিন সোনাই প্রচণ্ড গরমে সেই পুকুরে গোছল করতে আসে।নিদ্রামগ্ন নুরার নিদ্রাভঙ্গ হলে সে সোনায়ের রূপ দেখতে পায়।

কন্যা দেইখ্যা নুরায়য়ে নুরা
বেদিশী না হইল
আছড় খাইয়া নুরায় গো তবে
জমিনে পইড়াই গেলরে। (মোমেনশাহী গীতিকা:পৃ:৬৫)

সোনাইয়ের রূপে মুগ্ধ হয়ে নুরা তার ভাই সুজার জন্য সোনায়ের বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠায়।এদিকে জালাল সাহেবের আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়ায় নুরা তাকে বিরাট অঙ্কের টাকার প্রলোভন দেখায়।প্রলুব্ধ হয়ে জালাল সাহেব স্ত্রী-কন্যার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়েতে রাজী হয়ে যায়।পালায় বর্ণিত আছে-

আল্লার নামটি লইয়া আমি
বিয়ার কবুল দিলাম রে॥
তৎক্ষনাতে নুরা কয় রে নুরা কয়রে
তালই বলি যে আপনেরে
আগামী না রবিবারে
বিয়ার পান লইয়া আমি আইবাম রে॥ (মোমেনশাহী গীতিকা পৃ:৮০)

কিন্তু সোনাই তার বাল্যবন্ধু সৈয়দ বিরামকে বিয়ে করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল।

বিয়ার কবুল দিয়া গো ফেলেছি

Dhaka University Institutional Repository

ও মাইয়া ছৈয়দ বিরামের লগে রে
আর দিতাম না কবুল গো মাইয়া
আমার জীবন থাকিতে রে॥ (মোমেনশাহী গীতিকা:পৃ:৮৫)

কিন্তু কন্যার অমতেই পিতা নুরাকে বিয়ের তারিখ জানিয়ে দেয় ।তারিখ নিয়ে নুরা বানিয়াচঙ্গ শহরে উপস্থিত হলে সেখানে খুশীর বন্যা বইয়ে যায়।এদিকে সোনাই তার অবস্থা জানিয়ে সৈয়দ বিরামকে চিঠি লিখে।চিঠি পেয়ে বিরাম জালাল শহরে আসলো এবং সে কৌশলে শহরের সমস্ত ক্ষমতাশালী লোকদেরকে টাকা-পয়সা দিয়ে হাত করে জালাল সাহেবের অমতেই সোনাইকে বিয়ে করে নিজ দেশে রওনা হয়।

সোনাইয়ের সাথে ছৈয়দ বিরামের বিয়ের সংবাদ বানিয়াচঙ্গে নুরা ও সুজার কানে পৌঁছলে তাদের মনে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে ওঠে।তারা যাত্রা পথে সোনাইকে হরণ করার জন্য প্রস্তুতি নেয়।সুজা নুরাকে হুকুম দিয়ে বলে-

সোনাই কাইড়া রাখবাম গো আমরা
বারুল্লার মাঝারে রে॥
ও নুরা শীঘ্র কইরা লোক লস্কর সাজাও রে
ও নুরা শীঘ্র কইরা কামান বন্দুক লও রে। (মোমেনশাহী গীতিকা:পৃ:১০৮)

পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী বারুল্লা নামক স্থানে সুজা ও নুরার দল তাদেরকে আক্রমণ করে।বিরামের সঙ্গে সুজা ও নুরার বাহিনীর তুমুল যুদ্ধ হয়।যুদ্ধে বিরামের পরাজয় হয়।স্বামীর পরাজয়ের খবর শুনতে পেয়ে সোনাই সুজার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য তার কাছে রক্ষিত বিষ পান করে পাল্কির অভ্যন্তরে আত্মহত্যা করে।এদিকে দুই ভাই আনন্দচিত্তে মৃত সোনায়ের পাল্কি নিয়ে বানিয়াচঙ্গে উপস্থিত হয়। পাল্কি থেকে নতুন বধূকে বরণ করার জন্য সুজা মাকে আহ্বান করে।পালায় বর্ণিত আছে-

আইও আইও মাইয়া গো মাইয়া
আরশী পরশী লইয়া
পাল্কীতে আছে তোমার গো বউ
নেওত লামাইয়া রে॥
এই না কথা শুইনা গো মায়ে ও মায়ে কোন কাম করিল।
আরশী পরশী লইয়া গো তবে বেটি বউ লামাইত আইলরে॥
ধান দুর্বা লইয়া গো যখন
পাল্কীর দরজা ঘুছাইল
মরা লাছ সোনাইর গো তখন
মায়ে না না দেখিল রে॥ (মোমেনশাহী গীতিকা:পৃ:১২৩)

এদিকে পরাজিত বিরাম তার বড় ভাই আদমকে নিয়ে পূর্ণ শক্তি সঞ্চয় করে সুজার বাড়ি আক্রমণ করে।সুজা ও নুরা আত্মরক্ষার নানারকম কৌশল অবলম্বন করেও শেষ পর্যন্ত বাচঁতে পারেনি।তবে এই পর্যায়ে বিরাম জয়লাভ করলেও সে সোনাইকে আর ফিরে পায়নি।তবে বিরাম সোনায়ের শেষ ইচ্ছাটি পূর্ণ করেছিল।বিরাম সোনাই এর ইচ্ছামত তার ছোটবোন রূপাকে বিয়ে করে দেশে ফিরে আসে।

Dhaka University Institutional Repository

৩.১.৮ *গকুল চান ও আইধর চান*

'গকুল চান ও আইধর চান' পালাটি কিশোরগঞ্জ সদর থানার কুর্টিগিদি গ্রামের ফজর মিয়ার কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে।মো:বদিউজ্জামান সম্পাদিত 'মোমেনশাহী গীতিকা'য় প্রাপ্ত 'গকুল চান ও আইধর চান'পালার কাহিনীটি নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল –

গকুল চান ও আইধর চান দুই ভাই।তাদের বাবা-মা নেই,আইধর চানকে কোলে রেখে তার বাবা- মা মারা যায়।তারপর থেকে বড়ভাই গকুল চানের স্ত্রী দুধরানী আইধর চানকে লালন-পালন করে।দুধরানী ছিল অত্যন্ত রূপবতী।কবির ভাষায় তার রূপের জ্যোতিতে 'আন্ধাইর ঘর পশর হয়'। পালায় বর্ণিত কাহিনী থেকে জানা যায় দুধ রানী পূর্বে পরী ছিল।তারা ছিল সাত বোন।সেই সাত বোন যখন রথ দৌড়ায়ে মনি ঠাকুরের রাজ সভাতে যায় তখন দুধ রানী গকুল চানের নজরে পরে।দুধ রাণীকে পাওয়ার জন্য গকুল চানকে অনেক প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়।তারপর গকুল চান যুদ্ধ করে দুধরানীকে বিয়ে করে ঘরে তোলে আনে।

গকুল চানকে নিয়ে দুধ রাণীর সুখেই দিন কাটছিল।একদিন দুধ রানী পঞ্চদাসী নিয়ে সান বান্ধা ঘাটে আসে।সেই সময় দেশের নবাব লোক-লস্কর নিয়ে শিকারে যাচ্ছিলেন।দুধ রাণীর রূপে নবাব মুগ্ধ হয়।নবাব দুধরাণীকে তার দরবারে উপস্থিত করার জন্য গকুল চাদের কাছে লোক পাঠায় এবং তার এই প্রস্তাবে সম্মত নাহলে সমস্ত পুরী ধ্বংস করা হবে বলে জানিয়ে দেয়।সংবাদ গকুল চানের কাছে পৌঁছে এবং সে সঙ্গে সঙ্গে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।এরই প্রেক্ষিতে নবাবের সঙ্গে গকুল চানের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।গকুলচান যুদ্ধে নিহত হন।

অন্যদিকে ভায়ের সাহায্যে আইধর চান যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হল।তার সাথে দুধরাণীও যুদ্ধ ক্ষেত্রে এসে হাজির হল এবং স্বামীর মৃত দেহ নিয়ে কাঁদতে শুরু করল।পালায় বর্ণিত আছে-

কান্দিয়া কাড়িয়া গো দুধরাণী
ও রাণী লাছ কান্দে কইরাই লইল
ধরাক্ষের গাছের তলে আইন্যা
এই যেন লাছ, শুয়াইয়া না দিল রে ওকি রাজারে।
মরা লাছ লইয়া দুইজন আরও কান্দিতে লাগল
এই মত কইরা তবেই
একপর রাইত গুজারিয়াই গেল রে
ওকি রাজারে। (মোমেনশাহী গীতিকা:পৃ:৪২-৪৩)

দুধ রানীর কান্নার ধ্বনি পরী স্থানে গিয়ে পৌঁছল।তার কান্নায় ব্যথিত হয়ে পরীস্থান থেকে গুলেস্তা নামক এক পরী ওষুধ নিয়ে এল এবং গকুল চানকে পূনর্জীবন দান করল। গকুল চান ও আইধর সম্মিলিত ভাবে নবাব ও তার লোক জনকে হত্যা করল।এদিকে গুলেস্তাকে দেখে আইধর চান মুগ্ধ হল এবং তার প্রেমে নিমজ্জিত হল।অত:পর দুধরানী ও গুলেস্তাসহ গকুলচান এবং আইধর চান ঘরে ফিরে আসল।পালায় প্রাপ্ত কাহিনীটি এখানেই সমাপ্ত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩.২ লোকসংগীত

লোকসংগীত লোক সাহিত্যের একটি জনপ্রিয় শাখা। প্রত্যেক দেশেই লোকসাহিত্যের এই শাখাটি বেশ সমৃদ্ধ ও জনপ্রিয়। বাংলা লোকসাহিত্যেও এর ব্যতিক্রম হয়নি । লোকসংগীতের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, " যাহা একটি ভাব অবলম্বন করিয়া গীত হইবার উদ্দেশ্যে রচিত ও লোক সমাজ কর্তৃক মৌখিক প্রচারিত হয় , তাহাকেই লোক-গীতি বলে। প্রত্যেক দেশের লোক সাহিত্যে গীতি অপেক্ষা জনপ্রিয় বিষয় আর কিছুই নাই, বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়না । কেবলমাত্র রসোপলব্ধির ক্ষেত্রে নহে - সামাজিক জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও বাংলার লোকগীতি নানা দিক দিয়া অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া আছে।" (৪)

লোকসংগীত সাধারণত মৌখিক ভাবে রচিত এবং কেবল মাত্র মৌখিক ভাবেই প্রচারিত হয়ে থাকে । লোকসঙ্গীত শিক্ষা লাভের জন্য কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম নেই। লোকগীতির ভাবের মধ্যে যেমন বেশি বৈচিত্র্য নেই, এর চিত্রের মধ্যেও তেমন বৈচিত্র্যের অভাব আছে। অর্থাৎ এর ভাব যেমন প্রত্যক্ষ ও সহজ, তেমনি এর চিত্রও একঘেঁয়ে। তথাপি ' বাংলাদেশে এ পর্যন্ত একশত পচাঁত্তর প্রকার লোক সংগীতের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রচলিত এ সংগীতকে ভিন্ন ভিন্ন লোকবিজ্ঞানী ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি প্রধান শাখায় ভাগ করেছেন, যেমন ডঃ আশরাফ সিদ্দিকীর মতে –

১) আঞ্চলিক গীত - যা অঞ্চল বিশেষে বিশেষভাবে প্রচলিত।
২) ব্যবহারিক গীত - যা বিবাহ , উৎসব ইত্যাদি উপলক্ষে গীত হয়।
৩) হাসির গান
৪) কর্মসংগীত এবং শ্রমসংগীত - যা কৃষি কর্ম , নৌকা বাইচ, ছাদ পিটানো ইত্যাদিতে গাওয়া হয়।
৫) প্রেমসংগীত - বিরহিনী নারী ও বিরহী পুরুষের নানা হৃদয় বেদনা ও চিরন্তন প্রেম সম্ভাষণ যাতে প্রকাশিত হয়।
৬) বারমাসী গান -অপেক্ষাকৃত লম্বা গানে বিরহিনী নারীর বারো মাসের বেদনা যে সব গানে প্রকাশিত হয় ইত্যাদি।' (৫)

আশুতোষ ভট্টাচার্য লোকসংগীতকে শ্রেণীবিভাগ করেছেন এইভাবে –

১) আঞ্চলিক গীত
২) ব্যবহারিক গীত - সামাজিক বা পারিবারিক জীবনের ব্যবহারিক আচারানুষ্ঠানে মেয়েলি কণ্ঠে যে সব গীত গাওয়া হয়।
৩) আনুষ্ঠানিক গীত - বৎসরের নির্দিষ্ট সময়ে সামাজিক উৎসব পার্বণাদি উপলক্ষে যে লোকসংগীত গীত হয়।
৪) প্রেমসংগীত - যে সংগীতের ভিতর দিয়ে নর-নারী পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ অনুভূতি ব্যক্ত করে থাকে। (৬)

কিশোরগঞ্জ জেলায় রয়েছে লোকসংগীতের সমৃদ্ধ সমাহার। এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী বেশ মনোরম। অসংখ্য নদী-নালা,বিল-হাওর বেষ্টিত কিশোরগঞ্জের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে ভাটিয়ালি,জারি,সারি,ঘাটু ইত্যাদি নানরকম লোকসংগীত। উপরিউক্ত শ্রেণীবিন্যাসের আলোকে কিশোরগঞ্জে প্রাপ্ত এই লোকসংগীতগুলোকে নিম্নোক্তভাবে শ্রেণী বিভাগ করা যায় –

Dhaka University Institutional Repository

১) আঞ্চলিক গীত ২) ব্যবহারিক গীত ৩) কর্মসংগীত এবং শ্রমসংগীত
৪) আনুষ্ঠানিক গীত ৫) প্রেমসংগীত ।

লোকসংগীতের বিষয়বস্তু , বিস্তার ও প্রয়োগবিধির উপর লক্ষ্য রেখে এই শ্রেণী বিন্যাস করা হয়েছে। এখন আমরা লোকসংগীতের এই শ্রেণী বিভাগগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরার প্রয়াস পাব।

৩.২.১ *আঞ্চলিক গীত*

একটি বিশেষ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে যে লোকসংগীত জন্ম ও বিস্তার লাভ করে তাই আঞ্চলিক গীত।প্রত্যেক জেলায় তার নিজস্ব সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে গড়ে উঠেছে আঞ্চলিক গীতসমূহ। আঞ্চলিক গীতসমূহে আভাসিত হয়ে উঠে ঐ এলাকার শিক্ষা-সংস্কৃতি ও তাদের আচার-আচরণ।"বাংলার লোক গীতি সংগ্রহের দিকে লক্ষ্য করলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে ,ইহাদের মধ্যে কোন গীতি এক একটি অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে- ইহারা নির্দিষ্ট অঞ্চল অতিক্রম করিয়া ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পশ্চিমবঙ্গের পটুয়া , ভাদু , ঝুমুর ;উত্তরবঙ্গের গম্ভীরা ,জাগ ,ভাওয়াইয়া; পূর্ববঙ্গের জারি ,ঘাটু ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে। সমস্ত বাংলাদেশব্যাপী এই সকল সঙ্গীতের প্রচার হয় নাই। কোন ঐতিহাসিক কারণে প্রথম ইহারা যে অঞ্চলে উদ্ভূত কিংবা প্রচারিত হইয়াছিল, সেই অঞ্চল বা তাহার সন্নিকট ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলই ইহারা আজ পর্যন্ত প্রচারিত আছে।এই সকল সঙ্গীতকে আঞ্চলিক সঙ্গীত বলা যাইতে পারে।"[৭] আঞ্চলিক সংগীতের মধ্যে পূর্ব ময়মনসিংহের জারি গান ও ঘাটু গান উল্লেখযোগ্য । প্রথমে আমরা পূর্ব ময়মনসিংহের জারি গান নিয়ে আলোচনা করব

জারি গান

কিশোরগঞ্জ জেলার আঞ্চলিক গানের মধ্যে জারি গান প্রধান।জারি গান এই অঞ্চলের লোকসংগীতের একটি বিশিষ্ট সম্পদ।এটি ময়মনসিংহের সর্বত্র প্রচলিত থাকলেও কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের জারি গান বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ । কারবালার মর্মান্তিক কাহিনী এর বিষয়বস্তু বলে মহরম ছাড়া পল্লী অঞ্চলে এই জারি গীত হয় না। "দুস্তর মরু-প্রান্তরে শত্রু সৈন্যের অবরোধের মুখে অসহায় শিশুর এক বিন্দুর তৃষ্ণাবারির জন্যে যে আর্তি এই সংগীতের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে , তাহা এক দিক দিয়া যেমন ইহার মানবিক আবেদন সার্থক করিয়াছে, অন্যদিক দিয়া ইহার বীর রসাত্মক পটভূমিকার উপর সুন্দর বৈপরীত্য সৃষ্টি করিয়াছে। এই গুণেই পূর্ব মৈমনসিংহের জারি গান বাংলার লোকসংগীতের মধ্যে বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে। বাংলার লোকসংগীতের মধ্যে একমাত্র জারিগানেই একটু পৌরুষের স্পর্শ আছে।" (৮)

মহররম এলেই কিশোরগঞ্জের গ্রামে-গঞ্জে অশিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় জারিগানের দল গঠন করে এবং সকলে মিলে বাড়ী বাড়ী গিয়ে জারী পরিবেশন করে । জারিগানের প্রচলন কিশোরগঞ্জের সর্বত্র প্রচলিত থাকলেও হাওরবেষ্টিত ঐতিহাসিক জনপদ অষ্টগ্রামে বিশেষভাবে পালিত মহররমের অনুষ্ঠানে যে জারি গান গাওয়া হয় তা উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব বহন করে। বাংলা একাডেমীর ফোকলোর সংকলন '৪৯' থেকে জানা যায় , প্রতি বছর মহররম মাসের চাঁদ উঠার পূর্ব থেকেই অষ্টগ্রাম এবং তৎপার্শ্ববর্তী এলাকায় বাড়ি বাড়ি মহররম পালনের প্রস্তুতি শুরু হয় । চাঁদ দেখার পর থেকেই গ্রামে গ্রামে নারী পুরুষ স্বতন্ত্রভাবে অথবা মিলিতভাবে শুরু করবে কারবালার কাহিনী সম্বলিত জারিগান। প্রতিদিন জারিগানের শেষ পর্যায়ে প্রতিটি জারি দল সারা গ্রাম প্রদক্ষিণ করে নিজ নিজ মহল্লা অথবা গ্রামের মধ্যে বিশেষভাবে নির্মিত দরগার সামনে গিয়ে তাদের ভক্তি -শ্রদ্ধা জানিয়ে জারিগান শেষ করে। জারিগান শেষ হলে দরগার খাদিমদার দরগায় প্রাপ্ত মানতের শিরণী সবার মাঝে বিতরণ করেন এবং দরগায় রক্ষিত মাটির পাত্র থেকে জারি দলের উপর পানি ছিটিয়ে দেন । এভাবে চাঁদ দেখার পর দিন থেকে আশুরার পূর্ব দিন পর্যন্ত সারা অষ্টগ্রামে বাদ্য-বাজনা সহকারে চলে জারিগান। মূল অনুষ্ঠান শুরু হয় দশই মহররম। অষ্টগ্রামের প্রায় প্রতিটি মহল্লাতেই একটি করে মহররমের স্থায়ী দরগা দেখা যায়। দরগাগুলি

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণত উঁচু স্থানে বেদীর মতো করে নানারকম কারুকার্য করে লালসালু কাপড় দিয়ে সাজানো হয়। মহররমের চাঁদ দেখার সঙ্গে সঙ্গে এসব দরগায় অনুষ্ঠান শুরু হয়ে যায়। তবে অষ্টগ্রামের পূর্বপ্রান্তের পূর্বগ্রামে উঁচু একটি মাঠ আছে : মাঠটির পশ্চিমপ্রান্তে একটি স্থায়ী দরগা আছে। স্থানীয়ভাবে এটি ' কারবালার দরগা ' নামে পরিচিত। । মহররমের চাঁদ দেখার সঙ্গে সঙ্গেই এই দরগায় নিয়মিত অনুষ্ঠান শুরু হয়ে যায়।দশই মহররম দুপুর থেকে শুরু হয় 'তাবুত' ও 'দুলদুল ' মিছিল। মিছিলের অগ্রভাগে থাকে ' সুসজ্জিত তাবুত' বহনকারী দল অথবা ' দুলদুল ঘোড়া ' তার পেছনে থাকে বাদ্যযন্ত্রী দল, তার পেছনে বড় বড় দা , নেজা ,বল্লম,লাঠি ইত্যাদি অস্ত্রধারী জংগী দল এবং তার পেছনে জারির দল ও শোক মিছিলে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য দল। এ মিছিল সারা এলাকা ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যায় কারবালার ময়দানে এসে উপস্থিত হয়। এরপরে এখানে শুরু হয় নানা রকম শিরণী বিতরণ , উৎসর্গ পর্ব এবং জারি গান। এভাবেই প্রতি বৎসর অভিনব পদ্ধতিতে অষ্টগ্রামে মহররম অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

মহররম মাসে এই অঞ্চলে পাড়ায় পাড়ায় জারিগানের আসর জমে। যারা জারিগান গায় তাদের জারিয়ল বলা হয়। জারিগানের ধুয়াকে বলা হয় দিশা এবং জারির বিষয়বস্তুকে কাহিনী আকারে বিবৃত করে যে নাচের তালে তালে ধুয়া ধরিয়ে দেয় তাকে বলে বয়াতী। বয়াতী প্রথম দিশা দিয়ে শুরু করে। তারপর কারবালার কাহিনী বর্ণনা শুরু করে। কিছু অংশ বর্ণনা করার পর আবার দিশা শুরু করে। জারিতে বর্ণিত কারবালা কাহিনী কয়েকটি ভাগে বিন্যস্ত থাকে। যেমন :
(১) বন্দনা বা সুচনা(২) সখিনার শাদী (৩) এমামের শাহাদৎ (৪) হানিফার লড়াই ইত্যাদি। (৯)

জারিগানের প্রথমেই বন্দনা গাওয়া চিরাচরিত রীতি। নিম্নে এর অংশবিশেষ উদ্ধৃত হল ঃ–

''হায় হোছেন!
পূবেতে বন্দনা করি পূবের ভানুশ্বর
একদিয়ে উদয় গো ভানু চৌদিগে পশর।
দক্ষিণে বন্দনা করি ক্ষীরনদী সাগর
যেখানে বাইত ডিঙ্গা চান্দ সদাগর ।
উত্তরে বন্দনা করি হিমালয় পর্ব্বত
যেখানে রাইখ্যাছে আলীর মাল্লামের পাথর ।
পশ্চিমে বন্দনা করি মক্কা হেন স্থান
উদ্দিশে জানায় গো ছালাম মমিন মুছলমান ।
ইহার কথা কহনও না যায়
আঁড়িয়ে রান্ধিলে ভাত বরাক্ষণে খায়। '' (১০)

অনেকে এ পর্যন্ত গেয়ে সভাস্থ সকলের উদ্দেশ্যে সালাম জানিয়ে মূল প্রসঙ্গ আরম্ভ করে। জারি গান সাধারণত কারবালার লোমহর্ষক কাহিনীকে নিয়েই কথিত হয়। কিন্তু এখানে কাল্পনিক ও অতিরঞ্জিত ঘটনা অনেক বেশী।

জারিগানের মধ্যে এমাম হোসেনের শাহাদৎ অংশই সবচেয়ে করুণ, কিন্তু সখিনার শাদী এবং বৈধব্যকে অতি করুণ করে গাওয়া হয়। পল্লীবাসীর কাছে এ ঘটনাটির এত গুরুত্ব যে , একে তারা সমস্ত জারি গানের প্রাণ স্বরূপ মনে করে। নিম্নে খানিকটা উদ্ধৃতি দেওয়া গেল ঃ–

''হায় হায়রে –
ছখিনারে সাজায় আর চল্লিশ বেওয়াগণ
কাছেমেরে সাজায় আর একলা হোছন
ইল খারুয়া, খিল খারুয়া,দেখতে লাগে ঠন
বাঁখের উপরে তুইল্যা পইড়াই সোনার বাজুবন।

Dhaka University Institutional Repository

নাকেতে শোভাইয়া দিল নাকের নাক্কুলী
গলাতে পড়াইয়া দিল সুবর্ণের হাসুলী
সাজাইয়া পড়াইয়া ছখিনারে যত বিবিগণ
কাছেমের কাছে নিয়া দিল দরিশন রে।।
হায় হায়রে –
চাইর দিকে চাইর রামকেলা দোয়ারে গাড়িয়া
ছখিনারে দেয় গো বিয়া সানায়ে জরিয়া।
নবীর কইলমা আরও দিলেতে রাখিয়া
বিছমিল্লাহ্ বলিয়া বিয়া দিলরে পড়াইয়া।
বিয়া কইরা কাছেম তক্তে অইল সোয়ার
এন সময় আইল পরনা রণে যাইবার
কাছেম শুন কই তোমারে -
এখনি যইতে হইবে কারবালার রণে
বিয়া কইরা কাছেম আলী যদি ঘুরে থাক
ছখিনা বিবিকে তুমি ধর্মের মা ডাক।

ধুয়া

হায় হায় কাছেম
মায় না দেখিলে তারে বধিবে পরাণ
কিরে - ইমামকা শোগে কান্দে বিবি সারবান
বিবি কান্দে সারবান
দই দিগে জয় জয় ঝরে নয়ন গো
হায়-হায় কাছুম ।।

হায় হায়রে –

লিখন পাইয়া কাছেম কান্দিতে লাগিল
মা জননীর আগে গিয়া কহিতে লাগিল।
শুন শুন মা জননী শুন কই তোমারে
খুশীমতে দেও গো বিদায় যাই কারবালার রণে।
শুন শুন কাছেম , শুন কই তোমারে
আমার ত না অধীন নাই বিদায় দিতাম তুরে
আমি ত না দিবাম বিদায় যাইতা সে রণে
তুমি গিয়া লহ বিদায় ছখিনার সনে।।

হায় হায়রে –

এই কথা শুনিয়া কাছেম তুরিছে গমন
ছখিনার মন্দিরে যাইয়া দিল দরিশন।
শুন শুন ছখিনাগো শুন কই তোমারে
খুশীমতে দেও গো বিদায় যাইতাম রণে।
ফোরাত নদী বন্দী আছে এজিদের কারণ
সেই ও নদী উদ্ধার করতে যাইব রণ।।

হায় হায়রে –

এই কথা শুইনা দেখ ছখিনায় কয়

Dhaka University Institutional Repository

বিয়া কইরা এক রাতি ঘরে থাকতে হয়।
কাছেম কান্দিয়া কয় ছখিনারই তরে
একনিশি ঘুমাই যুদি তোমার মন্দিরে
একশ আত্তির বল কমিতে আমার বাঁও দস্থেতে।

ধুয়া

কাছেম শুন কই তোমারে
একটি নিশি ঘুমাও যুদি আমার মন্দিরে
শ' আত্তির জোর কমিবে তোমার দস্থরে।
তবে কেনে ফুলে বন্দি ক'রিলে আমারে
কাছেম শুন কই তোমারে ?
কান্দে দুলায়ে হায় পিয়ারা
মোরে অনাথ করিয়া
তুমি যদি যাও গো রণে
আগে আমায় মারিয়া
শেষে যাও গো প্রাণের পতি
রণে যাও গো চলিয়া ।।
ছখিনায় কান্দিয়া বলে
পতির পায়ে ধরিয়া
একনিশি থাকিয়া যাও গো
মদিনার বাসী হইয়া।
আসমানের তারা শোভা
রাইতের শোভা চান্নি
দিনের শোভা সূর্যমনি
নারীর শোভা স্বামী ।।

হায় হায়রে

শুন শুন ছখিনা গো শুন কই তোমারে
আইজ্যা যুদি ঘরে থাকি তুমি মাও লাগরে।
এই কথা শুনিয়া বিবি কান্দিতে লাগিল
সেইখান থাইক্যা ঘোড়ার পাইছালে দাখেল হইল।
শুন শুন বলি দুল দুল ঘোড়া শুন কই তোমারে
আমার পতি মরবার কালে দেখাইবা মোরে।
একথা শুনিয়া ঘোড়া কথা স্মরণ রাখিল

হায় হায়রে

কাছেমেরে সঁপিয়া বিবি কান্দিয়া জার জার
শুন শুন বলি দুল দুল ঘোড়া শুন সমাছার
এত দুঃখ লেইখ্যা ছিল নছীবে আমার
কাইন্দা কাইন্দা ছখিনা গো বিদায় হইল
এন সময় কাছেম আলী ঘোড়ার ছোয়ার অইল রে।।

হায় হায়রে

সেইখান থাইক্যা কাছেম আরে তুরিছে গমন
কিস্মার বাহিরে যাইয়া দিল দরিশন

Dhaka University Institutional Repository

শুন বলি দুল দুল আরে শুন কই তোমারে
আমারে লইয়া যাইবে ফোরাতের পাড়ে।
এই কথা বলিয়া কাছেম ঘোড়ায় ছোয়ার হইল
মিরতিকা ছাড়িয়া ঘোড়া আসমানে উড়িল। ।(১১)

ঘাটু গান

কিশোরগঞ্জ জেলায় ঘাটু গান নামক এক প্রকার লোকসংগীতের সন্ধান পাওয়া যায়।এক সময় এই অঞ্চলে ঘাটুগান বেশ জনপ্রিয় ছিল।এখনও কিশোরগঞ্জের কোন কোন এলাকায় এই গান প্রচলিত আছে। 'পূর্ব মৈমনসিংহ এবং তদ্‌সংলগ্ন অঞ্চল অর্থাৎ পশ্চিম শ্রীহট্ট ও উত্তর ত্রিপুরা ব্যতীত বাংলাদেশের আর কোথাও এই সঙ্গীত প্রচলিত নাই।ইহা কেবলমাত্র উপরোক্ত অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ তাহা নহে,এই অঞ্চলের মধ্যেও ইহা বৎসরের নির্দিষ্ট সময়ই গীত হয়-এই নির্দিষ্ট কাল অতিক্রম হইয়া গেলে বৎসরের মধ্যে ইহা আর শুনিতে পাওয়া যায় না'(১২)

ঘাটু গান সম্পূর্ণরূপে আঞ্চলিক গীতি। এটি বিরহপ্রধান নৃত্যগীতির পর্যায়ভুক্ত। এতে মিলনের গন্ধও নেই । শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে পরিত্যাগ করে মথুরায় চলে গেলে রাধিকার মনে যে বিরহের আগুন জ্বলে তাই ঘাটু গানের নৃত্য-গীতে ও অঙ্গভঙ্গিতে রসরূপ লাভ করেছে।নিম্ন শ্রেণীর কোন বালক যদি দেখতে সুন্দর ও সুকণ্ঠের অধিকারী হয় তবে তার অভিভাবকগণ তাকে সংগীত ও নৃত্যে পারদর্শী করে তুলে।এই বালক বালিকার মত মাথার চুল লম্বা করে। সে যখন বার থেকে চৌদ্দ বৎসরে পা রাখে তখনই নৃত্য-গীতের ব্যবসা আরম্ভ করে। এই প্রকার নৃত্য-গীত ব্যবসায়ী বালককেই ঘাটু বলে।

' পূর্ব মৈমনসিংহ অঞ্চলে এক বা একাধিক ঘাটু সম্প্রদায় থাকে।এই সম্প্রদায় উক্ত ঘাটু বালককে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে নিয়োগ করে (অর্থের বিনিময়ে) এবং তাকে নিয়ে গ্রামে গ্রামে গান গেয়ে বেড়ায়।' (১৩)

ঘাটু গানের সময় বর্ষা ও শরৎকাল। বর্ষাকালে কিশোরগঞ্জ জেলার বিস্তৃত নিম্নাঞ্চলে বর্ষার জলে সঞ্চিত হয়ে হাওর প্রায় সাগর রূপ ধারণ করে।কর্ম ব্যস্ততাহীন এই সময়টিতে কৃষকেরা অলস অবসর যাপনের জন্য নানা রকম বিনোদনের ব্যবস্থা করে। সেই সময়ে এখানে ঘাটু গান পরিবেশিত হয়ে থাকে । হাওরের বুকে বিস্তৃত নৌকার পাটাতনের উপর ঘাটু গানের আসর বসে। তারপর হাওরের নিকটবর্তী গ্রামগুলির ঘাটে ঘাটে নৌকা ভিড়িয়ে দিয়ে দিন-রাত্র অব্যাহত-ভাবে এই গান চলতে থাকে। গ্রামাঞ্চলে যে কোন উৎসবেও এইগান করতে দেখা যায়। ভাদ্র মাসের প্রথম দিন মনসার ভাসান উপলক্ষে এখনও কিশোরগঞ্জ জেলায় বড় হাওরের পূর্ব প্রান্তবর্তী নিকলি নামক স্থানে এখনও শত শত ঘাটুর নৌকা এসে সমবেত হয়। সাধারণত বর্ষাকালে ঘাট থেকে ঘাটে নৌকার উপর এ ধরনের গানের আসর বসতো বিধায় এ গান ঘাটু গান নামে পারিচিত হয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। ঘাটু গানগুলির একটা বিশেষ সুর আছে। এই গানের সুরই মুখ্য।তাই সুরের অন্তরালে কথাগুলি প্রায়ই প্রচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এই গানের বিষয় প্রধানত বিরহ । দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশির বুকে ভাসমান সুবৃহৎ নৌকায় ঘাটু বালকের কণ্ঠনিসৃত বিরহ সংগীতগুলি এক মনোরম পরিবেশের সৃষ্টি করে, নিম্নোদ্ধৃত ঘাটু গানগুলিই তার প্রমাণ –

১) তার উপায় বলগো / প্রাণ বন্ধে বাজায় বাঁশি / তরা ঐ শোন গো ।।
শ্যাম কালা তর বাঁশির গানে মন প্রাণ সহিত টানে গো
ও বাঁশি রাধা রাধা বলে / ও ধন্য ধন্য পড়ে গো । / তার উপায় বল গো
প্রাণ বন্ধে বাজায় বাঁশি / তরা ঐ শুন গো। ।(১৪)

Dhaka University Institutional Repository

২) আর কি আসিবে কৃষ্ণ / কলঙ্কিনী রাই মহলে গো।।
ওগো দূতি কইও / কইও শ্যাম বন্ধের লাগ পাইলে গো ।
আগে যেন করছিলাম পীড়িতি / হায়রে চালের কোনা ধরে
এখন সই জ্বলিয়া মাথার বিষ / কলিজায় জ্বলে মরি গো।
আর কি আসিবে কৃষ্ণ / কলঙ্কিনী রাই মহলে গো।। (১৫)

৩.কইওরে শ্যাম বন্ধুর কাছে অবলা মিনতি করে
কি দুষে পিরিতের বন্ধু ছাড়েগো।
আমার বন্ধু শ্যাম রায়
বাঁশরি বাজাইয়া যায়
তখন আমি রানতে বসি ঘরে
আর কাঁচা চুলা ভিজা লাড়কি
প্রেম আগুনে জ্বইলা মরি
ধুমার ছলে গৃহে বইসা কান্দি----।

কালের বিবর্তনে ঘাটুগান এখন বিলুপ্ত প্রায়। কিশোরগঞ্জের লোকসংগীতের অন্যান্য ধারাগুলি এখনও স্বমহিমায় উজ্জ্বল।বিপুল সংগীতের স্রোতে কেবল হারিয়ে গেছে ঘাটুগান।ধারণা করা হয় লোকসংগীতজ্ঞদের শুভদৃষ্টি এখানে পড়ে নি। তাছাড়া এ অঞ্চলে আগেকার দিনে অনেক প্রভাবশালী জমিদার কিংবা ধনী সম্পদশালী লোকজন ঘাটু পালতেন। রাজনৈতিক,সামাজিক ও সংস্কৃতিগত পরিবর্তনের ফলে বর্তমানে ঘাটুদের কেউ লালন-পালন করে না। তাই স্বাভাবিকভাবে ঘাটুদের সঙ্গে সঙ্গে ঘাটুগানও বিলুপ্ত প্রায়।এ প্রসঙ্গে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য "বর্তমানে নৈতিক বিচারে ঘাটু সম্প্রদায়গুলির স্থান অত্যন্ত নিন্দনীয় হইয়া পড়িয়াছে। উচ্চতর হিন্দু ও মুসলমানের সমাজ নৃত্য বিষয়টি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে না; অতএব যে অনুষ্ঠানের নৃত্যই প্রধান উপজীব্য , তাহা ইহাদের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইবে , তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক। উচ্চতর হিন্দু ও মুসলমানের সমাজই কালক্রমে সাধারণ স্তরের সমাজ-জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে– এই ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। এই সম্পর্কে আরও একটি কথা এখানে উল্লেখ করিতে পারা যায়। ব্যবসায়ী ঘাটু বালকের সঙ্গে সৌখীন ঘাটুসম্প্রদায়ের যে সম্পর্কটি গড়িয়া উঠে , তাহা সামাজিক বিচারে খুব সুস্থ বলিয়া বিবেচনা করা যায় না।এই সকল কারণে ঘাটুর নৃত্য ও ঘাটু গানের মধ্যে যত উচ্চাঙ্গ শিল্পগুণ ও রসবোধই প্রকাশ পা'ক না কেন ,সামাজিক দৃষ্টিতে সমগ্র ঘাটুর প্রতিষ্ঠানটিই হেয় হইয়া রহিয়াছে।" (১৬)

৩.২.২ *ব্যবহারিক গীত*

কিশোরগঞ্জের লোকসংগীতের মধ্যে ব্যবহারিক বা পারিবারিক সংগীত একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। পারিবারিক জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োজনেই এই গানগুলি গাওয়া হয়। সাধারণত গ্রামের অশিক্ষিত সরল প্রাণা নারীর মুখেই এই গানগুলি শোনা যায় বলে এগুলোকে মেয়েলিগীতও বলা হয়ে থাকে। বিয়ে ,গর্ভধারণ,সাধভক্ষণ,অন্নপ্রাশন ইত্যাদি পারিবারিক অনুষ্ঠানে এই সমস্ত সংগীতগুলি পরিবেশিত হয়ে থাকে , কিন্তু স্বাধীন চিত্ত বিনোদনের জন্য এগুলো কখনও গীত হয়না । উপরোক্ত আচারগুলির মধ্যে বিয়েই প্রধান। বিয়ের কন্যা দেখা , গায়ে হলুদ , কন্যা বিদায় , জামাই আগমন ইত্যাদি প্রতিটি পর্বকে কেন্দ্র করে এই মেয়েলি গীতগুলি রচিত হয় । নিম্নে বিয়ে ও বিয়ে-সংক্রান্ত গীতগুলি উল্লেখ করা হল ঃ–

'গায়ে-হলুদ ' বিয়ের একটি প্রধান অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে বর ও কন্যার গায়ে পৃথক পৃথক ভাবে হলুদ লাগানো হয় এবং হাতে মেহেদী পড়ানো হয়। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মেয়েরা নানা রকম সংগীত পরিবেশন করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

"হাতের মেন্দি ফোঁটা ফোঁটা
পায়ের মেন্দি জুতারে
কিনা রঙ ধরে মেন্দিরে।।
এইনা মেন্দি তুলিতে লাগে বড় ভাইয়ের বউরে ।
কিনা রঙ ধরে মেন্দিরে।।
এইনা মেন্দি থুইতে লাগে ডোমের হাতের কুলারে।
কিনা রঙ ধরে মেন্দিরে।।
এইনা মেন্দি বাটতে লাগে কিশোরগঞ্জের পাডারে।
কিনা রঙ ধরে মেন্দিরে।।
এইনা বাতি ধরাইতে লাগে কুমারের হাতের মুচিরে।
কিনা রঙ ধরে মেন্দিরে।।" (১৭)

বিয়ের কন্যাকে স্নান করানো নিয়ে যে গীত পরিবেশন করা হয়ে থাকে তা নিম্নরূপ –

"হাটু পানিতে নাইম্যা কন্যা হাটু মাজন করে রে
হায়রে কন্যার মায়ারে
কোমর পানিতে নাইম্যা কন্যা কোমর মাজন করে রে
হায়রে কন্যার মায়ারে
আগে যদি জানতাম কন্যা যাইব পরের বাড়ীতে
তাইলে আমে হাজির হইতামরে
হায়রে কন্যার মায়ারে"। (১৮)

শুধু বিয়ের কন্যাকে কেন্দ্র করেই গীত রচিত হয় না । বিয়ের বরকে নিয়েও গীত পরিবেশন করা হয়। যেমন –

{বিবাহের পূর্বে জামাই সাজানোর গীত}

বড় ঘরের সামনে / মাধব ফুলের গাছি গো
মাধব ফুল ধরে॥
তারেই তলে আবুদ্যা {শিশু}দামাল গো
ছারির{সুন্দর হওয়া}গোছল করে
ঘরে না আছিন সোনালী টুপি গো/বাছাই পরিধন করে॥
বড় ঘরের সামুনে/মাধব ফুলের গাছি গো/
মাধব ফুলই ধরে॥/এরই তলে আবুদ্যা দামাল গো
গীলা গোছল করে॥
বড় ঘরের সামনেমাধব ফুলের গাছি গো/মাধব ফুলই ধরে
তারেই তলে আবুদ্যা দামাল গো
মেন্দি গোছল করে॥ (১৯)

Dhaka University Institutional Repository

৩.২.৩ আনুষ্ঠানিক গীত

আনুষ্ঠানিক সংগীত সাধারণত বৎসরের নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন সামাজিক, ধর্মীয় উৎসব ও পার্বণাদি উপলক্ষে গীত হয়। এই সংগীতগুলি সাধারণত কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ না থেকে বাংলাদেশের সর্বত্রই প্রচলিত হয়ে থাকে তবে প্রত্যেক এলাকার কিছু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য এই গানগুলিতে প্রতিফলিত হয় বলে এদের মধ্যে কিছুটা স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়।

কিশোরগঞ্জ জেলায় বিভিন্ন অনুষ্ঠান-পার্বণাদি উপলক্ষ্যে যে সংগীতগুলি পরিবেশিত হয় তা নিম্নে উদ্ধৃত হল :-

বসন্ত রোগের প্রার্দুভাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এখানে বসন্ত রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শীতলার পূজা দেওয়া হয়।এই উপলক্ষে আয়োজিত আচার-অনুষ্ঠানে গীত সংগীতগুলি 'শীতলার গীত' নামে পরিচিত। অনুষ্ঠানটি প্রতি বছর চৈত্রের শেষ সপ্তাহের শনি বা মঙ্গলবারে পুকুরের ধারে নদীর কূলে অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠানটি পারিবারিক, গোষ্ঠীগত অথবা সমষ্টিগতভাবেও আয়োজন করা হয় এবং মহিলারাই থাকেন এই অনুষ্ঠানটির উদ্যোক্তা। শীতলা দেবীর মূর্তিকে সামনে নিয়ে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এই সময়ে সমবেত মহিলারা বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে সমস্বরে শীতলার গীত গেয়ে থাকে –

ধানী চাইলী মানে গো / হাস কইতর থরে গো থরে
আদুইন্যাই লক্ষী বাও / মা শীতলার বরে গো।।
মা শীতলার বরে গো / খোশ খোশালিত মন
আউ গুড়া বাউ গুড়া / ছাড়লো ত্রিভূবন গো।। (২০)

কিশোরগঞ্জ জেলায় মনসার গীত নামে এক প্রকার গীতের সন্ধান পাওয়া যায়। সাপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসার মাহাত্ম্য কীর্তন উপলক্ষ্যে প্রতি শ্রাবণের শেষদিন মনসা পূজার আয়োজন করা হয়ে থাকে । এই অনুষ্ঠানে সমবেত মহিলারা করতাল , মন্দিরা, খঞ্জরী, কাঁসি ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে সারা রাত জেগে সমস্বরে মনসার মাহাত্ম্যমূলক গীত গেয়ে থাকেন। এগুলিই মনসার গান বা গীত নামে পরিচিত। যেমন –

" অপুত্রকে পুত্র দাও / নির্ধনকে ধন দেও
রোগ শোক কর বিমোচনো।
মনসার শ্রী চরণ / যে জন করে স্মরণ
তার সব শত্রু হয় ক্ষয়।। "(২১)

মাগনের গীত

পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে গাঁয়ের রাখাল বালকেরা বিশেষ করে কিশোর ও যুবকেরা মাঠে একটি পিঠা পর্বের আয়োজন করে থাকে। এ উপলক্ষে পৌষ সংক্রান্তির পূর্ব থেকেই তারা দল বেঁধে গ্রামের বাড়ী বাড়ী যায় এবং সকলেই সমস্বরে নানা প্রকার গীত গেয়ে চাল, ডাল মাগন করে।পৌষ সংক্রান্তির দিন সবাই মিলিতভাবে বন বা মাঠে শিরণী রান্না করে । সে শিরণীর কিছু অংশ নিজেরা খায় ও গ্রামবাসীদের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়। এই অনুষ্ঠানে চাল,ডাল মাগনের সময় রাখাল বালকেরা সমস্বরে যে গানগুলি গায় তাই মাগনের গীতনামে পরিচিত। নিম্নে তা উদ্ধৃত হল-

" গাজী সাবের বান্চে গান / সুন্দরবন তার বাড়ী
আমরা আইচি মাগনে / দিবেন তাড়াতাড়ি।

Dhaka University Institutional Repository

আমরা অতি মুখ্যুমতি বিদ্যা বুদ্ধি নাই
বেশী কইরা মাগন দিলে / খুশী হইয়া যাই।
কুরজিও। কুরজুও।" (২২)

উড়ি গান বা বসন্ত ঋতুর গান নামে আর এক প্রকার গান কিশোরগঞ্জের লোক সংগীতে দেখতে পওয়া যায়। ফাল্গুন মাসের দোল পঞ্চমী থেকে চৈত্র সংক্রান্তি পর্যন্ত হিন্দু সমাজ বা বিভিন্ন উপজাতীয় সম্প্রদায় এই গানের আসর বসায়।একজন মূল গায়েন ৮/১০ জন দোহার নিয়ে উড়ি গানের দল তৈরি হয়। গায়কদের সকলেরই গায়ের কাপড় ও দেহ লাল রঙে রঞ্জিত করা হয় , আসরেও থাকে রঙের ছড়াছড়ি। অনেকের বিশ্বাস উড়ি গানের আসর করলে এবং আসরে অংশ গ্রহণ করলেও বসন্ত রোগের প্রার্দুভাব থেকে মুক্ত থাকা যায়।

আমি অতি মুরখ মতি / না জানি সাধন ভজন ,
আইস মাগো নিজ গুণে /বসিয়া রসাসনে / পরাও আমার মনের বাসনা ।।
দুলীলার গান মাগো / উড়ি গানেরই কীর্তন / এ আসর মাঝে তরাও মাগো
আমি করি এই নিবেদন।/ ব্রজলীলা তত্ত্ব ,কৃষ্ণ তত্ত্ব
যোগাও গো রাগ রাগিণী।।"(২৩)

কিশোরগঞ্জে বিভিন্ন ধর্মীয়সংগীতের প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। হিন্দু সম্প্রদায়ে বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে এই সমস্ত সংগীত পরিবেশন করা হয়ে থাকে। দুর্গা পূজা ও লক্ষ্মী পূজার সময় গ্রামের ধর্মপ্রাণা মেয়েরা সমবেত হয়ে সমস্বরে এই গীতসমূহ গেয়ে থাকেন।

৩.২.৪ *কর্মসংগীত*

কাজের সঙ্গে সঙ্গে তাল রক্ষা করে যখন কোন সংগীত পরিবেশিত হয়ে থাকে,সেটিই সাধারণত কর্মসংগীত নামে পরিচিত। কর্মসংগীত বলতে আমরা মূলত সারি গানকেই বোঝে থাকি। আর সারিগান বলতে বিশেষ করে নৌকা বাইচের গানকেই বোঝানো হয়। নৌকা বাইচের সারিগান ছাড়াও এ অঞ্চলে আরেক প্রকার সারিগান আছে যা অশিক্ষিত গ্রাম্য চাষীদল মাঠে দলবদ্ধভাবে কাজ করার সময় কাজের তালে তালে গেয়ে থাকে।তবে কিশোরগঞ্জ জেলায় প্রচলিত কর্মসংগীতের মধ্যে নৌকা বাইচের গানই প্রধান। নদ-নদী-হাওর বেষ্টিত কিশোরগঞ্জ জেলায় মানুষের জীবনে নদী এবং নৌকা দারুণ ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। তাই এখানে নৌকা বাইচের গান বেশ জনপ্রিয়। নৌকা বাইবার কালে মাঝিগণ বৈঠার তালে তালে এই গান করে থাকে। এই গানের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এর তাল । বর্ষাকালে বিশেষ করে শ্রাবণ হতে ভাদ্র -আশ্বিন মাসের দিকে এই এলাকার নিম্নাঞ্চল যখন পানিতে পূর্ণ হয়ে বৃহদাকার হাওরে পরিণত হয় তখন বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষ্যে নৌকা বাইচের অনুষ্ঠান হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতাও হয়। এই নৌকা বাইচ উপলক্ষ্যে যে গান গাওয়া হয় তাই সারি গান নামে পরিচিত। বাইচের দিনে বাইচরা নৌকায় বসে এই গান গায়। সারিগানে মাঝে মাঝে ঢোল,মন্দিরা,করতাল ব্যবহৃত হলেও বাইচরা গানের সময় বৈঠার তালেই তাল রক্ষা করে থাকে। একজন বয়াতী নায়ের আগের গলুইতে দাঁড়িয়ে সারিগানের দিশা প্রথম অংশ সুরে গেয়ে যায়। আর বাইচরা সমস্বরে তা বার বার গায়। সাধারণত নদী , নৌকা ও জল সারি গানের বিষয়। প্রেমভাবই এর প্রধান ভাব হলেও মাঝে মাঝে নানা সামাজিক ,রাজনৈতিক বিষয়ও এর উপজীব্য হয়ে থাকে। সহজ আনন্দের অর্থহীন অভিব্যক্তিও অনেক সময় এর ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায়।

১.

ধূয়া :- তরা দেখ্ দেখ্ দেখ্ দেখরে নগরবাসী লোক
তরা দেখ্ চান মুখ ঝলমল করে ।।

Dhaka University Institutional Repository

আর:- নাইরিয়া নাইরিয়া গো
আরও নাইরে নাইরে নাররে
আর:- আশমানের নাই গো চন্দ্র / আর কি করিবে ভায়া
যেইবা নারীর পুরুষ নাই গা / তার ঘর আন্ধেরারে ।।
আর:- পুষ্কুনিত নাইগো পানি / কি করিতে তার সূতে
যেইবা নারীর পুরুষ নাই গা / কি করিবে তার রূপেরে।।(২৪)

২.

জিন্নাহ সাবের সাধের গড়া নাও
নাও নাওরে
তোমরা সবে তালের বৈঠা বাও।
জিন্না সাবে বলেন ওরে
লিয়াকত আলী খাও
আমার সাধের নৌকাখানি
তুমি গিয়া বাও,বাও বাওরে---
রাওয়ালপিন্ডির ঝড়ের পরে
শূন্য হইল নাও,
সদলবলে হক-সোহরাওয়ার্দী
উঠল এসে নাও,নাও নাওরে।
স্রোতের পাকে তাদের যখন
পিছলাইল পাও
বৈঠা নিয়া আইয়ুব সাহেব
উঠল এসে নাও, নাও নাওরে।
ঠিক করিয়া ধরছে হাল
পিট্টা বৈঠা বাও,বাও বাওরে-----।

চারদিকে বর্ষার উচ্ছ্বসিত জলরাশির মধ্য দিয়ে দ্রুতগামী একটি নৌকার দুই ধারে দুই সারি গায়ক বসে বৈঠার তালে তালে সারি গান গায়। এর সুরের মধ্যে যেমন গতির ক্ষিপ্রতা অনুভব করা যায়, তেমনি এর ভাবও পরিবেশ অনুযায়ী তরলিত হয়ে ওঠে।

রাধাকৃষ্ণ, রামসীতা কিংবা হরগৌরীর বিষয় অবলম্বন করেও সারিগান রচিত হয়। পূর্ব ময়মনসিংহ অঞ্চলে মনসার ভাসানের দিনই নৌকা বাইচের মূল বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হলেও ,সেখানে বেহুলার কাহিনী সারিগানে শুনতে পাওয়া যায় না।সমসাময়িক বিষয়বস্তু অবলম্বন করেও সারিগান রচিত হয়ে থাকে। কোন কোন সারিগানে আল্লাহ নবীজীর নামও শুনতে পাওয়া যায়–

ধূয়া :- ওরে ধইলে না যায় মনের কালী/ দু:খ না যায় কান্দিলে
চিন্তা রোগের ওষুধ নাইগো / জাত ঘুরিলে।।
আর:- ভাল হে আল্লাহ আমিন / বলগো মমিন মমিনা ভাই
সার কেবল আল্লার নাম এই অসার দুইন্যাই।।
আর:- এক দমে আছে দুইন্যাই / আর এক দমে নাই
বাতাসে উড়াইয়া নিল / পুরা বদনের ছাই।।
আর:- লই ভাই আল্লাজীর নাম মন কইরা ধর
নবীজী লইয়াছে নামটি তার উন্নত কর বড়।।
আর:- নবী মাতার নবী মাতার / নবী আমার কইলজার ফুল

Dhaka University Institutional Repository

নৌকা বাইচ এখন প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে ,সঙ্গে সঙ্গে এর সম্পর্কিত সংগীতগুলিও বিস্মৃত হওয়ার উপক্রম হয়েছে।তবে এখনও কিশোরগঞ্জ জেলার ভাটি অঞ্চলগুলিতে বর্ষাকালে চিত্তবিনোদনের উপায় হিসাবে স্থানে স্থানে নৌকাবাইচের আয়োজন করা হয়।

৩.২.৫ প্রেমসংগীত

যে সংগীতের ভিতর দিয়ে নর-নারীর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ অনুভূতি ব্যক্ত করে থাকে, তাই প্রেম সঙ্গীত। লোকসংগীতের মধ্যে এর আবেদনই সর্বাপেক্ষা বেশী।এই সংগীত গাওয়ার নির্দিষ্ট কোন স্থান নেই-কালও নেই। তবে অলস অবসর মুর্হূতই প্রেমসংগীতের উৎকৃষ্ট সময়।

বাংলার প্রেমসংগীত মূলত ভাটিয়ালি সংগীতই। কিশোরগঞ্জের ভাটিয়ালিগান সর্বজন বিদিত।কিশোরগঞ্জের ভাটিয়ালি গান এই অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ থাকেনি,তা আঞ্চলিকতার সীমাকে অতিক্রম করে সর্বত্রই গীত ও সমাদৃত হয়েছে।

নদ-নদী, বিল-ঝিল ও হাওরের পানির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত কিশোরগঞ্জের মানুষের জীবনযাত্রা । এই পানি একদিকে তাদের অন্ন যোগায়, অপরদিকে প্রবল বন্যা মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়। এই নদ-নদী, বিল-ঝিল ও হাওরের ধারে কিংবা বুকের উপর বাস করে যে সকল চাষী,মাঝি-মাল্লা তাদের প্রাত্যহিক জীবন-যাপনে এই জলমগ্ন প্রাকৃতিক আবহের সাথে একটা নিবিড় প্রাণের বন্ধন স্থাপন করেছে- ভাটিয়ালি গান তাদের সেই প্রাত্যহিক আনন্দ-বেদনারই সুর রূপ।এই ভাটিয়ালি গানের মধ্যেই সরল সৌন্দর্যে ফুটে উঠেছে নিরক্ষর চাষী ও মাঝি-মাল্লার সুখ-দু:খ এবং প্রেম -ভক্তি ভালোবাসার কথা। ভাটিয়ালি গানই প্রায় সর্বপ্রকার পল্লী সংগীতের সবচেয়ে পুষ্ট ও বেগবান অংশ। পল্লী পরিবেশের স্বভাবনিকুঞ্জে ভাটিয়ালির জন্ম। এই গানের উৎপত্তি স্বতস্ফুর্ত ভাবেই হয়েছিল বলে ভাটিয়ালি গান স্বয়ংসম্পূর্ণ। ভাটিয়ালি সংগীত সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন ," যাহার তাল নাই , যাহা অলস অবসরের গীত ,তাহাই ভাটিয়ালী বলিয়া পরিচিত।"[২৬]তিনি ভাটিয়ালি গানকে বাংলার সমগ্র পল্লীগীতির ভিত্তি বলে অভিহিত করেছেন।

গানের সৌন্দর্য ও রূপ-রস নির্ভর করে তার সুরে, কথায় বা অলংকারে নয়। ভাটিয়ালি গানের সুর অনন্য ও অসাধারণ। প্রেম-বিরহই ভাটিয়ালি গানের প্রধান উপজীব্য বিষয়। ভাটিয়ালি সুরের মধ্যে যে বিরহভাবটি ফুটে ওঠে তা মানব হৃদয়ে আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

ভাটিয়ালি সুরের মত মন-প্রাণ কেড়ে নেওয়ার মত প্রভাবসম্পন্ন সুর আর দ্বিতীয়টি আছে বলে মনে হয় না।ভাটিয়ালির খাঁটি রূপ সম্বন্ধে জানা যায় "ভাটিয়ালী গায় একজনে , শোনেও বোধহয় একজনেই। হাতে কোন কাজ নেই , পাল তুলে দিয়ে হাল ধরেছে নৌকার মাঝি, এই অবসরটুকু ভরে তুলবার জন্যে সে গান ধরেছে।[২৭]

নদীরে তুই আর কত,খেলবি নিঠুর খেলা
তোর বুকেতে কত মাঝি, ডুবলো অবেলায়।
তোর উতাল পাথাল ঢেউ এর বুকে
ভয় লাগে মোর মনে
মুর্শিদ নামের পাল উড়াইয়া
উজান বাইয়া যাইরে,নদী উজান বাইয়া যাইওে

Dhaka University Institutional Repository

করিস না তুই সর্বহারা
ভাঙ্গা গড়ার খেলা॥
নদীরে তোর জলের স্রোতে
ভাইঙ্গা নিল বসত বাড়ী
আরো যে সকল রে,নদী আরো যে সকল॥

আষাঢ় মাইসা ভরা গাঙ্গে,ভাটিয়ালী গান গাইয়া
সব কিছু হারাইরে আমি তোর বুকে নাও বাইয়া
সাঝের বেলায় কান্দে সাত্তার
না বুঝে তোর লীলা॥ (২৮)

নদীর জলের সঙ্গে সীমাহীন প্রান্তরের সঙ্গে এর সুর বাঁধা। উপরে অনন্ত নীলাকাশ, নীচে বহমান নদী, চারদিকে দিগন্তবিস্তৃত জলরাশি,প্রকৃতির স্তব্ধ পরিবেশ নি:সঙ্গ মাঝিকে উদাসীন করে তোলে। কর্মহীন অবসরে নদীর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে নির্জন পরিবেশে একাকী মাঝি ভাটিয়ালি গান গেয়ে চলে। পরকে শোনাবার তাগিদ নেই, তাড়াহুড়ো করবার কোন প্রয়োজন নেই- তাই তার কণ্ঠ থেকে যে গান বেরোয়, সে গান ছন্দের বন্ধনে সুরকে চঞ্চল করে তোলে না, সুর আর ছন্দকে ছাড়িয়ে ভাবই এখানে প্রাধান্য লাভ করে।

ভাটিয়ালি গানের মূল উপজীব্য বিষয়ই হচ্ছে প্রেম। এই প্রেম অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিরহভাবকে ধারণ করে থাকে। যেহেতু অলস-ক্লান্ত প্রাণ থেকেই প্রধানত ভাটিয়ালি সুরের প্রকাশ ঘটে,তাই মানবহৃদয় যখন একাকিত্ব অনুভব করে,বাইরের বিশাল বন্ধনহীন বিস্তার যখন তাকে উদাস করে তোলে তখনই তার কণ্ঠ থেকে নি:সৃত হয় বিরহভারাক্রান্ত ভাটিয়ালি সুর।

কি দেখিলাম জলের ঘাটে আইয়ারে
ও বিনোদিনী
এতদিন কই আছিলা লুকাইয়া
মন উদাসী দিবানিশি কান্দি পথে বইয়ারে
ও বিনোদিনী॥
মন কান্দে যার আমার লাগি
আমি পাগল তার লাগিয়া॥

তারি সাথে আছি বান্দা থাকি
তার ঘরে লুকাইয়ারে ও বিনোদিনী
পরান কান্দে তোমার লাগিয়া॥
আমি তো তোমারি পাগল
আমি সব দিলাম সপিয়া
কেমন করে ছিলে তুমি
আমায় পাশরিয়ারে, ও বিনোদিনী
এত দিন কই আছিলা লুকাইয়া (২৯)

Dhaka University Institutional Repository

কালের আবর্তনে নানা রুচির বির্পযয়,আর্থিক,সামাজিক,রাজনৈতিক,সাংস্কৃতিক কারণে পল্লীসমাজের অমূল্য রত্ন লোকসংগীতগুলো বর্তমানে লুপ্তপ্রায়। তারপরেও এই অঞ্চলের সংগীত পিপাসু মানুষ এখানকার ভাটিয়ালি,জারি-সারি অতি যত্নের সাথে আগলে রেখেছে।পল্লীবাসীর মুখে মুখে এদের জন্ম ,মুখে মুখেই প্রচার ও কেবলমাত্র তাদের স্মৃতির মধ্যেই এর অবস্থান। এই রীতি পুরুষানুক্রমিক চলে এসেছে এবং আজও এর ক্ষীণধারা অব্যাহত আছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৩ ছড়া

ছড়া লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম বিষয় বলে অনুমান করা হয়। এটি লোকসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট অংশ। প্রত্যেক দেশেই নিজস্ব পরিমণ্ডলে কিছু ছড়ার উদ্ভব হয়। ছড়াতে এক ধরনের সুর ও তাল বিদ্যমান থাকে। তবে তা লোকসংগীত থেকে স্বতন্ত্র ।এতে কোন নির্দিষ্ট কাহিনী থাকে না, ভাবও থাকেনা, থাকে কেবল একটা অসম্পূর্ণ চিত্র।

কিশোরগঞ্জে প্রাপ্ত লোকসাহিত্যের মধ্যে ছড়া উল্লেখযোগ্য। ছড়া এই এলাকার লোকসাহিত্যকে করেছে সমৃদ্ধ ও পরিপূর্ণ। কংশ,ধনু,মগরা,সোমেশ্বরী,উবধাখালি,নরসুন্দা নদী বয়ে চলছে ময়মনসিংহ জেলার পূর্বাঞ্চলের ভেতর দিয়ে।এগুলোই এই এলাকার লোকসাহিত্যের উৎস হিসাবে বহমান।এই পরিবেশ থেকে জন্ম নিয়েছে নানা প্রকারের ছড়া,গাথা,সংগীত,এক কথায় লোকসাহিত্যের অমর সম্পদগুলো। ছড়া মূলত শিশুর মনস্তুষ্টির জন্য রচিত হলেও কিশোরগঞ্জে প্রাপ্ত ছড়াসমূহে এই এলাকার মানুষের দৈনন্দিন জীবনের খুটি-নাটি ঘটনাগুলির চিত্র পরিস্ফুট হয়ে থাকে।এখানকার ইতিহাস-ঐতিহ্য, সামাজিক রীতি-নীতি প্রভৃতি বিষয়ও ছড়াগুলিতে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। মানবজাতির সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কের চিরন্তন বাণীও এর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়।পূর্ব ময়মনসিংহের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য,নদীর অপরূপ বর্ণনা সমাজের বিরহ-ব্যথা,প্রেম,মায়া-মমতা,সুখ-দুঃখ,আক্ষেপ,আশা-নিরাশা, ভাল-মন্দের এক চমৎকার সন্নিবেশ ছড়ায় অবলোকন করা যায়।

পূর্বে ঘুম পাড়ানির ছড়া শুনিয়েই শিশুর চোখে ঘুম নামানোর চেষ্টা করা হতো।এ জন্য নানি,দাদি, মা, খালা, ফুফুরা কথার পর কথা দিয়ে মিল সৃষ্টি করে চমৎকার ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি করতো। এমনি ভাবে সৃষ্টি হতো ছড়া।তারপর এসব ছড়াই বালক-বালিকা,কিশোর-কিশোরীর মুখে মুখে উচ্চারিত হতো । কিশোরগঞ্জের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ সমস্ত ছড়া ছড়িয়ে আছে।এই ছড়াগুলিকে বিষয়বস্তুর দিক থেকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন -ঘুম পাড়ানির ছড়া, ছেলে ভুলানোর ছড়া, ছেলে খেলার ছড়া, মেয়েলি ছড়া, বিভিন্ন উৎসব-পার্বণাদির ছড়া, কৃষি ও গার্হস্থ্য জীবন ভিত্তিক ছড়া।

৩.৩.১ ঘুম পাড়ানি ছড়া

শিশুর ঘটমান জীবনের প্রতিটি পর্যায়েই ছড়া তার উজ্জ্বল সাথী, নির্জনে-কোলাহলে সর্বত্র। তাই ছড়ার বিষয়বস্তুর সিংহভাগ ধারণ করে আছে শিশু। শিশুতোষ ছড়াগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় শিশুর ঘুম পাড়ানির ছড়ার কথা। শিশুর ঘুম মায়েদের একটি প্রধান সমস্যা। মাকে সংসারের নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়।কিন্তু শিশুর দুরন্তপনা জননীর কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তখন মা শিশুকে ঘুম পাড়াতে বসেন। দুই হাটুর উপর শিশুকে শুইয়ে রেখে হাটু দুটি মৃদু মৃদু দোল দিয়ে অথবা দোলনার মধ্যে শুইয়ে ধীরে ধীরে দোলনাটিকে দোলাতে দোলাতে মায়েরা নানা রকম ছড়া কাটেন। ছড়ার সুর শিশুর কানে একটি অপূর্ব মায়াজালের সৃষ্টি করে, সেই বিচিত্র সুরের মায়াজালে জড়িয়ে শিশু ঘুমিয়ে পড়ে।

নিন্দাওলী মায়া গো
আমার বাড়ী যাইও।
ঘাট নাই পিড়ি নাই
আবুর{শিশু}চোখে বইও{বসিও}
আবুর চোখে ঘুম নাই
ঘুম দিয়া যাইও।[৩০]

Dhaka University Institutional Repository

শিশুর ঘুম পাড়ানির এই ছড়াটি বিখ্যাত। অঞ্চলভেদে এই ছড়ার পাঠান্তর হয়ে থাকে। এছাড়াও ঘুম পাড়ানির আরও অনেক ছড়া আছে।যেমন-

আয় চাঁদ লড়িয়া
সোনার ঘোড়ায় চড়িয়া
হাল বাইতে বলদ দিমু
চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়া যা।

৩.৩.২ *ছেলে খেলার ছড়া*

ঘুম পাড়ানির ছড়ার পরেই আসে ছেলে খেলার ছড়ার কথা। শিশুতোষ খেলাগুলিতে ছড়া একটি প্রধান অংশ।শিশুরা বিভিন্ন খেলায়{কানামাছি,বৌচি,,গোল্লাছুট,এক্কা-দোক্কা,পাচঁগুটি}নানারকম ছড়া ব্যবহার করে থাকেন। কোন কোন ছড়ার মধ্য দিয়ে তারা খেলায় জয়লাভের আশা ব্যক্ত করে থাকে। যেমন-

পয়লা ছি সেলামালি (সেলাম দেওয়া)
গোল্লা দিয়াম আলি (হালি)আলি।

খেলার সময় তারা এক নি:শ্বাসে এই ছড়াটি পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। নিঝুম দুপুরে যখন সমগ্র প্রকৃতি নিস্তব্ধ,তখন ছেলে-মেয়েরা মাকে ফাঁকি দিয়ে ঘর থেকে বেড়িয়ে পড়ে এবং গাছুয়া গাছুয়া খেলা করে।এই খেলার ছড়াটি প্রশ্নোত্তরবাচক। যেমন-

গাচ্ছুয়া রে গাচ্ছুয়া গাছ কেরে?
বাঘের ডরে।
বাঘ কই?
মাডির তলে।
মাডি কই?
এইত।
তোর হাতে কি?
পান-সুপারী।
একটা পান দিবে?
ছুইতে পারলে নিবে।

কাউকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে আনন্দ লাভ করা শিশুদের একটা সহজাত প্রবৃত্তি।এই অঞ্চলের শিশুদের মধ্যে এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন কারো মাথার চুল ফেলে দিলে তাকে নিয়ে সবাই কৌতুক করে ও ছড়া কাটে-

মাথা ছিলা বৈরাগী,
আণ্ডা পারে অড়অড়ি
একটা আণ্ডা নষ্ট,
বৈরাগীর মার কষ্ট।

Dhaka University Institutional Repository

কেউ বড়শি দিয়ে মাছ ধরতে থাকলে ছেলে-মেয়েরা দুষ্টামি করে তার বড়শিতে যেন মাছ না ধরে সে জন্য ছড়া কাটে-

বর্শী বান্দর ,বর্শী বান্দর
বর্শী নিল চুরে।
এই বড়িত মাছে ধরলে
মুখ পুইড়া মরে ॥

শকুন পাখি দেখলেই তারা ছড়া কাটে-

হহিন{শকুন}মরা গিরধনী
একটুক দাওয়াই দিবেনি?
দিবাম দিবাম বৈকালে
পুলাপুড়ি{ছেলে-মেয়ে}ঘুমাইলে ॥

অপরিচিত কোন বুড়িকে দেখলেও তারা সমস্বরে ছড়া কাটে-

ও বুড়ি কই যাছ?
বাপের বাড়ি।
বাপে দিল হুলার{পাটকাটি}বাড়ি
মায়ে দিল পাডের{পাটের}শাড়ি ॥

এই ছড়াগুলি ছেলে-মেয়েরা খেলার ছলে,আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যে করে থাকে। একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ছেলেদের এবং মেয়েদের খেলা অভিন্ন থাকলেও, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের খেলাও ক্রমে পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যায়। তখন ছেলে ও মেয়েরা তাদের নিজস্ব জগৎ অনুযায়ী খেলা তৈরি করে এবং ছড়া কাটে। যেমন - বৌ চি খেলাটি একান্তভাবে মেয়েদের খেলা।এই খেলায় বৌ কিভাবে শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে বাপের বাড়ি যায় তার চিত্র আছে।এই খেলায় ' চি' দেওয়া হয়। এই ' চি' দেওয়ার সময় এক নি:শ্বাসে নানা রকম ছড়া কাটে। যদি ছড়া শেষ হয়ে যায়, কিন্তু 'চি' শেষ না হয়, তাহলে ছড়ার শেষ চরণটি বার বার আবৃত্তি করতে থাকে। যেমন-

গেছলাম উত্তরে,
ধান খাইছে কইতরে
কইতর ভাজা ,খাইতে মজা।

শিশুদের ছড়ায় পল্লী মানুষের জীবনের খুঁটি-নাটি দিকও ফুটে উঠেছে। গ্রামের মানুষের ধারণা আছে শরীরের কোন স্থানে কাঁটা বিধঁলে বা কেটে গেলে, এর ব্যথা উপসমের জন্য ক্ষতস্থানে পাটের পাতার রস দিতে হয়। ছড়াগুলিতে এই কথাও ব্যক্ত হয়েছে।

কই গেছলাম রে, কই গেছলাম
বড়ই কাটা বিন্দ্যাইছলাম
বড়ই কাটার এত বিষ

Dhaka University Institutional Repository

কি দিলে না যাইব বিষ
নাইল্যা{পাট গাছ}পাতা ছেইচ্ছ্যা দিস।

সব ছড়ার মধ্যেই যে অর্থযুক্ত ভাব থাকে, তা নয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, মেয়েরা খেলার তালে তালে ছড়া কাটে এবং এসব ছড়া প্রায় সময়ই অর্থপূর্ণ হয় না। যেমন– পাঁচগুটি খেলার সময় মেয়েরা যে ছড়াটি কাটে তা নিম্নরূপ:

এতুল বেতুল তেঁতুল খান
দুটি চাম্পা পঞ্চাশ গ্রাম
তিনের চটক চারের দানা
পঞ্চম খানা।

এই খেলার ছড়াগুলি নিতান্তই কম বয়সের মেয়েরা রচনা করে থাকে। ছেলেদের মতো মেয়েরা একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর আর ঘরের বাইরে গিয়ে খেলতে পারে না। মেয়েদের মধ্যে যখন একটু স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগে তখন তাদের আর খেলা-ধুলা করার অবসর থাকে না। অধিকাংশই প্রবেশ করে ঘর-সংসারে,সেইজন্যে খেলার পরিবর্তে শিশু ও সংসার সম্পর্কিত বিষয় নিয়েই তারা বেশী ছড়া রচনা করে থাকে।

ছেলেদের শৈশব মেয়েদের মতো ক্ষণস্থায়ী নয়। তাই তারা অনেক দিন খেলাধূলা করতে পারে। তবে নানারকম ছড়া রচনায় মেয়েদের মতো তারা এত পারদর্শী হয় না। ছেলেদের খেলার মধ্যে' হা-ডু-ডু' খেলাই প্রধান।এই খেলার মধ্যেও 'চি দেওয়া' হয়।এই সময় তারা নানা রকম ছড়া কাটে।এই ছড়াগুলির মধ্যে পুরুষোচিত প্রাণশক্তির স্পর্শ অনুভব করা যায়। যেমন-

১.কলার গাছের ডাওগ্যা,বেটা হইলে আওগ্যা।

২.ধরছি চি ছারতামনা
না মাইর‍্যা আইতামনা।

৩.আল্‌লা দিছে পাল্‌লা ধারী
খদায় দিছে জমিদারী
দশ টাকা দিয়া লড়িছড়ি
কোন ব্যাটার ধার ধারি?

৪.চি মারলাম চিকর গোটা
হাতি মারলাম মোটা মোটা
বঁইশ মারলাম লাফে
তলোয়ার কাঁপে।

খেলাধুলা ছাড়াও যুবক বয়সের ছেলেরা অন্যান্য ছড়াও রচনা করে থাকে। নানা বা দাদা সম্পর্কিত আত্মীয়দের সাথে তারা ঠাট্টা-তামাসা করে নানারকম ছড়া কাটে।যেমন-

Dhaka University Institutional Repository

দাদা গো দাদা
খাদা বুইনা দেও
খাদার তলে কুনি ব্যাঙ
বউ আইন্যা দেও।
বউ কেরে কালা,
নাক কাইট্যা ফালা।
নাকে কেরে লউ{রক্ত},
কাট কুরাইল্যার বউ
কাট কুরাইল্যা গেছে হাট,
বর্শী ফালছে ঘাট।
ধরছে বউএ{রুইমাছ} কাটছে বউএ
একটা ডোম বিলাই নিছে
সারা রাত কিলাইছে।(৩১)

কোন কোন ছড়া কেবলই হাস্যরস সৃষ্টি করার জন্য রচিত হয়ে থাকে।নানা রকম অবাস্তব ঘটনা বর্ণনা করে এই সমস্ত ছড়ায় হাস্যরস সৃষ্টি করা হয়।যেমন-

আমার নাম পাঁচ কুড়ি
কইলে কইবা গপ্প করি
যারেই পাই তারেই মারি
রেলগাড়িরে টাইন্যা ধরি।
আমি গেলাম জঙ্গলে
প'ইলাম সাপ,
সাপেরে মারলাম লাথি
অইয়া গেল একটা হাত্তি।
হাত্তির উপরে উইট্যা গেলাম শ্বশুর বাড়ি
শ্বশুর বাড়িত গিয়া দেখি
পাঁচ কুড়ি শালা,পাঁচ কুড়ি শালি
লাগল একটা কিলাকিলি
আমি কি আর এইখানে থাকতাম পারি?

৩.৩.৩ *মেয়েলি ছড়া*

Dhaka University Institutional Repository

কিশোরগঞ্জের ছড়াগুলির মধ্যে মেয়েলি ছড়া উল্লেখ যোগ্য।এই ছড়াগুলিতে নারীর জীবনের সুখ-দু:খ,আনন্দ-বেদনার কথা ব্যক্ত হলেও এর মধ্য দিয়ে এখানকার মানুষের জীবন-যাত্রা,আচার-আচরণ,সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় অত্যন্ত চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। যেমন-

আমতলা ঝুম্‌মুর ঝুম্‌মুর
কাডল তলায় বিয়া।
কাজলনীরে নিত আইবো
কাজল ফোটা দিয়া॥
আইজ দিব না বিয়া
কাইল দিব বিয়া।
কইন্যা দিবাম সাজাইয়া
টেকা লইবাম বাজাইয়া॥
কন্যার মাথায় লাল চুল
কই পাই জবা ফুল।
জবা ফুলের গন্ধে
খুপা বান্দে নন্দে॥
খুপার মাইঝে{মধ্যে} ধোড়া হাঁপ{সাপ}
ফাল{লাফ} দিয়া উডে বৌয়ের বাপ।
বেয়াই সাবের ডরে
ভুতুর ভুতুর করে॥ (৩২)

সব বাঙালি মেয়ের মনেই শ্বশুরবাড়ির প্রতি একটা ভীতি রয়েছে,বিশেষ করে গ্রামের মেয়েদের। তাই শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার সময় যে হৃদয়বিদারক দৃশ্যের সৃষ্টি হয় তা ছড়াগুলিতে দেখতে পাওয়া যায়।যেমন-

আম গাছের বৌলা গো,
শূয়া পক্ষী ডাকে গো ।
মা এ বলে ঝি লো,
তরে নিত আইছে গো ।
মাগো মা কাইন্দ্য না,
শ্যামের গলা ভাইঙ্গনা ।
শ্যাম গেছে বাজিতপুর,
ফুট্‌ট্যা রইছে চাম্পা ফুল।
চাম্পা ফুলের গন্ধে,
জামাই আইছে আনন্দে।
খাও গো জামাই বাটার পান,
সুন্দরীরে কর দান।
সুন্দরীরে পাইনা,
বাডার পান খাইনা।
সুন্দরীরে পাইলাম।

Dhaka University Institutional Repository

বাডার পান খাইলাম ॥ (৩৩)

শ্বশুরবাড়িতে অবস্থান কালে কন্যার কেবলই মনে পড়ে পিত্রালয়ের স্বজনদের কথা। সে তাদের জন্য দিনের পর দিন পথ চেয়ে থাকে । তাই নদীর ঘাটে কোন পরিচিত জনকে পেলে তাকে দিয়ে সে খবর পাঠায়। ছড়াগুলিতে এর বর্ণনা আছে।

চাচাত ফুফাত ভাইও নারে
গাঙয়ে বাইয়া যায়,
মার পেডের ভাইও নারে
ফিইরা ফিইরা চায়।
ভাইয়েরে কইও গো আমারে
নাইয়র নিত আইয়া,
থাক থাক বইনী গো
কিল মুড়া খাইয়া,
সামনের মাস নিতাম আইবাম
কাঁকুয়্যা ধান দাইয়্যা।
কাঁকুয়া ধানের খিচুরি মিচুরি
হাইল ধানের চিড়া,
আয় পরাণ পুড়েরে,
জাইত মরিচের গুড়া। (৩৪)

শাশুড়ি-ননদিনীর সাথে বধূর সম্পর্ক যে কখনো মধুর হয় না, তার পরিচয় ছড়াগুলিতে দেখতে পাওয়া যায়–

অতি ধতি জ্বালা না গো মায়া
কাল ননদীর জ্বালা।
তোমার ননদে রাখবা বুঝাইয়া
মুখের হাসি দিয়া।
অতি ধতি জ্বালা না গো মায়া
কাল শাশুড়ির জ্বালা,
তোমার শাশুড়িরে রাখবা বুঝাইয়া
ভাতের খুশি দিয়া। (৩৫)

বিয়ে ও অন্যান্য পার্বণাদির ছড়াগুলিও মেয়েলি বলে পরিচিত।বিভিন্ন উৎসবকে কেন্দ্র করে মেয়েরা মুখে মুখে এইসব ছড়া রচনা করে থাকে। বিয়ের গায়েহলুদ অনুষ্ঠানে যে ছড়াটি তা নিম্নরূপ-

যখন মেন্দির একটি পাতা ধরিছে
তখন সাধুর বিয়ার কুকিল ডাকিছে।
যখন মেন্দির দুইটি পাতা ধরিছে

Dhaka University Institutional Repository

তখন সাধুর বিয়ার কুলা কিনেছে ।[৩৬]

নতুন জামাই শ্বশুরবাড়িতে আসলে তাকে নিয়ে বাড়ির মেয়েরা ছড়া কাটে-

উড়িগুড়া{সীমের বিচি}ঝনঝন
জামাই আইয়্যে তিনজন।
যুদি কইন্যা হরে
জামাই আইয়্যে ঘরে।

৩.৩.৪ *শ্রমজীবী মানুষের ছড়া*

আর এক শ্রেণীর ছড়া আছে যেগুলো সাধারণত: নৌকা, বৃক্ষ বা ভারী মাল উঠানোর সময় বলা হয়। দলের সর্দার প্রথম লাইনের কথাগুলি বললে পরে অন্যরা সমস্বরে 'হেঁইও' বা 'হেঁইছ' বলে থাকে।

এইরে জোয়ান ভাই , ... 'হেঁইও'
মার ঠেলা, ... 'হেঁইও'
আরও জোরে, ... 'হেঁইও'
আল্লার নাম, ... হেঁইও'

কিশোরগঞ্জ জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের ছড়া ছড়িয়ে রয়েছে।এখানকার মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলির আলোকে এই ছড়াগুলি রচিত। মানুষের দু:খ-বেদনা, সুখ ও আনন্দময় অনুভূতি থেকেই এদের জন্ম হয়েছে। কবে, কোন পরিস্থিতিতে কে বা কারা এই ছড়াগুলি রচনা করেছিল তা জানা যায় না, তবে এগুলি মধ্যযুগের সৃষ্টি এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলির আলোকেই ছড়াগুলি রচিত হয়েছিল। তবে মধ্যযুগের সৃষ্টি হলেও এ ছড়াগুলির আবেদন এখনও বিদ্যমান।

৩.৪ *ধাঁধা*

'ধাঁধা' লোক সাহিত্যের একটি স্বাধীন অঙ্গ। যে কোন বাক্য দ্বারা একটি মাত্র ভাব রূপকের মাধ্যমে জিজ্ঞাসার আকারে প্রকাশ করা হয় যা তাকে 'ধাঁধা' বা হেয়ালী বলে।ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে,' এর বাইরের পরিচয়টি সংক্ষিপ্ত হলেও সরস অর্ন্তনিহিত পরিচয়টি অপ্রত্যক্ষ হলেও বুদ্ধিগম্য।'[৩৭] 'ধাঁধা'র জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়া অসাধ্য না হলেও সহজসাধ্য নয়, তবে 'ধাঁধা'র উত্তর জনশ্রুতিতে প্রচলিত থাকে বলেই এর উত্তর যে কেউ দিতে পারে, কিন্তু এর তাৎপর্য উপলব্ধি করে উত্তর দেওয়া বেশ কষ্টসাধ্য। ডক্টর ওয়াকিল আহমদের মতে,"ধাঁধা রচনায় বুদ্ধির সঙ্গে কল্পনার মিশ্রণ দরকার হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তবে এতে আবেগের স্থান নেই। এজন্য ধাঁধার অবয়ব দীর্ঘ হয় না।গদ্যে ও পদ্যে ধাঁধা রচিত হয়;সাধারণত গদ্যাশ্রিত ধাঁধা একটি বাক্যে এবং পদ্যাশ্রিত ধাঁধা ছন্দোবদ্ধ ও অন্ত্যমিলযুক্ত দুই থেকে চার চরণে সমাপ্ত হয়। বুদ্ধির ও কল্পনার মিশ্রণ থাকায় ধাঁধা শুষ্ক প্রশ্নোত্তরে পরিণত হয় না,বরং রূপক-প্রতীক-চিত্রকল্পের গুণে তা যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক ও রসধর্মী রচনার রূপ ধারণ করে।"[৩৮]

কিশোরগঞ্জ জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে নানা রকম 'ধাঁধা' সংগ্রহ করা হয়েছে। নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র এবং প্রকৃতির নিত্য পরিচিত উপকরণই এই সমস্ত 'ধাঁধা'র অবলম্বন বা মাধ্যম। বিষয়ানুসারে 'ধাঁধা'গুলিকে দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যেতে পারে ; যথা প্রকৃতিবিষয়ক ধাঁধা ও গার্হস্থ্য জীবনবিষয়ক ধাঁধা। প্রকৃতিবিষয়ক 'ধাঁধা'র মধ্য দিয়ে কল্পনা ও রসের প্রাচুর্য্য অনুভব করা যায়। যেমন –

১) পানির তলে হিজল গাছ
কাটা যায় না বার মাস। (ছায়া)
২) ঘাট পিছলা কদম ফুল
কাকুয়া ডাকে বহুদূর। (মেঘ)
৩) আল্লাহ তালার ফুলবাগানে
ফটুছে নানান ফুল ,
কোন কালের পন্ডিতের দল
গণন্যা পায় না কোল। (আকাশ ও তারা)
৪) এত্ গাছ টান দিলে বেত্ গাছ লড়ে ,
কুক্ করে ডাক দিলে ঝর্ ঝর্ পরে। (মেঘ ও বৃষ্টি)
৫. থালি ঝন্‌ঝন্,থালি ঝন্‌ঝন্
থালি নিছে চুরে,
বিন্নাডি আগুন লাগজে
কে নিভাইতে পারে? [রোদ]
৬. জন্মকালে দুই শিং
যৌবন কালে নাই শিং
মরবার কালে হয় শিং। [চাঁদ]

একই বিষয় নিয়ে একাধিক 'ধাঁধা'ও দেখতে পাওয়া যায়। যেমন –

আমি যাই তোমারে আন্‌তাম
পথে পাইলাম তোমারে।
ছাড়ইয়া দেও আমারে
আনি গিয়া তোমারে ॥

অর্থাৎ গ্রাম্য বধূ কলসী নিয়ে পানি আনতে রওয়ানা হল। পথে বৃষ্টি নেমে বাধা দিলে বধূ বৃষ্টিকে এই কথা বলছিল। গার্হস্থ্যজীবন বিষয়ক 'ধাঁধা'র মধ্য দিয়ে বাস্তব জীবনের খুঁটি-নাটি বিষয়গুলির পরিচয় মূর্ত হয়ে উঠেছে। যেমন –

১/ মাটির তলের বুড়ি

Dhaka University Institutional Repository

তেনা পিন্ধে ছয় কুড়ি
তেও বুড়ি সুন্দুরী। (রসুন)

২/ আইলে দিয়া বলদ যায়
লেঙ্গুরে ঘাস খায়। (সূচ)

৩/ তিন অক্ষরে নাম তার নয়নেতে ঠাঁয়
মাঝের অক্ষর বাদ দিলে আঁধার হয়ে যাই। (কাজল)

৪/ বিলে না ঝিলে
জন্ম তার খালে
পেটের ভিতর পা
জিহ্বা তার গালে। (জুতা)

৫/ উপরের বাড়িতে আগুন লাগছে
মধ্যের বাড়ি থাইম্যা রইছে
নীচের বাড়ি ডাক মারছে। (হুকা)

৬/ একটু খানি চুনকাম করা ঘর
ভাইংগ্যা বানতে সবার লাগে ডর। (ডিম)
অথবা
এক জাত গেলাসে দুই জাত পানি
আমি তারে উস্তাদ মানি।

৭/ দীঘি খুদি পানি নাই
শিকার করি বাঘ নাই
সোয়া পংখী পানি খায়
দুনইয়াই দেখা যায়। (আয়না)

৮/ দিনে মরে রাত্রে জিয়ে
আলো দেয় ঘর ঠিকরে। (প্রদীপ)

৯/ উপরে মাটি , নিচে মাটি
মধ্যে সুন্দর বেটী। (হলুদ)

১০/ এক শালিকের তিন মাথা
সে খায় বনের লতাপাতা। (চুলা)

১১/ সাগরেতে জন্ম আমার সাগরেতে বাসা
সাগরেতে গেলে আমার মরণ সর্বনাশা। (লবণ)

১২/ ছোট্ট পুষ্কুনিটা কৈয়ে ভুর ভুর করে,
রাজা আইয়ে বাদশা আইয়ে
তুইল্যা সেলাম করে। (হুক্কা)

উদ্ভিদ ও ফলমূল সংক্রান্ত অনেক 'ধাঁধা'র প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। যেমন –

১. বিল ঝিল শুকাইয়া গেল

Dhaka University Institutional Repository

গাছের আগায় পানি রইল। (নারিকেল)

২. বার মাসের মেয়ে বটে
তের মাস গেলে
গন্ডায় গন্ডায় জন্ম দেয়
অগণন ছেলে। (কলাগাছ)

৩. উঠান ঠন্ ঠন্ বৈঠক মাটি
মা গর্ভতী পুতে ধরেছে ছাতি। (সুপারী গাছ)

৪. এতটুকু পক্ষীর এতটুকু গোশ্ত
এই শিলোক যে ভাংগায় সে আমার দোস্ত। (সুপারী)

৫. গাছ হইতে আইলা হূমা
হূমার ভিতর রসের ডুমা। (কাঁঠাল)
অথবা
কণ্ঠকে আবৃত দেহ সজারু সে নয়
মানুষ পাইলে গন্ধ তখনি ছেদ হয়।

৬. নারীর মহলে থাকি কিন্তু নারী নই
যুবাকালে সতী আমি বৃদ্ধকালে নই
রসবতী নাম মোর সবে রস পায়
মোরে দেখে নর-নারী কাকুতি জানায়। (পান)

৭.কান্দার উপরে কান্দা
লাল কাপড় দিয়া বান্দা। (কলার মোচা/থোর)

৮.এক ব্যাডা হাউদ
গতর ভরা দাউদ। (আনারস)

৯.উড়ে যায় পাখি
তারে আমি ডাকি
কোন গাছের কোন ফল
রক্তে টলমল?[জাম]

১০.উপরে পাতা নিচে দাড়ি
ইজ ছাড়া চলে গাড়ি। (কচুরী পানা)

১১.এক দেশে দেইখ্যা আইছি
অনুমানের ছানি
আরেক দেশে দেইখ্যা আইছি
গাছের আগায় পানি। (ডাব)

১২.সবুজ মিয়া হাটে যায়
যাইতে যাইতে চিমটি খায়। (লাউ)

প্রাণী ও জীবজন্তু সম্বন্ধীয় 'ধাঁধা'ও এই অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন –

তিন অক্ষরে নাম জংগলেতে বাস
শেষের অক্ষর বাদ দিলে ঘটে সর্বনাশ।

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যের অক্ষর বাদ দিলে ঘুরে হাওয়ায়
প্রথম অক্ষর বাদ দিলে জীব শ্রেষ্ঠ হয়। (বানর)

অতি ছোট জীবটা লাল গুরা খায়
বড় বড় গাছের সাথে যুদ্ধ করতে যায়। (উইপোকা)

বাঘের মত লাফ দেয়
কুত্তার মত বসে
পাথরের মত তল হয়
শোলার মত ভাসে। (ব্যাঙ)

হরু(সরিষা) থাইক্যা সরু
বিনা শিংগে গরু
বিনা লাঙ্গলে চাষ
মুর্খ বুঝিবে কি পন্ডিতেরই ত্রাস। (কেঁইপোকা)

উড়িতে ঝন্‌ঝন্ পড়িতে রাও
সুন্দরী কন্যার রাঙা পাও। (কবুতর)
আমার বাংলা
তুমি কেন ভাঙলা ?
তোমারে কামুর দিলাম , কেন তুমি কানলা ? (মৌমাছি ও মৌচাক)

কালো বনের তলে,কালো হরিণ চলে,
দুই জনে ধরে, পটাস কইর‍্যা মারে। (উকুন)

কোন কোন 'ধাঁধা'র শেষাংশে উত্তরদাতাকে দু-একটি কথায় সামান্য একটু আক্রমণ করার ভাব প্রকাশ পায় –

একটা ঘরে সাতটা বাটী
যে না বলতে পরে তার কান কাডি। [চালতা]

গাঙ্গের পাড়ে মন গাছ ঘন ঘন কাঁটা,
এই শিলুক যে না ভাঙ্গাইতে পারে
সে উত্তরের পাঁঠা। [কাঁঠাল]

আবার কোন কোন ধাঁধায় উত্তরদাতাকে আক্রমণ করার পরিবর্তে দুর্লভ পারিতোষিক দানেরও আশ্বাস দেওয়া হয়–

Dhaka University Institutional Repository

"ভাঙ্গায় ফালাও দেখি , মারলা কেরে ঝিম ।
মাছের নাই মাথা , গাছের নাই পাতা , পক্ষীর নাই ডিম।
এই শ্লোক যে ভঙ্গাইতে পারে হাজার টাকা দিম। (কাক্‌ড়া , সিজ , বাদুড়)

অজস্র ধাঁধা কিশোরগঞ্জ জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। তবে এই ধাঁধাগুলো যে কেবল এই জেলার ভৌগোলিক সীমার মধ্যেই আবদ্ধ তা নয় । একই ধাঁ ধা অন্যান্য জেলায় একটু ভিন্ন আঙ্গিকে,ভাষা বৈচিত্র্যের মাধ্যমে দেখতে পাওয়া যায়। উল্লিখিত ধাঁধাগুলো দেখে বোঝতে পারা যায় এখানকার গার্হস্থ্য কিংবা সমাজ জীবনের বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে ধাঁধাগুলো রচিত হয়েছে । তবে বর্তমানে এদের কোন ব্যবহারিক বা আনুষ্ঠানিক মূল্য নেই। কিন্তু একসময় এইসব ধাঁধার ব্যবহারিক ও আনুষ্ঠানিক উভয় মূল্যই ছিল অত্যধিক। বিশেষ করে বিয়ে কিংবা বিয়েসংক্রান্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ধাঁধার একটি বিরাট ভূমিকা ছিল। পল্লীসমাজের মানুষের আনন্দ-বিনোদন ও রস আস্বাদনের একটি প্রধান অবলম্বন ছিল ধাঁধা। এখন এই ধাঁধা বিলুপ্তপ্রায়। কেবলমাত্র শিশুর কৌতুক উপভোগ করার জন্য পল্লীর সমাজে কোন মতে ধাঁধা বেঁচে আছে।

৩.৫ প্রবাদ-প্রবচন

লোকসাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য শাখা হল প্রবাদ-প্রবচন।একটি জাতির দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই প্রবাদসমূহের জন্ম। ডক্টর ওয়াকিল আহমদের মতে,"প্রবাদ মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত এবং মূলত বুদ্ধিপ্রধান রচনা।আবেগ নয়,মস্তিস্ক থেকে প্রবাদের জন্ম হয়।"{৩৯} । প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে বর্তমানে আধুনিক যুগ পর্যন্ত প্রবাদসমূহের আবেদন বিদ্যমান রয়েছে।এ প্রসঙ্গে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য "ইহা একদিক দিয়া যেমন প্রাচীন,আবার তেমনিই অন্য দিক দিয়া আধুনিক।ইহা পূর্ব হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে বলিয়া প্রাচীন,আবার প্রচলিত মনোভাব প্রকাশ করিতেও সহায়তা করিতেছে বলিয়া আধুনিক।"[৪০]

প্রবাদকে কখনো ভৌগোলিক সীমাদ্বারা আবদ্ধ করা যায় না।লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় প্রবাদ একস্থান থেকে অন্যস্থানে সহজেই প্রচার লাভ করতে পারে, এর কারণ প্রবাদ আকারে সংক্ষিপ্ততম এবং এর মধ্য দিয়া দেশ-কাল নিরপেক্ষ শাশ্বত মানব জীবনের নিতান্তই বাস্তব তত্ত্ব ব্যক্ত হয়ে থাকে।তাই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রবাদের মধ্যে ঐক্য দেখতে পাওয়া যায়।

প্রবাদসমূহকে যদিও ভৌগোলিক সীমারেখা দ্বারা আবদ্ধ করা যায় না,তথাপি কিশোরগঞ্জে প্রাপ্ত প্রবাদসমূহকে কিছুটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলে মনে হয়। এখানকার প্রবাদসমূহে এই এলাকার মাটি ও মানুষের মধ্যে নিবিড় সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায়।এতে এখানকার নদী-নালা-খাল-বিল,গাছ-পালা,ফুল-ফল,পশু-পাখি সম্বলিত প্রকৃতি পরিবেশের চিত্র যেমন আছে, তেমনি সমাজে নানা স্তরের মানুষ, মানুষের জীবনযাত্রা,সংস্কার-বিশ্বাস,সংস্কৃতি সম্বলিত জাতিতত্ত্বেরও পরিচয় আছে।

জনগণের সংস্কৃতির মূলে ফল্গুধারার ন্যায় অবিরাম রস-সিঞ্চনে সক্রিয় থাকে বলে প্রবাদের সামাজিক প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।বিশেষ করে এই অঞ্চলের গ্রাম্য জীবন-যাপনে অভ্যস্ত অশিক্ষিত জনগণ তাদের জীবন-যাপনের প্রতিটি কার্যে,দৈনন্দিন অবসর বিনোদনে,নীতি-চর্চায়,আচারে-বিচারে,স্বাস্থ্য-বিধানে,কৃষি-বাণিজ্য প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপারে কি নিভৃত কক্ষে , কি জন সমক্ষে, কি হাটে-ঘাটে-মাঠে সর্বত্র প্রবাদের অপরিসীম প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যেক বিষয় অনুসারে দুই-একটি করে উদাহরণ দিলে উক্ত দাবীর সত্যতা প্রমাণ করা যেতে পারে। প্রবাদ সাধারণত নারীসমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। নারীই প্রধানত এর রচয়িত্রী।নারীর পারিবারিক ও গার্হস্থ জীবনের নানা খুঁটিনাটি বিষয় প্রবাদগুলিতে প্রস্ফুটিত হয়েছে। নারী চরিত্রের যাবতীয় গুণাবলী,দোষ-ত্রুটি প্রবাদসমূহে যে দেখতে পাওয়া যায় নিম্নের উদাহরণগুলি এর প্রমাণ-

১. নারীর গুনে ভাত
নারীর গুনে হা-ভাত।

২. যে নারীর চুপা {ঝগড়া}আছে
সে নারীর খুপাও আছে।

৩. বাড়ীর শোভা বাগ-বাগিচা, ঘরের শোভা বেড়া
কুলের শোভা বউ , শাশুড়ীর বুক জুড়া।

৪.রাম্ধিয়া বাড়িয়া যেইবা নারী
পতির আগে খায়
সেই নারীর বাড়ীতে শীঘ্গীর
অলক্ষ্মী হামায়{প্রবেশ করে}।

৫.নিম তিতা,নিশিন্দা তিতা
তিতা মাকাল ফল
তা'র চাইতে অধিক তিতা
বোন সতীনের ঘর।

পুত্রবধূর সংসারে অনেক বৃদ্ধ মাতারই অতি কষ্ঠে জীবনযাপন করতে হয়।

৬.পুতের বিয়া আপনি দিলাম
বউ ঘরে এল
সপেঁ দিলাম গেরস্থালী
গিন্নীপনা গেল।

আবার যে বধুর শাশুড়ি-ননদ নাই, তার আনন্দ আর ধরে না-

৭.শাশুড়ি নাই ননদ নাই ,
কা'রবা করি ডর?
আগে খাই পান্তাভাত ,
শেষে লেপি ঘর।

যে পরিবারে বয়স্ক তিনটি মেয়ে থাকে সেখানে প্রায়ই বিচার-আচার করতে হয়-

Dhaka University Institutional Repository

৮.তিন মাইয়া যেখানে,
কাজীর দরবার সেখানে।

সমাজে বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিল,প্রবাদগুলিতে তার স্বরূপ দেখতে পাওয়া যায়-

৯. খেলার সময় বিয়া হইছে,বিয়ার সময় রাড়ি হইছে।

শুধু নারী নয়,পুরুষসম্পর্কিত প্রবাদও দেখতে পাওয়া যায়-

১০.পুরুষের দশ দশা,
ক্ষণে হাতি,ক্ষণে মশা।

নারী-পুরুষের প্রেমসংক্রান্ত প্রবাদও রয়েছে।যেমন-

১১. ভাবেতে মজিলে মন, কিবা হাড়ি, কিবা ডোম।
১২. যদি থাকে বন্ধুর মন , গাং পার হইতে কতক্ষণ।

সংসার জীবনের নানা অভিজ্ঞতার আলোকে প্রবাদ রচিত হয়ে থাকে।যেমন-

১৩. আপন বুঝে রাজা,
পরের বুঝে ভোজা।

১৪. যার হয় না নয়ে,তার হয় না নব্বইয়ে।

১৫.ঠেকছিলাম যেখানে,শিখছিলাম সেইখানে।

১৬.বেশী খাইলে মুখ পুইড়্যা যায়।

১৭. চুন খাইয়া দই দেইখ্যা ডরায়।

১৮. পাপে বাপেরও ছাড়ে না ।

১৯. বসে খাইলে রাজার ভান্ডারও ফুরায়ে যায়।

পরনির্ভরতার পরিণাম সম্পর্কে বলা হয়-

২০. পরের সল্লা যে লয়,

Dhaka University Institutional Repository

লোডা বেইচ্যা বাউশ{লাউ এর খোসা}নয়।

দারিদ্র্যের দুর্ভোগ সর্ম্পকে বলা হয়েছে-

২১. যার ভাত নাই, তার জাত নাই।

সংসারে অনেক লোক আছে যারা নিষ্কর্মা, তাদের সর্ম্পকে বলা হয়েছে-

২২. কাজে এড়া,ভোজনে দেড়া।

চোর সমাজের অনিষ্টকারী ব্যক্তি,তার সম্বন্ধে সজাগ থাকার জন্য বলা হয়েছে-

২৩. লতা চুরি পাতা চুরি, শেষে রাজার আস্তি চুরি।

উপকারীর উপকার স্বীকার করা হয়েছে প্রবাদে-

২৪. যার নুন খাই, তার গুণ গাই।

উপকারীর উপকার অস্বীকারও করা হয়েছে কোন প্রবাদে-

২৫. যার পরে তার খাই, তারই ভিটায় ঘুঘু চরাই।

অতি সামান্য বস্তুকে তিরস্কার বা পরিহাস করে বলা হয়-

২৬. আস্তি ঘোড়া গেল তল, ব্যাঙ বলে কত জল।

সংসারে স্বার্থপর লোকদের সর্ম্পকে বলা হয়েছে-

২৭. ছালুনও{তরকারী}খাইতে চায়, ছালুনের পাতিলও নিতো চায়।

ভণ্ড,বিড়াল-তপস্বী লোকদের বলা হয়-

২৮. মিড়মিড়া ঘোড়া, কেলাই খাওনের যম।

কোন কোন প্রবাদ আবার উপদেশমূলক। মানুষকে নানা রকম বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করার জন্য এই সমস্ত প্রবাদ রচিত হয়েছে। যেমন-

২৯. নিন্দিলে পিন্দতে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৩০. লাইগ্যা থাকলে মাইগ্যা খায়না।

৩১. বইয়া বইয়া যদি খায়,রাজার ভান্ডার ফুরায়ে যায়।

৩২. ঠগাইলে ঠগে,লুটলে মাগে।

৩৩. যার মনে বালি,তার কপালে ছালি।

সমাজে যেসব লোক ধূর্ত বলে পরিচিত,প্রবাদে তাদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সর্তক করা হয়েছে এভাবে-

৩৪. ধোপা ,নাপিত,কুমার,কামার
যে বিশ্বাস করে সেও চামার।

মৎসজীবী আর মহিষ সম্বন্ধে সাবধান হতে বলা হয়েছে-

৩৫. দেখলে গাবর আর ভৈষ,
দূরে থাক্‌তে লাঠি লইস্‌।

কিঞ্চিৎ পাপ কার্যেও অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যায়-

৩৬. এক আঙ্গুল পাপে,দশ আঙ্গুল পুড়ে।

অন্যের বিপদ-আপদে অনেকে কপট শোক প্রকাশ করে থাকে। যেমন-

৩৭. যেখানে নাই আসল মায়া,
সেখানেই বেশী আহা।

৩৮. আড়া কান্দে,পাড়া কান্দে,
চালের বাতা ধরে।
ভাইয়ের বউ অভাগী কান্দে
চোখে মরিচ ভরে।

গোপন শত্রুতা ও ভণ্ডামির চমৎকার প্রকাশ ঘটেছে কোন কোন প্রবাদে।

৩৯. জর কাটে তলে তলে, উপরে তবু পানি ঢালে।

৪০. পরের মাথায় বাড়ি দিয়ে, আপনি পড়ে চিৎ হয়ে।

Dhaka University Institutional Repository

নীচ শ্রেণীর ব্যক্তির আচরণ প্রকাশ করতে বলা হয় –

৪১. পোদ্দারের পো যদি পন্ডিত হয়
বাপকে বাড়ীর চাকর কয়।

প্রবঞ্চক ব্যক্তিকে কেউ ঠকাতে পারে না . তাই বলা হয় –

৪২. কাক সকলের মাংস খায়
কাকের মাংস কেউ খায়না ।

বেহিসেবী লোক সম্পর্কে বলা হয়–

৪৩. থাকলে তানুইর বাপের শ্রাদ্ধও হয়
না থাকলে নিজের বাপের শ্রাদ্ধও হয় না।

এই অঞ্চলে বেশীরভাগ মানুষ কৃষিজীবী। তাই এখানে কৃষিভিত্তিক অনেক প্রবাদের জন্ম হয়েছে–

৪৪. সোম শুক্র পরে শাড়ী
ধান হয় আ ড়াআড়ি।

৪৫. জল ভালা ভাসা
মানুষ ভালা চাষা।

৪৬. বৈশাখে বুনা , আষাঢ়ে রোয়া
জায়গা হয়না ধান থুয়া।

জমির ভাগিদার কৃষক অনেক সময় জমির মালিকের কাছ থেকে নিকৃষ্ট অংশ পায় –

৪৭. আইধ্যার আধা তাও ধুরা ।

সমাজে কাজ করার চেয়ে কাজে ফাঁকি দেওয়ার লোকই বেশী –

৪৮. কাজের নামে নাই কাজী , অকাজে সবাই রাজী।

৪৯. ধনু ধরার ইচ্ছে নাই ফালদা উঁডি গাছে।

সমাজে অনেক লোক আছে যারা কারো ধার ধারে না

Dhaka University Institutional Repository

৫০. ডাইল দিয়া খাই , সড়ক দিয় হাটি।

বিপদে পড়লে শক্তিশালীকে দুর্বলেরা আক্রমণ করতে পারে-

৫১.হাতি গর্তে পড়লে চামচিকও ভেদায়।
৫২.দেশে আইল কলিকাল,ছাগলে চাটে বাঘের গাল।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৬ লোককাহিনী

গল্প বলা এবং গল্প শোনার আগ্রহ পৃথিবীর সকল মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। নানারকম লৌকিক-অলৌকিক ঘটনাবলির উপর ভিত্তি করে লোককাহিনীসমূহ রচিত হয়ে থাকে। কেবলমাত্র মৌখিক বা জনশ্রুতিমূলক ধারা অনুসরণে এ কাহিনীগুলি অগ্রসর হয় এবং জনসমাজে টিকে থাকে। কিশোরগঞ্জ জেলায় নানা রকম লোককাহিনী প্রচলিত আছে। লোককাহিনী নির্ভর কিস্‌সা-কাহিনী এক সময় এ অঞ্চলে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। কিশোরগঞ্জের ভাটি অঞ্চলের জনসাধারণ সারা বৎসরের কেবল একটি বিশেষ সময়ে ধান কাটার কাজে কর্ম ব্যস্ত দিন যাপন করে। নূতন ধান ঘরে উঠানো হয়ে গেলে সুখী-সমৃদ্ধ কৃষক অলস অবসর যাপনের জন্য নানা রকম চিত্ত বিনোদনের সন্ধান করে। এ সময় গ্রামে গ্রামে লোককাহিনী নির্ভর কিস্‌সা ও পালাগানের আয়োজন করা হয়। কিস্‌সা বা লোককাহিনী ছিল কিশোরগঞ্জের বহুল প্রচলিত ও সমাদৃত একটি লোকজ অনুষ্ঠান।এখানকার লোককাহিনীগুলি বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। অলৌকিকতায়,রূপকথায়,ঐতিহাসিকতায় এই এলাকার লোক কাহিনীগুলি পরিপূর্ণ। কিশোরগঞ্জে প্রাপ্ত কাহিনীগুলিকে কয়েকটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করা চলে। যেমন রূপকথার গল্প -এর মধ্যে আছে নানা রকম রোমাঞ্চকর কাহিনী , বিভিন্ন রাজা বাদশার কাহিনী।সহজ-সরল মানুষের বোকামির গল্প - এর মধ্যে আছে জোলার গল্প, বোকা জামাই এর গল্প ইত্যাদি। আরো আছে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলির আলোকে গড়ে ওঠা নানা রকম কাহিনী। এই গল্পগুলি কে , কবে কোন ঘটনার প্রেক্ষাপটে রচনা করেছিল তা জানা যায় নি। তবে লোক পরম্পরায় এই সমস্ত গল্প আজও সমাজে লোকমুখে প্রচলিত থাকতে দেখা যায়।

৩.৬.১ রূপকথার গল্প

রূপকথার গল্পের মধ্যে পাঁচ তোলা কন্যা গল্পটির কথা উল্লেখ করা যায়।গল্পটির কাহিনী সংক্ষেপে এই রূপ এক রাজার সাত ছেলের মধ্যে ছোট ছেলেটি খুব মেধাবী।ওস্তাদের কাছে তাকে পড়তে দিলে সে খুব দ্রুত পড়া শেষ করে ফেলে। এদিকে ছোট ছেলে ওস্তাদকে বলে , তিনি যেন তার পিতার কাছে গিয়ে বলেন আপনার ছোট ছেলেটির লেখাপড়া হবে না, কেননা সে এখন পর্যন্ত একটি অক্ষরও শিখতে পারে নি।ওস্তাদ কিছুটা অবাক হলেও ছেলের অনুরোধে বাদশাকে গিয়ে এই কথাই বলেন। তখন বাদশা ওস্তাদ কে বলেন ছেলেকে লেখাপড়া বাদ দিয়ে তীরন্দাজের কৌশল শিখতে। বাদশার কথামত ওস্তাদ তাই করেন। কিন্তু ছেলে কয়েক দিনের মধ্যেই তীর নিক্ষেপে ওস্তাদ হয়ে উঠল। তীরশিক্ষক দেখল বাদশাজাদাকে তার শেখানোর আর কিছুই নেই। কিন্তু বাদশাজাদা আবার ওস্তাদকে বলে পাঠায়, তিনি যেন বাদশাকে গিয়ে বলেন, কুমারের দ্বারা তীরন্দাজী কখনই হবে না। কেননা আজ পর্যন্ত তীর ধনুকে গুণযোজনাটি পর্যন্ত আসল না। বাদশা এই কথা শুনে ছেলেকে এক জাদুকরের কাছে জাদুবিদ্যা শিখতে দিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই জাদুবিদ্যায় সে এত পারদর্শী হয়ে উঠলো যে, ওস্তাদকে হার মানিয়ে ফেলল। কিন্তু বাদশার কাছে বলা হলো যে সে জাদুবিদ্যাও শিখতে পারবে না। অবশেষে বাদশা রাগ করে তাকে চুরিবিদ্যা শিখতে বললেন। চুরিবিদ্যায়ও বাদশাজাদা বেশ সাফল্য লাভ করল এবং বাদশার কাছে খবর পাঠানো হলো যে , বাদশাজাদা চুরিবিদ্যায় বেশ পারদর্শিতা লাভ করেছে।এই কথা শুনে বাদশা অত্যন্ত দু:খিত হয়ে ছেলেকে বাড়ীর ভিতর বসে থাকার নির্দেশ দিলেন।

এই বাদশার এক শত্রু ছিল অন্য এক বাদশা।একদিন সেই বাদশা চিঠি পাঠালেন যে ,তার 'মহল-পুস্করিণী' এই বাদশার 'মহল-পুস্করণী'কে দাওয়াত করেছে। তিনি যেন এই দাওয়াত কবুল করেন। বাদশা এই চিঠি পেয়ে তার সকল ছেলেকে ডাকলেন এর উপযুক্ত জবাব দেওয়ার জন্য। কিন্তু কেউ এর

Dhaka University Institutional Repository

উপযুক্ত জবাব খুঁজে বের করতে পারলনা। অবশেষে বাদশা তার নিষ্কর্মা ছোট ছেলেকে এর জবাব লিখে দিতে বললেন।ছোট ছেলে দাওয়াতকারী বাদশাকে লিখে দিলেন- 'আমাদের মহল পুষ্করিণী কিছুদিন যাবত খুব অসুস্থ। চলাফেরা করতে পারেনা। এমতাবস্থায় আপনার পুষ্করিণী যদি মেহেরবানী করে দাওয়াত কবুল করে তো সব দিক দিয়ে ভাল হয়।"

ছেলের উত্তর শুনে বাদশা খুব চমৎকৃত হলেন এবং শত্রু-বাদশার নিকট এই উত্তর লিখে পাঠালেন। শত্রু-বাদশাও বুঝতে পারলেন দারুণ কোন চালাক লোক ঐ বাদশার দরগায় আছে। শত্রু-বাদশা ভাবলেন বুদ্ধির খেলায় এদের সাথে পেরে ওঠা যাবেনা। তাই এবার তিনি লিখে পাঠালেন, তার দেশে চোর, ডাকাত, ঠগ, ইত্যাদি চালান দেওয়া হবে।তাই এই বাদশা যেন এখন নিজেকে রক্ষা করেন।

এই চিঠি পেয়েও বাদশা সবাইকে ডাকলেন কিন্তু কেউ কোন জবাব খুঁজে পেল না।অত:পর ছোট ছেলে বলল এই ধমকই যেন বাদশা শত্রু-বাদশাকে ফিরিয়ে দেয় এবং সেই সাথে এই কথাও যেন বলে দেয়, শত্রু বাদশা তার মেয়ে পাঁচতোলাকে যেন রক্ষা করেন।

চিঠি পাঠিয়েই বাদশার ছোট ছেলে এক পরহেজগার সওদাগর সেজে শত্রু-বাদশার দেশে এসে হাজির হন। তার সঙ্গে বড় বড় সব কাপড়ের সিন্দুক। সিন্দুকের নিচের দিকে শুকনা কচুরিপানা দিয়ে উপরে শুধু এক প্রস্থ কাপড় বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। শত্রু বাদশা সওদাগরকে পেয়ে সম্মানের সহিত নিজ বাড়িতে স্থান দিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে সওদাগর বাদশার কাছে দশ হাজার টাকা ধার চেয়ে বলল 'মাত্র দু দিনের জন্য স্থানান্তরে যাচ্ছি, আমার সিন্দুক সব আপনার হেফাজতে রেখে গেলাম।'

বাদশা ভাবলেন সওদাগর লাখ টাকার জিনিস রেখে মাত্র দশ হাজার টাকা চেয়েছে, তাই বাদশা সওদাগরকে টাকা দিয়ে দিলেন। সওদাগরবেশী বাদশার ছেলে যাবার সময় একটি চিঠি লিখে গেল , তাতে লেখা ছিল"এই এক নম্বর আঘাত দিয়া গেলাম। আশা করি দ্বিতীয় আঘাতের জন্য প্রস্তুত থাকবেন।" চিঠি পেয়ে শত্রু-বাদশা তাড়াতাড়ি সিন্দুক খুলে দেখলেন ,তাতে দু'একটি কাপড় বাদে সব শুকনো কচুরিপানা। শত্রু-বাদশার আর বুঝতে বাকি রইলোনা যে, তার দশ হাজার টাকা ডাকাতি হয়েছে।

বাদশার ছোট ছেলে বাড়ি এসে জাদুবিদ্যার সাহায্যে জানতে পারল যে, শত্রু-বাদশার এক বোন কিছুদিন আগে জাহাজডুবি হয়ে মারা গেছে। কিন্তু এই মৃত্যুর কথা তারা বিশ্বাস করত না, তারা মনে করতো বাদশার বোন এখনো বেঁচে আছে এবং যে কোন দিন এসে উপস্থিত হবে । বাদশার ছোট ছেলে সেই বোনের রূপ ধরে কালো লম্বা পরচুলা পরে আবার কিছুদিন পরে শত্রু-বাদশার দেশে এসে উপস্থিত হল। বাদশা অনেক দিন পর তার হারিয়ে যাওয়া বোনকে পেয়ে খুবই খুশি হলেন। রাজবাড়ীতে আনন্দের উৎসব শুরু হয়ে গেল। রাজপুরীর মেয়েরা এসে দেখতে পেল,বাদশার বোনের চুল খুব লম্বা। তারা জানতে চাইল এত লম্বা চুল কি করে হল। চুল লম্বা করার উপায় বর্ণনা করতে গিয়ে , বোনরূপী বাদশার ছেলে রাজপুরীর সকল মেয়েকে মাথা মুণ্ডন করে চুন মাখিয়ে কাপড় দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রাখতে বলল। রাজপুরীর মেয়েরা তাই করল। সাত দিন যেতে না যেতেই সকলের মাথাই পেঁকে ব্যথা শুরু হল। সেই রাতেই বাদশার ছেলে গা ঢাকা দিল। যাবার সময় চিঠি লিখে গেল ,এটা তার দ্বিতীয় আঘাত ,এখন তৃতীয় আঘাতের জন্য যেন প্রস্তুত থাকে।

বাড়ী এসে বাদশার ছোট ছেলে আবারও জাদু বিদ্যার সাহায্যে জানতে পারল যে, শত্রু-বাদশার এক ছেলে বিদেশে পড়াশোনা করছে।এই বার সে তার রূপ ধারণ করে শত্রু-বাদশার বাড়ীতে এসে হাজির হল।এখানে এসে সে বাদশাকে বলল"চোরের বেশী উপদ্রব দেখছি, তাই বোন পাঁচতোলাকে নিয়ে আমি চিন্তিত।

Dhaka University Institutional Repository

তাকে এখন নানার বাড়ীতে রেখে আসি। চোরের উপদ্রব কমলে আবার নিয়ে আসব। শত্রু-বাদশা ছেলের এই পরামর্শে রাজি হলেন। বাদশার ছেলে কন্যাকে 'হাওয়া রাজ' ঘোড়ায় চড়িয়ে যাত্রা শুরু করল এবং বলল-

হাতীর উপর হাওদা
ঘোড়ার উপর জিন
পাঁচতোলা কন্যা চুরি যায়
শনি বারের দিন।।

এই কথা শোনার পর পাঁচতোলা কন্যা এবং রাজবাড়ীর সবাই বুঝতে পারল এই তো সেই চোর। কিন্তু ততক্ষণে পাঁচতোলা কন্যাকে নিয়ে ঘোড়া পবনবেগে আকাশ পথে ধাবমান হয়েছে।পরে বাদশার ছোট ছেলের সহিত ধুমধামের সঙ্গে পাঁচতোলা কন্যার বিয়ে হয়। ক্রমে উভয় রাজ্যের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপিত হল এবং ছোট বাদশাই সিংহাসন পেয়ে ক্রমে রাজ্যের সীমা বিস্তৃত করতে লাগল।

৩.৬.২ হাস্যরসাত্মক গল্প

বিলাল ও দেওয়ান সাহেব

১

বিলাল ছিল দেওয়ান সাহেবের প্রিয় খানসামা। রোজ রাতে তিনি বিলালকে নিয়ে বাংলায় বসে আফিং খেতেন ও গল্প করতেন। একদিন গল্প করতে করতে অনেক রাত হয়ে যাওয়ায় দেওয়ান সাহেবের আর অন্দর মহলে যাওয়া হল না। এদিকে দেওয়ান সাহেবের ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছে। বিলাল তা বুঝতে পেরে বলল খিচুড়ি পাকানো যেতে পারে, কিন্তু আগুন ধরাবে কে? দেওয়ান সাহেব বিলালের মনের কথা বুঝতে পেরে বললেন চিন্তার কোন কারণ নেই, তিনি নিজেই আগুন ধরাবেন।

এই কথা শুনে বিলাল চাল,ডাল ও ঘি আনার জন্য মুদির দোকানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। দোকানের সামনে এসে দেখে দোকানের দরজা বন্ধ। তাই বিলাল বেড়ার ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে মুদিকে চাল-ডাল দিতে বলল। কিন্তু মুদি যে তখন অঘোরে ঘুমাচ্ছিল বিলালের তা জানা ছিল না। সে মুদির চাল-ডালের অপেক্ষায় হাত পেতে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে। ভোরে মুদি বিলালকে এই অবস্থায় দেখে অবাক হল। ঘুম থেকে উঠে বিলাল ব্যস্ত হয়ে মুদিকে চাল,ডাল,ও ঘি দিতে বলল এবং জানাল দেওয়ান সাহেব তার জন্য চুলায় আগুন জ্বালিয়ে বসে আছেন।

বিলাল যখন খিচুড়ির সরঞ্জাম নিয়ে ফিরল তখন দেওয়ান সাহেব লাকড়ি ও দিয়াশলাই সামনে নিয়ে হেলান দিয়ে ঘুমাচ্ছিলেন । বিলালের ডাকে জেগে উঠে তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বিলালকে প্রশ্ন করলেন 'কিরে বিলাল তুই কি জিন-টিন নাকি? গেলি আর আইলি? আমি এর মধ্যে আগুনটাও ধরাইতে পারলাম না।'

২

একবার দেওয়ান সাহেব বিলালকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন। ফেরার সময় তিনি বিলালকে জিজ্ঞাসা করলেন , ভুলে কিছু ফেলে এসেছেন কি না। বিলাল স্মরণ করে দেখল যে কিছুই ফেলে আসা হয় নি। তবু দেওয়ান সাহেবের কেবলই মনে হচ্ছিল কি জানি তিনি ফেলে এসেছেন । দেওয়ান সাহেব নিজের পকেটে আফিমের কৌটাটা আছে কি না দেখে নিলেন। বিলালের আফিমের কৌটাও ঠিক মত আছে কিনা জেনে নিলেন। তখন তারা নিশ্চিন্তে পথ চলতে লাগল। বাড়ির কাছাকাছি এসে এক ব্যক্তি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল 'দেওয়ান

Dhaka University Institutional Repository

সাহেব আজ হেঁটে বাড়ি ফিরছেন কেন ? হাতি কোথায়?' হঠাৎ দেওয়ান সাহেবের ভুল ভাঙল। তিনি বিলালকে বললেন 'দেখলে তো? আমার স্মরণশক্তি কত প্রখর? হাতিটি ফেলে এসেছিস আমার সন্দেহেও তা তোর মনে আসলোনা?'

৩.৬.৩ *বোকামির গল্প*

কিশোরগঞ্জ জেলার কিচ্ছাকাহিনীর মধ্যে জোলার কিস্‌সা বেশ জনপ্রিয়। জোলা কোন চরিত্রের নাম নয়।যাদের জ্ঞানবুদ্ধি একেবারেই কম, তারাই এখানে 'জোলা' নামে পরিচিত। তাদের ঘটনাবলীকে সত্য মিথ্যা দিয়ে নানা রকম কল্প-কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হল।

১

এক জোলার প্রতিবেশীর মা মারা গিয়েছে। প্রতিবেশী তার মায়ের গলায় দড়ি দিয়ে জোলার উঠান দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে শ্মশানঘাটের দিকে। এই দৃশ্য দেখে জোলার ভীষণ রাগ হল। সে ভাবল প্রতিবেশী তাকে খুবই অপমান করেছে। নিজের মায়ের লাশ পরের উঠান দিয়ে নিয়ে খুবই অন্যায় করেছে।

ঘরে এসে জোলা চিন্তা করতে লাগল এবং ভাবল এর প্রতিশোধ নিতেই হবে। জোলার মাও বৃদ্ধ ছিল। জোলা ভাবল 'প্রতিবেশী তার মায়ের গলায় দড়ি লাগিয়ে আমার উঠান দিয়ে টেনে নিয়ে গেছে, আমারও তো মা আছে, আমিও তাই করি না কেন?' এই চিন্তা জোলার মাথায় আসতেই সে তার মায়ের গলায় দড়ি লাগিয়ে প্রতিবেশীর উঠানের মাঝ দিয়ে টেনে নিয়ে চলল এবং মনে মনে ভাবল প্রতিবেশীর ব্যবহারের উপযুক্ত প্রতিশোধই সে নিয়েছে।

২

এক দেশে ছিল এক জোলা । মৃত্যুর সময় বাপ জোলাকে ডেকে বলল ''বাপরে আমার মরণের পর সবাইকে দাওয়াত করে একটা বড় ধরনের একটা হাঙ্গামা করিস।''

বাবার কথা মত ছেলে বাবার মৃত্যুর পর গ্রামের ছেলে-বুড়া সকলকে দাওয়াত করল। কিন্তু সে বাবার শেষ ইচ্ছাটি পূর্ণ করতে পারছেনা। কারণ সে বাজারে গিয়ে প্রতি দোকানে দোকানে হাঙ্গামার খোঁজ করল।কিন্তু কোন দোকানিই তাকে হাঙ্গামা সওদাটি দিতে পারলনা।

শেষ পর্যন্ত এক ধূর্ত লোকের সঙ্গে দেখা হল। সে বলল তার বাড়ীতে একটি 'হাঙ্গামা'আছে এবং এর মূল্য বাবদ তাকে দশ টাকা দিতে হবে। জোলা খুশি হয়ে তার কথায় রাজি হয়ে গেল।

সেই লোকের বাড়িতে এক মটকার ভিতরে ভীমরুলের বাসা ছিল। সে মটকার মুখ কাপড় দিয়ে বেঁধে জোলাকে দিয়ে বলল' ফাতেহার দিন সকল মেহমান যে ঘরে বসবে , সেই ঘরে এই হাঙ্গামাটি রাখতে হবে। খাওয়া-দাওয়া শেষে সেই ঘরের সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করে লাঠি দিয়ে মটকায় বাড়ি দিতে হবে, মটকা ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই 'হাঙ্গামা' শুরু হবে।'

Dhaka University Institutional Repository

ফাতেহার দিন খাওয়া দাওয়া শেষে জোলা পূর্ব পরিকল্পনা মত ঘরের সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করে মটকায় সজোরে আঘাত করে।এরপর সঙ্গে সঙ্গেই একটি বড় ধরনের 'হাঙ্গামা' শুরু হয়ে গেল। অনেক দিন পর্যন্ত এই এলাকার লোকজন বলাবলি করল যে , এত বড় হাঙ্গামা তারা কোন দিন দেখে নাই।

৩.৭ কিংবদন্তি

ঐতিহাসিক ঘটনাসমৃদ্ধ জনপদ কিশোরগঞ্জ।এখানকার বিভিন্ন ঘটনা,স্থান ও ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে নানারকম কিংবদন্তির সৃষ্টি হয়েছে।ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে সব কিংবদন্তির সৃষ্টি হয়েছে,এর মধ্যে সত্যের কিছুটা ছিটে-ফোঁটা থাকলেও অন্যান্য কিংবদন্তি যেমন-বিভিন্ন পীর-দরবেশের কাহিনী,প্রেম-বিরহমূলক কাহিনী,ভূত-প্রেত বা পরীর কাহিনী নিয়ে যেসব কিংবদন্তির সৃষ্টি হয়েছে সেগুলির মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা খুবই কম।তবু গ্রামের লোকেরা যুগ যুগ ধরে এসব কাহিনী মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে এবং পুরুষানুক্রমে বর্ণনা করে। কিশোরগঞ্জের এমন কিছু কিংবদন্তি নিম্নে তুলে ধরা হল।

৩.৭.১ এগারসিন্ধুর কাহিনী

এগারসিন্ধুর,কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া থানার একটি ইউনিয়ন।এগারসিন্ধুর সম্পর্কে শ্রীচৈতন্য দেবের সমসাময়িক ষোড়শ শতকের কবি শ্রীনিত্যানন্দ দাসের'প্রেমবিলাস'গ্রন্থের কয়েকটি ছত্র এখানে উল্লেখের দাবী রাখে।

এগারসিন্ধুর আর মিরজাফরপুর।
দগদগা কুটীশ্বর আর হোসেনপুর।
ব্রহ্মপুত্র তীরেতে এসব স্থান হয়।
নানাদেশী লোক তাথে বাণিজ্য করয়॥
এগারসিন্দুর আর দগদগা স্থানে।
বাণিজ্যে বিখ্যাত ইহা সর্বলোকে জানে।
নানাদেশী বণিক আসয়ে এথায়।
বেচাকেনা করে মনে আনন্দ হিয়ায়॥

এগারসিন্দুর সেই অতীত ইতিহাস বিলীন হয়ে গেলেও এখানে সংঘটিত ঈশা খাঁ ও মানসিংহের সেই ঐতিহাসিক যুদ্ধের কাহিনীটি আজও লোক মুখে শোনা যায়। এগারসিন্দুর যুদ্ধে ব্যবহৃত দুর্গটি ছিল বিশাল আকারের এবং এটি ঈশা খাঁর শক্ত ঘাটি ছিল। দুর্গের পশ্চিম দিকে ছিল শক্ত পরিখা এবং উত্তর ও পূর্বদিকে শঙ্খ নদীর বাঁক দ্বারা সৃষ্ট স্বাভাবিক পরিখা। দক্ষিণে ছিল বিশাল ব্রহ্মপুত্র নদ। এখানে যে ঐতিহাসিক যুদ্ধটি হয়েছিল তা আজও লোকমুখে শোনা যায়। জঙ্গলবাড়ীর ক্ষুদ্র অধিপতি ঈশা খাঁ। তাকে শায়েস্থা করার জন্য মুঘল অধিপতি জাহাঙ্গীর তার অপরাজেয় সেনাপতি মানসিংহকে প্রেরণ করেছিলেন। মানসিংহ প্রচুর সৈন্য সমাবেশ করেছেন এবং যুদ্ধে সৈন্যরা বৃষ্টির মতো কামানের গোলাবর্ষণ করছে।পরাজয়ের আশঙ্কায় দূরদর্শী ঈশা খাঁ মানসিংহের নিকট এক কুটনৈতিক প্রস্তাব পাঠালেন, তা হল-যদি তিনি সত্যিকারের বীর হন তবে ঈশা খাঁর সঙ্গে এগারসিন্দুর ময়দানে যেন সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। কারণ এতে সাধারণ সৈন্যদের জীবন নাশ হবে না, দেশ রক্ষা পাবে, ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ

Dhaka University Institutional Repository

অনেক কমে যাবে।আর যদি মানসিংহ এই প্রস্তব অস্বীকার করেন,তাহলে প্রমাণিত হবে তিনি কাপুরুষ,তার সৈন্য-বাহিনীও তার উপর আস্থা হারিয়ে ফেলবে।

নানাদিক ভেবে মানসিংহ এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন।নদী পার হয়ে মোগল সৈন্য চলে এলো এগার সিন্দুর ময়দানে।কাতার করে বসে পড়লো তারা ময়দানের একদিকে। অন্যদিকে কাতার করে বসলো ঈসাখাঁর মুষ্টিমেয় বাহিনী।

যুদ্ধের ময়দানে দুই দল সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। দ্বিপ্রহরের সূর্যের আলোয় ঝলমল করে উঠলো দুই বীরের হাতের তরবারি। কিন্তু ঈশাখাঁর তরবারির এক আঘাতেই ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়লো মানসিংহের তরবারি। মহানুভবতার পরিচয় দিলেন ঈশা খাঁ,আঘাত করলেন না নিরস্ত্র মানসিংহকে। ঈশাখাঁর এই মহানুভবতার পরিচয়ে মুগ্ধ হলেন মানসিংহ,আবেগে-উচ্ছ্বাসে জড়িয়ে ধরলেন ঈশা খাঁকে। উভয় পক্ষের সৈন্যদল দেখলো এই অপূর্ব মিলন। আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে শেষ হল দীর্ঘ-দিন-প্রসারী সংগ্রাম-রোপিত হল বন্ধুত্বের বীজ। সেদিনের সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্বেই শেষ হলো এগারসিন্দুরের ময়দানে ইতিহাসের এক চমৎকৃত অধ্যায়।

কিংবদন্তি আজও গেয়ে চলে এই অপূর্ব কাহিনীর ইতিবৃত্ত।

৩.৭.২ *কোশাকান্দার কিংবদন্তি*

ব্রহ্মপুত্র নদের শাখা নদীর নাম মলং নদী। মলং নদীর প্রবাহ গতিটি ছিল খুবই খরস্রোতা। মধ্যযুগের শেষ ক্রান্তিকালেও এই নদীটির নাব্যতা ছিল। নদীটি ছিল ষোড়শ শতকের ভাটি বাংলার অধিপতি ঈসা খাঁ মসনদ-ই-আলার দুর্গ নগরী এগারসিন্দুর থেকে রাজধানী নগরী জঙ্গলবাড়ীতে যাতায়াতের গুরুত্বপূর্ণ নদীপথ।

কথিত আছে-ঈশাখাঁর সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন বিক্রমরাজ চাঁদ রায়ের কন্যা স্বর্ণময়ী। স্বর্ণময়ী বিক্রমপুর রাজবাড়ী থেকে পালিয়ে এগারসিন্দুরে চলে এসে ঈশাখাঁর নিকট বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছিলেন। ঈশাখাঁ এই রাজকন্যার আকাঙ্ক্ষা পূরণার্থে এগারসিন্দুর দুর্গের অভ্যন্তরে আয়োজন করেছিলেন বিবাহ উৎসব।

কিন্তু চাঁদ রায় এই বিয়ে কোনো ভাবেই মেনে নিতে পারেন নি। তাই এগারসিন্দুরে পার্শ্ববর্তী রাজ্যের রাজা নবরন্দ রায়ের সহায়তায় বিক্রমপুর রাজ চাঁদরায় এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে এগারসিন্দুর দুর্গ আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসে। ঈশা খাঁ তখন স্বর্ণময়ীকে জঙ্গলবাড়ীতে পাঠিয়ে দেবার পরিকল্পনা করেন। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী এক বিশাল আয়োজন সম্পন্ন করেন। স্বর্ণময়ীকে নিয়ে এক বিরাট নৌবহর রং-বেরং এর পাল তুলে রওনা হয় জঙ্গলবাড়ীর দিকে। প্রচুর লোক-লস্কর,পাইক-পেয়াদাসহ স্বর্ণময়ী চললেন জঙ্গলবাড়ীর অভিমুখে।এর মধ্যে একটি নৌকা ছিল মিঠাইভর্তি। চলতে চলতে নৌবহরটি একটি জন-মানবহীন নির্জন স্থানে এসে পৌছেঁ (বর্তমানে এই স্থানটিই কোশাকান্দা নামে পরিচিত)। এই স্থানে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ একটা কথা ভেসে আসল,'রাজরাণীর যাত্রাপথে আমাদেরকে মিষ্টি দিয়ে যেতে হবে।'কিন্তু নৌবহরের অধিনায়ক এই বাণীর প্রতি কোনো প্রকার কর্ণপাত না করে নৌবহরটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন। ঠিক ঐ সময়েই ঘটে যায় অলৌকিক এক কাণ্ড,মিঠাইভর্তি নৌকাটি ধীরে ধীরে পানির নীচে তলিয়ে যায়। নৌবহরের অন্যান্য লোকজন নৌকাটিকে উদ্ধার করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে।কিন্তু সকলের চেষ্টা ব্যর্থ করে নৌকাটি পানির নিচে সম্পূর্ন ডুবে যায়। অবশেষে নৌকাটিকে ডুবন্ত অবস্থায় রেখেই নৌবহরটি জঙ্গলবাড়ীর অভিমুখে চলে যায়। যে স্থানে কোশাটি

Dhaka University Institutional Repository

ডুবে গিয়েছিল সে স্থানটি কোশাকান্দা নামে পরিচিত। নদীটির চিহ্ন এখন আর নেই,কিন্তু ঐ স্থানে কোশার আকৃতি বিশিষ্ট একটি মাটির ঢিবি পরিলক্ষিত হয়। স্থানীয় লোকেরা মনে করেন,কোষা চিহ্নিত মাটির ঢিবিটিতে যদি কেউ কোদাল চালিয়ে মাটি কাটার চেষ্টা করে,তাহলে তার রক্ত বমি হয়। আজও লোকজন ভয়ে এই ঢিবিটির কোন ক্ষতি করেন না।

৩.৭.৩ *বেবুধ রাজার কিংবদন্তি*

সপ্তম শতাব্দীতে কামরূপ রাজ্যের অধীনস্থ সামন্ত রাজারা কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে বেশ কয়েকটি স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি সামন্ত রাজ্য গড়ে তুলেছিল।এগারসিন্দুর ছিল এই সামন্ত রাজ্যগুলির মধ্যে অন্যতম।এই রাজ্যের রাজাদের মধ্যে বেবুধরাজার অনেক কীর্তি-কাহিনী আজও লোক মুখে শোনা যায়।

বেবুদ রাজা একবার সিদ্ধান্ত নিলেন,তার প্রাসাদবাটির সামনে বিরাট আকৃতির একটি পুকুর খনন করবেন। সেই অনুযায়ী তিনি অসংখ্য কোদালি নিয়োগ করলেন। কোদালিরা রাজার নির্দেশমত পুকুর খনন করে চলল। কিন্তু দীর্ঘ দিন পুকুর কাটার পরেও পুকুরে কোন পানি উঠছে না। অবস্থা দেখে রাজা বেশ চিন্তিত হলেন।একরাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখলেন,রাণী যদি পুকুরের মধ্যবর্তী স্থানে এসে দেবতার নামে পূজা অর্চনা করে তবেই পুকুরে পানি উঠবে।

রাজা ঘুম থেকে জেগে রাণীকে স্বপ্নের বৃত্তান্ত বললেন। রাণী তখন পূজার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাজাকে অনুরোধ করলেন। উল্লেখ্য,রাণী প্রজাদের ভীষণ ভালোবাসতেন।পরদিন যখন রাণী পুকুরের মধ্যবর্তী স্থানে এসে দেবতার নামে পূজা অর্চনা করলেন,তখন পুকুরে ধীরে ধীরে পানি উঠতে শুরু করল। দেখতে দেখতে পুকুর পানিতে ভরে গেল ঠিকেই কিন্তু অত্যন্ত দু:খের বিষয় রাণী আর পুকুরের তীরে আসতে পারলেন না। এভাবে কয়েক দিন গত হওয়ার পর রাণীর একমাত্র শিশুসন্তান মায়ের অভাবে অসুস্থ হয়ে গেল।একদিন রাজা স্বপ্ন দেখলেন,রাণী তাকে বলছে,'আমার দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে প্রতিদিন রাতে তোমরা পুকুরের তীরে নিয়ে আসবে এবং তীরে তাকে রেখে দিয়ে তোমরা দূরে চলে যাবে।কথিত আছে,রাজা শিশুকে যখন পুকুর ঘাটে রেখে যেত তখন রাণী পুকুর থেকে উঠে এসে তার সন্তানকে দুধ খাওয়াত এবং আদর-যত্ন করতো।এইভাবে কিছু চলার পর একদিন রাত্রে রাণী যখন তার সন্তানকে আদর করছেন,রাজা তখন এই দৃশ্য দূর থেকে অবলোকন করছিলেন। সেইদিন রাজার ধৈর্যের আর বাঁধ মানল না।রাজা দৌড়ে এসে রাণীকে ধরতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন। সেদিন থেকে রাণী যে পুকুরে গেলেন আর কোন দিন উঠে আসেন নি।

কথিত আছে প্রজাদের কোন জিনিসের প্রয়োজন হলে,তারা পুকুর ঘাটে সে জিনিসের নাম লিখে আসত এবং পরদিন সেই জিনিসটি পুকুর ঘাটে পাওয়া যেত।রাণী প্রজাদের খুব ভালোবাসত বলে প্রজারা তাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করত।

৩.৭.৪ *নিজাম শাহের দরগার কিংবদন্তি*

ষোড়শ শতকের বাংলার ভাটি রাজ্যের অধিপতি ঈসা খাঁর মসনদই আলার ৭ম অধস্তন দেওয়ান হয়বত দাদ খান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়বত নগর হাবেলির পশ্চিম দিকে এক গম্বুজবিশিষ্ট প্রাচীন মসজিদের সম্মুখ দেওয়ালের দরজার উপরে শিলালিপিটি উৎকীর্ণ রয়েছে। সম্রাট শাহ আলমের রাজত্বকালে কিশোরগঞ্জ জেলায় যে কয়টি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল এগুলোর মধ্যে কিশোরগঞ্জ সদর থানার অর্ন্তগত কাতিয়ার চর গ্রামের এই মসজিদটি অন্যতম।

Dhaka University Institutional Repository

কথিত আছে , ষোড়শ শতকের পূর্বে কাতিয়ার চর গ্রামটি কয়েকটি বিলের সমষ্টিতে জনবসতির উপযোগী ছিল। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ঈসা খানের ৭ম অধস্তন দেওয়ান হয়বত দাদ খান জঙ্গলবাড়ী থেকে বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলা সদর থেকে পশ্চিম দিকে এসে একটি বিশাল হাবেলি নির্মাণ করেন। হয়বত দাদ খানের নামেই স্থানটির নামকরণ করা হয় 'হযবত নগর '। হয়বত নগর হাবেলির পশ্চিম প্রাচীর থেকে ঐ দিকে প্রায় ১ কি:মি: স্থান জুড়ে হয়বত নগর স্টেটের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা , কর্মচারীসহ জেলে, নাপিত, ধোপা, কুমার,কামার , মুচি,পালকি বাহক, হাকিম , কবিরাজ প্রমুখ পেশাজীবী মানুষের বসতি গড়ে ওঠে।

প্রাচীন নদী সুনন্দার দক্ষিণ তীরে নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্যসম্বলিত এই এলাকাটির প্রথমে যে স্থানটিতে জন-বসতি গড়ে ওঠে সেই স্থানটিকে 'কাতিয়ার চর'অর্থাৎ চরের অংশ নামকরণ করা হয়।জনশ্রুতি রয়েছে যে,ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এই স্থানে একজন সুফী দরবেশ আগমন করেছিল। জনবসতি বিহীন এই স্থানটিতে তিনি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করতেন।

হযরত দাদ খান যখন হাবেলি নির্মাণ করেন,তখন একরাতে তিনি ঐ সুফী দরবেশকে স্বপ্ন দেখেন।সুফী দরবেশ তাকে বলেন,'তোমার নব নির্মিত হাবেলির পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে নদীর তীরে একটি উচ্চ স্থান দেখতে পাবে।সেখানে রয়েছে একটি বিশাল বটবৃক্ষ।ঐ বটবৃক্ষের নিচে কয়েকটি ইঁটবিছানো অবস্থায় রয়েছে।ঐ স্থানটিকে তুমি হেফাজত করবে এবং প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাতি জ্বালাবে।'

স্বপ্নে এই নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ স্থানে দেওয়ান হয়বত দাদখান প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাতি জ্বালাতে থাকেন এবং জায়গাটিতে হেফাজতের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কথিত আছে, একদিন প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টিতে দেওয়ান হয়বত দাদ খান ঐ স্থানে যেতে না পেরে তার হাবেলির নিজামউদ্দিন আহমদ নামের একজনকে বাতি জ্বালানোর জন্য প্রেরণ করেন। নিজামউদ্দিন আহমদ তাঁর দায়িত্ব পালন করার পর পরই তাঁর সম্মুখে হযরত খিজির (আ:) আবির্ভূত হন এবং নিজামউদ্দিন আহমদকে কামালিয়াত প্রদান করেন।

এদিকে দায়িত্ব পালন শেষে নিজামউদ্দিন আহমদ হাবেলিতে প্রত্যাবর্তন না করায় দেওয়ান হয়বত দাদ খান পর দিন খবর নিয়ে জানতে পারেন নিজাম উদ্দিন আহমদ ঐ স্থানে গভীর ধ্যানে এবং আল্লাহর ইবাদতে মশগুল। এরপর থেকেই হযরত নিজাম উদ্দিন অবস্থান করে এক সময় ওয়াকাত প্রাপ্ত হন। মসজিদটি সম্ভবত তাঁর জীবিতকালে তাঁরই তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়েছিল । কারণ শিলালিপিতে নিজামউদ্দিন আহমদের নামটি উৎকীর্ণ থাকায় এই অনুমান করা যায়। অনেকের মতে মসজিদটি হয়বতনগর দেওয়ান সাহেবের অর্থানুকুল্যে নির্মিত হয়েছিল। তবে এই বিষয়টি সত্য নাও হতে পারে। কারণ তারা যদি এই মসজিদ নির্মাণের জন্য অর্থায়ন করতেন তাহলে তাদের নাম অবশ্যই শিলালিপিতে থাকতো । তবে এমনও হতে পারে, হযরত নিজামউদ্দিন আহমদ হয়বত নগর দেওয়ান সাহেবের আত্মীয় অথবা তাদেরই পরিবারের একজন হতে পারেন। ফলে এই শিলালিপিতে অন্য কারো নাম লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা দেওয়ান সাহেবরা অনুভব করেন নি। তবে এই বিষয়টিও সত্য যে হযরত নিজামউদ্দিন আহমদ যদি হয়বত নগর দেওয়ান সাহেবদের বংশের সন্তান হতেন তাহলে তাঁর নামের শেষে 'খান' শব্দটি অবশ্যই লিখিত থাকতো।কারণ তাদের কুরসিনামায় দেখা যায়,প্রত্যেকের নামের শেষে 'খান'শব্দটি ব্যবহার করেছেন। হয়বতনগর হাবেলিতে বসবাসরত ঈসা খাঁনের অধস্তনদের কাছে এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তাঁরা বলেন যে,নিজামউদ্দিন আহমদ হয়বতনগর স্টেটের একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিলেন।

এক গম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকারে নির্মিত অনিন্দ্য সুন্দর এই মসজিদটি মোগল স্থাপত্যকলার এক চমৎকার নির্দশন।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৭.৫ শ্যাম রায়ের কিংবদন্তি

নদীর নাম সন্ধনা -অনেকে বলেন নরসুন্দা। তবে কিশোরগঞ্জের প্রাচীন কবিরা নদীটিকে সুন্দনা নামেই অভিহিত করেছেন। যেমন মুন্সী আব্দুর রহিম বলেছেন-

' বাটির দক্ষিণে নদী সুন্দনা নামেতে'

এই সুন্দা নদীর প্রবাহধারার তীরে অনেক প্রচীন জনপদ এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে এই জনপদগুলির মধ্যে কোন কোনটির নাম এখনও মানুষের মুখে শোনা যায়।ঐ জনপদগুলির মধ্যে একটি ছিল হরিশচন্দ্রপুর। হরিশচন্দ্রপুরে ছিল রাজা শ্যাম রায়ের বিশাল প্রাসাদবাটি।উল্লেখ্য যে ,প্রাচীন যুগে কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল তার মধ্যে হরিশচন্দ্রপুর রাজ্যটি ছিল সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী।

কথিত আছে-এক সময় হরিশচন্দ্রপুরের রাজা হয়েছিলেন নিম রায় নামে এক ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ।তারই একমাত্র পুত্রছিল শ্যাম রায়।এই শ্যাম রায়ের জীবনের কোন কোন ঘটনা এতই বিচিত্র যে, ঐ সব ঘটনাগুলি থেকে তাকে রূপকথার নায়কের মতই মনে হয়। নিম্নে শ্যাম রায়ের জীবনের এমন একটি ঘটনা বর্ণনা করা হলো।

ছোটবেলা থেকেই শ্যাম রায় খুব ভালো বাঁশি বাজাতে পারতো। রাজবাড়ির পাশ দিয়ে প্রবাহিত সুন্দনা নদীর তীরে এক বিশাল বৃক্ষের নিচে বসে শ্যাম রায় বাঁশি বাজাতো। বেশীর ভাগ সময়ই তিনি রাতের বেলায় বাঁশি বাজাতেন।কথিত আছে,একদিন শ্যাম রায়ের বাঁশির সুরে মুগ্ধ হয়ে তার সম্মুখে আর্বিভূত হয় এক পরী। তারপর থেকে শ্যাম রায় যখনই বাঁশি বাজাতেন তখনই তার সম্মুখে হাজির হতো সেই পরী।পরী সুন্দরী রমণীর ছদ্মবেশে শ্যাম রায়কে ভালবাসতে শুরু করে।শ্যাম রায়ও ভালবেসে তার পরিচয় জানতে চায়। প্রথমে পরী তার পরিচয় গোপন রেখে বলে তার বাসস্থান পাশের গ্রমেই।বাঁশির সুরে মুগ্ধ হয়ে সে ঘর-বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে।এভাবে কিছুদিন চলার পর শ্যাম রায় যখন পরীকে গভীর ভাবে ভালোবাসতে থাকে তখন পরী তার আসল পরিচয় প্রকাশ করে।প্রকৃত ঘটনা জেনে শ্যাম রায় মারাত্মকভাবে আহত হন। পরিচয় প্রকাশ করার পর থেকে পরী শ্যাম রায়ের সাথে সাক্ষাৎ বন্ধ করে দেয়। শ্যাম রায়ের পিতামাতা তাকে বিয়ে করানোর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করলে,শ্যাম রায় বিয়ে করবেনা বলে তাদের জানিয়ে দেয়।শ্যাম রায় রাজপ্রসাদ ছেড়ে ঐ বটবৃক্ষের নিচে বসে বাঁশি বাজাতে থাকে আর পরীর জন্য অপেক্ষা করে কিন্তু পরী আর আসে না। প্রহর গুনতে গুনতে শ্যাম রায়ের রাত ভোর হয়, ভোর আবার রাত হয় কিন্তু পরীর সাক্ষাৎ সে আর কোন দিন পায় নি।

কিংবদন্তি আছে,শ্যাম রায় যে স্থানে বসে বাঁশি বাজাতো,সেখানেই তার পিতামাতা তার জন্য একটি বাড়ি নির্মাণ করেছিল। এই বাড়িতেই শ্যাম রায় তার শেষ জীবন অতিবাহিত করেছিল।লোকে এখনও এই বাড়িটিকে শ্যাম রায় ও পরীর ভিটা বলে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১.আশুতোষ ভট্টাচার্য,বাংলার লোক-সাহিত্য,পৃ:৩৯২।
২.আশুতোষ ভট্টাচার্য,বাংলার লোক-সাহিত্য,পৃ:৫১৩।
৩.আশুতোষ ভট্টাচার্য ,বাংলার লোক-সাহিত্য,পৃ:৪১৭।
৪.আশুতোষ ভট্টাচার্য ,বাংলার লোক-সাহিত্য,পৃ:২০৬।
৫.মো:সাইদুর সম্পাদিত,লোকসাহিত্য সংকলন-৪৫,বাংলা একাডেমী,ভূমিকাংশ।
৬.আশুতোষ ভট্টাচার্য,প্রাগুক্ত গীতিকাংশ।
৭.আশুতোষ ভট্টাচার্য,প্রাগুক্ত,পৃ:২২২।
৮.আশুতোষ ভট্টাচার্য,প্রাগুক্ত,পৃ:২৬৮।
৯.রওশন ইজদানী,মোমেনশাহীর লোকসাহিত্য,পৃ:৩০।
১০.রওশন ইজদানী,মোমেনশাহীর লোকসাহিত্য,জারি গান,পৃ:২৮-২৯।
১১.মো: সাইদুর সম্পাদিত 'লোকসাাহিত্য সংকলন-৪৫'বাংলা একাডেমী,পৃ:১৮-১৯।
১২.আশুতোষ ভট্টাচার্য,বাংলার লোক-সাহিত্য,পৃ:২৯১।
১৩.আশুতোষ ভট্টাচার্য,প্রাগুক্ত,পৃ:২৯২।
১৪.মো:সাইদুর কর্তৃক সংগৃহীত,ফোকলোর বিভাগ,বাংলা একাডেমী,ঢাকা।
১৫.মো:সাইদুর কতৃর্ক সংগৃহীত,ফোকলোর বিভাগ,বাংলা একাডেমী,ঢাকা।
১৬.আশুতোষ ভট্টাচার্য,প্রাগুক্ত, পৃ:২৯৪-৯৫।
১৭সংগ্রহ-নুরুন্নাহার,গ্রাম ও ডাকঘর -পুমদী,থানা-হোসেনপুর,জেলা-কিশোরগঞ্জ।
১৮.সংগ্রহ-নুরুন্নাহার,গ্রাম ও ডাকঘর-পুমদী,থানা-হোসেনপুর,জেলা-কিশোরগঞ্জ।
১৯.মো:সাইদুর কতৃর্ক সংগৃহীত,ফোকলোর বিভাগ,বাাংলা একাডেমী,ঢাকা।
২০.মো:সাইদুর সম্পাদিত-'লোকসাাহিত্য সংকলন-৪৫'বাংলা একাডেমী ,ঢাকা।
২১.মো:সাইদুর সম্পাদিত-'লোকসাহিত্য সংকলন-৪৫'বাংলা একাডেমী,ঢাকা।
২২.মো:সাইদুর সম্পাদিত-'লোকসাহিত্য সংকলন-৪৫'বাংলা একাডেমী,ঢাকা।
২৩.মো:সাইদুর সম্পাদিত-'লোকসাহিত্য সংকলন-৪৫'বাংলা একাডেমী,ঢাকা।
২৪.সংগ্রহ-ফোকলোর বিভাগ,বাংলা একাডেমী,ঢাকা।
২৫.সংগ্রহ-ফোকলোর বিভাগ,বাংলা একাডেমী,ঢাকা।
২৬.আশুতোষ ভট্টাচার্য,বাংলার লোক-সাহিত্য,{১ম খণ্ড}পৃ:৩৩০।
২৭.আশুতোষ ভট্টাচার্য,বাংলার লোক-সাহিত্য,{১ম খণ্ড}পৃ:৬৭৬।
২৮.আবদুস্ সাত্তার মাষ্টার,নশুয়া,কিশোরগঞ্জ সদর।
২৯.শ্রীঅমর শীল ,যশোদল,কিশোরগঞ্জ।
৩০.সংগ্রহ-ফোকলোর বিভাগ,বাংলা একাডেমী,ঢাকা।
৩১.নুরুন্নাহার,গ্রাম ও ডাকঘর -পুমদী,থানা-হোসেনপুর,জেলা-কিশোরগঞ্জ।
৩২.সংগ্রহ-ফোকলোর বিভাগ,বাাংলা একাডেমী,ঢাকা।
৩৩.আশরাফ সিদ্দিকী,লোকসাহিত্য।

Dhaka University Institutional Repository

৩৪.সংগ্রহ-ফোকলোর বিভাগ,বাংলা একাডেমী,ঢাকা।
৩৫.সংগ্রহ-নুরুন্নাহার,গ্রাম-পুমদী,থানা-হোসেনপুর,কিশোরগঞ্জ।
৩৬.সংগ্রহ-নুরুন্নাহার,গ্রাম-পুমদী,থানা-হোসেনপুর,কিশোরগঞ্জ।
৩৭.আশুতোষ ভট্টাচার্য,বাংলার লোক-সাহিত্য,পৃ:৫১৩।
৩৮.ডক্টর ওয়াকিল আহমদ,বাংলা লোক সাহিত্য ধাঁধা,পৃ:১৪,বাংলা একাডেমী,ঢাকা।
৩৯.ডক্টর ওয়াকিল আহমদ,বাংলা লোকসাহিত্যে প্রবাদ-প্রবচন,পৃ:১১,বাংলা একাডেমী,ঢাকা।
৪০.আশুতোষ ভট্টাচার্য,বাংলার লোক-সাহিত্য,১ম খণ্ড,পৃ:৫৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

৪. কিশোরগঞ্জের গীতিকাসমূহের বিশিষ্টতা

বিষয়বস্তু ও ভাবগত উভয় দিক থেকে এই অঞ্চলের গীতিকাগুলো বাংলা লোকসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ । এই গীতিকাগুলোর অভ্যন্তরীণ জীবনধর্ম ও কাব্যমূল্য যথার্থভাবে উপলব্ধির জন্য গীতিকা রচনার সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রীয় জীবনের চরিত্রধর্ম বিশ্লেষণ অপরিহার্য। লোকসাহিত্যে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের স্থানকাল ও প্রতিবেশের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।তাই কিশোরগঞ্জের গীতিকাসমূহে এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর আবেগ-অভ্যাস,তাদের জীবনাচরণ,দৈনন্দিন জীবন-ধারার বৈশিষ্ট্যসমূহ সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।গীতিকায় মধ্যযুগীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষ্য করা গেলেও তা থেকে ঐ এলাকার জনজীবন সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা লাভ করা যায়।

৪.১ গীতিকায় প্রতিফলিত সমাজচিত্র

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, বহু নদী-বিল-হাওর বেষ্টিত কিশোরগঞ্জ জেলা, বহিঃশক্তির আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকায় এখানে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দিক থেকে এক ধরনের স্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করছিল। এই এলাকায় প্রাপ্ত সাহিত্যসমূহে বিশেষ করে গীতিকাগুলোতে স্বাধীন প্রেম, সামাজিক শ্রেণী বৈষম্যের শিথিল বিশ্বাস, হৃদয়াবেগের প্রাধান্য এবং সর্বোপরি মানবিকতার পরিচয় প্রত্যক্ষ করা যায়।ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেনের মতে 'কঠোর জাতিভেদ প্রথা বা দৈনন্দিন জীবনাচরণে ধর্মীয় অনুশাসনের অনুপস্থিতিই পূর্ব ময়মনসিংহ অঞ্চলের লোকায়ত জনজীবনকে স্বাধীন প্রণয়াকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিধি নিষেধের শিথিল বিশ্বাসই ছিল সেখানকার সমাজের অর্ন্তময় বৈশিষ্ট্য।'(১)

কিশোরগঞ্জের গীতিকাসমূহের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এখানকার নারী চরিত্রসমূহ। স্বাধীন প্রণয়বাসনা, চারিত্রিক দৃঢ়তা,ব্যক্তিত্বময় রূপের অভিপ্রকাশে নারীচরিত্রসমূহ যে বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছে মধ্যযুগে বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল।অবশ্য এর পশ্চাতে পূর্ব মৈমনসিংহ অঞ্চলে আদিবাসী জনসাধারণের জীবনাচরণ ও মাতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে বলে মনে করা হয়।

ময়মনসিংহ গীতিকা বলতে মূলত পূর্ব ময়মনসিংহ গীতিকাকেই বুঝিয়ে থাকে । পূর্ব মৈমনসিংহের মধ্যে নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জের গীতিকাই প্রধান, তাই ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহে বিবৃত সমাজ চিত্রের বাস্তবতা সম্পর্কে সমালোচকগণ যে উক্তি করেছেন তা কিশোরগঞ্জে প্রাপ্ত গীতিকাগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বিভিন্ন সমালোচক গীতিকাগুলির উদ্ভবকাল কিংবা ভাষা সম্পর্কে নানারকম মতামত দিলেও গীতিকায় বর্ণিত সমাজবাস্তবতার প্রতিফলন বিষয়ে সকলেই একমত হয়েছেন।সংগ্রাহক সম্পাদক ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন," পালাগানের অধিকাংশই পূর্ব-ময়মনসিংহের কোন কোন যথার্থ ঘটনা অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। যে সকল ঘটনা অশ্রুসিক্ত হইয়া লোকেরা শুনিয়াছে, সকল অবাধ ও অপ্রতিহত মনের দুর্জয় চক্রের ন্যায় নিরীহ প্রাণকে পিষিয়া চলিয়া গিয়াছে - সেই সকল অপরূপ করুণ কাব্য গ্রাম্য কবিরা পয়ারে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন।'(২) সমাজে সংঘটিত বিভিন্ন বাস্তব ঘটনা কিংবা ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করে রচয়িতাগণ অত্যন্ত সহজ-সরল

Dhaka University Institutional Repository

ভাষায় গীতিকাগুলির কাহিনী সৃষ্টি করেছেন।এ অঞ্চলের মানুষের জীবনের সুখ-দু:খ, হাসি-কান্না,ব্যথা-বেদনার বাস্তবতা এবং মনন-মুক্তির প্রবল আকাঙ্ক্ষাই গীতিকাগুলিতে পরম আন্তরিকভাবে বিধৃত হয়েছে।

ময়মনসিংহের গীতিকাসমূহ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য এতে বিধৃত জীবন ও সমাজচিত্রের বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর ভাষায় " ইহার জীবন বাস্তব, জগৎ সত্য ও ভাষা জীবন্ত ।"(৩)

ডক্টর মযহারুল ইসলাম গীতিকাগুলোকে সমাজের বাস্তব জীবনালেখ্য বলে অভিহিত করেছেন।(৪)এ বিষয়ে ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকীর মতামত গুরুত্বপূর্ণ।তার মতে 'গীতিকাগুলির সৃষ্টির পেছনে সামাজিক প্রেরণা ক্রিয়াশীল থাকে বলে এখানে সমাজ চিত্রের বাস্তব প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।'(৫)

গীতিকায় প্রতিফলিত সামাজিক জীবনকে যথার্থভাবে উপলব্ধির জন্য গীতিকা রচনার আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রীয় জীবনের চরিত্রধর্ম বিশ্লেষণ অপরিহার্য। কিশোরগঞ্জে প্রাপ্ত গীতিকাগুলির উপর ভিত্তি করে এই এলাকার জনজীবন ও সামাজিক অবস্থার যে চিত্র পাওয়া যায় তার বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হল।

গীতিকাগুলো থেকে তৎকালীন সমাজ ব্যাবস্থা সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়।কৃষি এবং কৃষক জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে ঘনিষ্ঠ এই এলাকার সহজ সরল প্রকৃতির গ্রামীণ মানুষের হৃদয়ার্ন্তগত ভাব গুলোই ঐতিহ্যসূত্রে মিশে এখানে বিশেষ সংবেদনার সৃষ্টি করেছে। কৃষি ও কৃষক জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি 'মলুয়া' গাথায়'দেখতে পাওয়া যায়।কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল চাঁদবিনোদের পরিবার এই নিয়েই তাদের স্বপ্ন , তাদের বেঁচে থাকা।গাথার বিবরণ থেকে জানা যায় -

"ধারের কাচি আন্যা মায়ে তুল্যা দিল হাতে।
ক্ষেতে যাওরে পুত্র আমার ধান্য যে কাটতে॥"
পঞ্চ গাছি বাতার ডুগল হাতেতে লইয়া।
মাঠের মাঝে যায় বিনোদ বারমাসী গাইয়া ॥(মৈমনসিংহ গীতিকা–পৃ:৪৮)

কিন্তু প্রকৃতির প্রতিকূল অবস্থার কারণে যখন সেই স্বপ্নের ফসল নষ্ট হয়ে যায় তখন তাদের জীবনে নেমে আসে অমানিশা।

চান্দ বিনোদ আসি কয় মায়ের কাছে।
আইশনা পানিতে মাও সব শস্যি গেছে॥
মায়ে কান্দে পুত্র কান্দে সিরে দিয়ে হাত ।
সারা বছরের লাইগা গেছে ঘরের ভাত॥
টাকায় দেড় আড়া ধান পইরাছে আকাল।
কি দিয়া পালিব মায়া কুলের ছাওয়াল॥ (মৈমনসিংহ গীতিকা–পৃ:৪৮)

বৈরী আবহাওয়ার কারণে ক্ষেতের ফসল নষ্ট হয়ে গেলে কৃষকদের জীবনে যে দুঃখ-কষ্ট নেমে আসত তার অনুরূপ চিত্র পাওয়া যায় 'দস্যু কেনারামের পালায়'।

Dhaka University Institutional Repository

আকাল হইল গো অনাবৃষ্টির কারণে ॥
এক মুষ্টি ধান্য নাই গৃহস্তের ঘরে ।
অনাহারে পথে ঘাটে শত লোক মরে॥ (মৈমনসিংহ গীতিকা–১৯৫-৯৬)

দারিদ্র্যপীড়িত কৃষক পরিবারের পাশাপাশি সুখী অবস্থা সম্পন্ন কৃষক পরিবারের চিত্রও উপস্থাপিত হয়েছে।'মলুয়া গাথায় মলুয়া যখন চাঁদবিনোদকে তার বাড়িতে অতিথি হতে বলে , তখন মলুয়ার বর্ণনা থেকে তাদের সুখি সমৃদ্ধ জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়।

এই পথে যাইতে দেওরা বার দুয়াইরা ঘর॥
সামনে আছে পুষ্কনি সানে বান্ধা ঘাট।
পূব মুখ্যা বাড়ীখানি আয়নার কপাট॥
আগে পাছে বাগ-বাগিচা আছে সারি সারি।
পারাপশ্বির লোকে কয় গাও মরলের বাড়ী॥ (মৈমনসিংহ গীতিকা–পৃ:৫৯)

গীতিকাগুলিতে যে পারিবারিক জীবন উপস্থাপিত হয়েছে , তা থেকে পারিবারিক বন্ধনের দৃঢ়তারই পরিচয় মেলে। 'মলুয়া' পালায় দারুণ দুঃখ-কষ্টে তাড়িত হয়ে মলুয়া তার স্বামী-শাশুড়িকে ত্যাগ করে সুখী সমৃদ্ধ বাবার বাড়ীতে গমন করেনি। অপর দিকে মলুয়ার পাঁচভাইকেও দেখা যায় বোনের বিপদে জীবন বাজিরেখে তাকে উদ্ধার করে। পারিবারিক বন্ধনের ছবি ফুটে 'ইশা খাঁ মসনদালি' ও 'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান' পালায়। দেওয়ান ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর তার স্ত্রী নিয়ামতজান দুই পুত্রকে অবলম্বন করে স্বামীর ভিটায় জীবন-যাপন করে। নিয়ামতজান অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে দুই পুত্রকে নানা রকম ষড়যন্ত্রের হাত থেকে রক্ষা করে। 'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান'পালায় ফিরোজ খাঁর বিধবা মাতা ফিরোজা বেগম পুত্র এবং পুত্রবধুকে নিয়ে যে সুখী জীবন যাপন করেছেন তার চিত্র পাওয়া যায়।

এই অঞ্চলের গীতিকাগুলিকে সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা দেখা যায় যে,এখানে বহুবিবাহের প্রচলন রয়েছে। কোন কোন সময় এই বহুবিবাহের বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় সুখি-সমৃদ্ধ পরিবারগুলিতে নেমে আসে দু:খের অমানিশা। এর স্বরূপ লক্ষ্য করা যায় 'মলুয়া'পালায়। ব্রাহ্মণ্য সমাজের চাপে বিনোদ মলুয়াকে পরিত্যাগ করে দ্বিতীয়বার বিয়ে করে। অবশ্য বিনোদের এই দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ মলুয়াকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করে নি। রূপ লালসায় বশবর্তী হয়ে অনেকে বহু বিবাহের প্রতি আগ্রহ দেখায়।যেমন,মলুয়া পালায় কাজীর গৃহে একাধিক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও কাজী মলুয়ার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিবাহের প্রলোভন দেখায়। 'চন্দ্রবতী' পালায় চন্দ্রাবতী সঙ্গে জয়চন্দ্রের বিবাহের লগ্নে জয়চন্দ্র এক মুসলমান রমনীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিবাহ করে। এখানে রূপলালসায় বর্শীবর্তী জয়চন্দ্রের চারিত্রিক শৈথিল্য প্রকাশিত হয়েছে।

কিশোরগঞ্জের গীতিকাগুলিতে এই এলাকার ঐতিহ্যের স্বরূপ লক্ষ্য করা যায়। নানাবিধ সামাজিক প্রথা, রীতি-নীতি, বিধি-নিষেধ, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, লোকাচার, বিশ্বাস, কুসংস্কার ইত্যাদি বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন- 'মলুয়া' পালায় নানাবিধ পূজা পালনের উল্লেখ আছে।

শায়ন মাসেতে লোকে পূজে মনসা।
এই মাসে আইব সোয়ামী মনে বড় আশা॥
শায়ন গেল ভাদ্র গেল আশ্বিন মাস যায়।
দূর্গাপূজা আইল দেশে শব্দে শুনা যায়॥ (মৈমনসিংহ গীতিকা–পৃ:৮৪)

Dhaka University Institutional Repository

'চন্দ্রাবতী' পালাতেও নানাবিধ পূজাপালনের উল্লেখ আছে।

পূজিল শঙ্করে আগে দেব অনাদি।
অন্তরে যাহার নাম রাখিয়াছে বাধি॥
একে একে কৈল পূজা যত দেব আর।
শ্যামপূজা একা চূড়া বনদূর্গা মার॥ (মৈমনসিংহ গীতিকা–পৃ:১১০)

বিবাহাদি সম্পর্কিত নানাবিধ আচার-আচরণ বহু পূর্ব থেকেই এই অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। গীতিকা গুলিতে বিবাহ সংক্রান্ত বহুবিধ আচার অত্যন্ত চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে।কন্যার বিবাহের দিনক্ষণ ঠিক হলে আত্মীয় ও পাড়া-পড়শীদের নিকট আশীর্বাদ চাওয়ার রীতি কিশোরগঞ্জের গ্রামে-গঞ্জে এখনও প্রচলিত আছে।'মলুয়া' পালাতেও আমরা এর চিত্র দেখতে পাই।

মাথায় লক্ষীর কুলা অঞ্চলে ঘুড়িয়া।
সোহাগ মাগিল মায়ে বাড়ী বাড়ী গিয়া॥
উত্তম সাইলের চাউলে পিঠালী বাটিয়া।
বন্দনা করিল আগে তিন আবা দিয়া॥
চিমটিয়া তুলে সবে দুয়ারের মাটি।
সোহাগের দ্রব্য আনি দেয় কুটি কুটি॥
হলদি চাকি চাকি আর তৈল সিন্দুরে।
এরে দিয়া সোহাগ ডালা সাজায় সুবিস্তারে॥ (মৈমনসিংহ গীতিকা–পৃ:৬৭)

কুলা বা ডালার মধ্যে নানারকম পিঠা, দুয়ারের এক চিমটি মাটি, হলুদ, তেল, সিন্দুর ইত্যাদি দিয়ে সাজিয়ে তা মাথায় করে আঁচল দিয়ে ঘিরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে কন্যার জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হত। 'চন্দ্রাবতী' পালাতেও অনুরূপ চিত্র আছে।

সোহাগ মাগিল আর মায় বিধিমতে॥
আগে চলে কন্যার মায় ডালা মাথায় লইয়া।
তার পাছে কন্যার খুড়ী লোটা হাতে লইয়া॥
তার পরে যত নারী গীত জুকারে।
সোহাগ মাগিল কত বাড়ী বাড়ী ফিরে॥ (মৈমনসিংহ গীতিকা–১১০-১১১)

নতুন বধুকে ধান-দূর্বা দিয়ে বরণ করার রীতি এখনও প্রচলিত আছে।মলুয়া পালায় বর্ণিত আছে-

ধান-দুর্ব্বা দিয়া পরে আছিয়া-পুছিয়া।
চান্দ মুখ লইল মায়ে মুছিয়া মুছিয়া॥ (মৈমনসিংহ গীতিকা-পৃ:৭১)

গীতিকার কাহিনীগুলিতে গ্রামীন জীবনকে উপস্থাপিত করা হয়েছে। গ্রামের মানুষের জীবন যে নানারকম কুসংস্কার দ্বারা আচ্ছন্ন, তার পরিচয়ও এখানে বিবৃত হয়েছে। বিবাহের দিনক্ষণ ধার্য করা সংক্রান্ত কুসংস্কার 'মলুয়া' পালায় বর্ণিত আছে।

Dhaka University Institutional Repository

শায়ন মাসে বিয়া দিতে দেশের মানা আছে।
এই মাসে বিয়া দিয়া বেউলা রারি হইছে॥ (মৈমনসিংহ গীতিকা–পৃ:৬২)
অথবা
পৌষ মাসে পোষা আন্ধি দেশাচারে দোষ।
এই মাসে গেলে হইব বিয়ার সন্তোষ॥ (মৈমনসিংহ গীতিকা-পৃ:৬২)

যাত্রার দিন যাত্রা শুভ করার জন্য দই খাওয়ার সংস্কার প্রচলিত ছিল।
"দধি ভোজন করি বিনোদ যাত্রা যে করিল"। (মৈমনসিংহ গীতিকা-৬২)

বিপদ মুক্তির জন্য নানা রকম মানত করার প্রথা এই এলাকার মানুষের দীর্ঘকালের রীতি। যেমন-

'লাগিয়া কার্তিকের উষ গায়ে হইল জ্বর।
বিনোদের মায়ে কান্দে হইয়া কাতর॥
জোড়া মইষ দিয়া মায় মানসিক করে।
মায়ত কান্দিয়া কয় পুত্র বুঝি মরে॥ (মৈমনসিংহ গীতিকা-পৃ:৪৭)

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এই অঞ্চলের মানুষের প্রধান জীবিকা হল কৃষি। কৃষিজীবী মানুষকে অনেক সংস্কার মেনে চলতে হয়। 'মলুয়া' পালায় তা বর্ণিত হয়েছে।

পাঞ্চগাছি বাতার ডুগল হাতেতে লইয়া।
মাঠের মাঝে যায় বিনোদ বারমাসী গাইয়া॥ (মৈমনসিংহ গীতিকা-পৃ:৪৮)

কৃষকেরা প্রথম দিন ধান কাটার সময় পাঁচটি বাতা গাছের শীর্ষদেশ জমিতে নিয়ে যায়। এগুলি সিঁদুর ও অন্যান্য মাঙ্গলিক দ্রব্যে অনুলিপ্ত হয়। বাতার পাঁচটি ডগা বা অগ্রভাগের সঙ্গে পাঁচটি ধানের ছড়া বাঁধা হয়। কৃষকেরা একে লক্ষ্মীর আসন বিবেচনা করে ঘরের কোনে নির্দিষ্ট স্থানে তুলে রাখে।

বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে সমাজে যে কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত ছিল , তার পরিচয়ও গীতিকাগুলিতে দেখতে পাওয়া যায়। 'মলুয়া' পালায় বর্ণিত আছে

চম্পাতলার সোনাধর এক পুত্র তার।
দেখিতে সুন্দর পুত্র কার্ত্তিক কুমার॥
আড়ায় পুড়ায় তার আছেয়ে জমীন।
হারাধর কয় বংশে সেও অকুলিন॥ (মৈমনসিংহ গীতিকা-পৃ:৬৩)

অনুরূপ চিত্র 'চন্দ্রবতী' পালাতেও পাওয়া যায়-

ঘটক কহিল কথা "সন্কা"গ্রামে ঘর।
চক্রবর্ত্তী বংশে খ্যাতি কুলিনের ঘর॥ (মৈমনসিংহ গীতিকা-১০৯)

Dhaka University Institutional Repository

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে জানা যায় , এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর আবেগ-অভ্যাস , তাদের দৈনন্দিন জীবনধারার বৈশিষ্ট্যসমূহ,সমাজে প্রচলিত নানা রকম রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার,ধর্মীয় সংস্কার ইত্যাদি গীতিকা গুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে।মধ্যযুগের পটভূমিতে রচিত গীতিকাগুলিতে মধ্যযুগীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রতিফলিত হলেও এর মধ্য থেকেই ঐ এলাকার মানুষের সামাজিক -সংস্কৃতির জীবন সম্পর্কে ব্যাপকভাবে ধারণা করা যায়।

৪.২ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

কিশোরগঞ্জের গীতিকাগুলোর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। এখানে প্রাপ্ত গীতিকায় সর্বত্রই ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।এর কারণ বহু নদী-নালা, হাওর বেষ্টিত ভূ-মণ্ডলটি বহিঃশত্রুর প্রভাবমুক্ত ছিল বলে এখানে ধর্মীয় স্থিতিশীলতা বিরাজ করেছিল।হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত হলেও এই সম্প্রদায়ের মধ্যে সু-সম্পর্কের কথা বিভিন্ন গ্রন্থে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মহররম মেলা মূলত শিয়াপন্থী মুসলমানদের ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান হলেও সুন্নি মুসলমান ও হিন্দুরা এতে অংশগ্রহণ করে।অষ্টগ্রামের বিখ্যাত মহররম মেলা তার প্রমাণ। অন্য দিকে দুর্গাপূজার উৎসব, মনসা পূজার উৎসবে অংশগ্রহণে মুসলমানদের উৎসাহের কোন ঘাটতি দেখা যায় না। ধর্মীয় সম্প্রীতির এই চিত্র লক্ষ্য করা যায় এখানকার লোক সাহিত্য 'ইসা খাঁ মসনদালি' পালায়।' মুসলমান কবি কালিদাস গজদানী ও মমিনা খাতুনের প্রেম অকুণ্ঠিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন ,পার্শ্বেই আবার ঈসা খাঁর প্রতি অনুরক্তা কেদার রায়ের ভগিনীর চিত্রটি আছে। আর একটি গাথায় ব্রাহ্মন জয়চন্দ্র এক মুসলমানীর প্রেমে পড়িয়াছেন ও অপর-একটিতে সুরৎ জামাল ও ব্রাহ্মণ রাজকন্যা অধূয়ার প্রেমপ্রসঙ্গ আছে। --------এই গাথাগুলিতে জাতীয় বিদ্বেষের কণিকা মাত্র নাই, সত্য ঘটনা স্বকীয় গৌরবের বেদীর উপর দাঁড়াইয়া শ্রোতার অনুরাগ আকর্ষণ করিতেছে।হিন্দু ও মুসলমান যে বহু শতাব্দী কাল পরস্পরের সহিত প্রীতির সম্পর্কে আবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছিলেন, এই গীতিকাগুলিতে তার অকাট্য প্রমাণ আছে।"(৬)

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়,গীতিকাগুলিতে হিন্দু-মুসলমান কোন ধর্মই প্রাধান্য লাভ করেনি। হিন্দু-মুসলমান যে বহু শতাব্দীকাল ধরে পরস্পরের সঙ্গে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বাস করছে গীতিকাগুলিতে তার চিত্র লক্ষ্য করা যায়। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই এই সমাজে সমানভাবে সমাদৃত হয়েছে।গীতিকার কাহিনীগুলিতেও সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক কোন ঘটনার অবতারণা করা হয় নি। কোন কোন গীতিকায় মুসলমান শাসকদের নির্মম অত্যাচারের কথা পাওয়া গেলেও এটাকে 'মুসলমানী'অত্যাচার বলে অভিহিত করা ঠিক হবেনা।কেননা এটি অত্যাচারীর অত্যাচার,ব্যভিচারীর ব্যভিচার।এটি হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম বা জাতিগত কোন ঘটনা নয়। ধর্ম ও সমাজ নিরপেক্ষ শাশ্বত মানবিক বৃত্তিই গীতিকাগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে।

৪.৩ গীতিকায় প্রতিফলিত বিভিন্ন শ্রেণী ও বৃত্তিজীবী মানুষের পরিচয়

গীতিকায় বিভিন্ন শ্রেণীর ও বৃত্তিজীবী মানুষের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। তবে পূর্ব ময়মনসিংহের মানুষের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায় কৃষিকাজ হলেও অল্পসংখ্যক গাথায় এর চিত্র আছে। কারণ এই অঞ্চল ঐতিহাসিক ঘটনায় সমৃদ্ধ বলে গীতিকাগুলিতে ঐতিহাসিক চিত্রই প্রাধান্য পেয়েছে।এখানে নবাব - দেওয়ান - জমিদার- কাজী থেকে শুরু করে কৃষক, গায়েন,ডোম , দস্যু ইত্যাদি বৃত্তিজীবী মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়। সমাজের সর্ব -উপরিতলের এসব নবাব , জমিদারগণ কোন-না-কোনভাবে সমগ্র সমাজের শাসক ও শোষকের

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকায় অধিষ্ঠিত। তবে অত্যাচার, নিপীড়ন ও নির্যাতনের পাশাপাশি প্রজাবাৎসলতা, উন্নত চরিত্র, মানবীয় ঔদার্য্যগুণ, সংবেদনশীলতা, আন্তরিক প্রণয়াবেগও তাদের চরিত্রে সমানভাবে ক্রিয়াশীল ছিল।

মলুয়া,শ্যামরায়ের পালা,ইসাখাঁ মসনদালি,ফিরোজ খাঁ দেওয়ান ইত্যাদি গাথায় শাসক চরিত্রে রূপলালসা ও ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। নবাব -দেওয়ান-কাজি এরা সকলেই ইসলাম ধর্মাবলম্বী। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তারা তাদের অন্যায় আচরণের কারণে ইসলাম ধর্মের আদর্শ থেকে অনেক দূরে চলে গেছে এবং যারা তাদের অন্যায় কামনার শিকার হয়েছে তারা কেউই তাদের স্বধর্মীয় ছিলেন না। তবে পল্লীগণ এইসব কাহিনীকে দর্শক-শ্রোতার সম্মুখে ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে উপস্থাপন করেছেন। যার দরুণ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপর কোন বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হয় নি।

মলুয়া গাথায় শাসক চরিত্রে রূপলালসার স্বরূপ বিধৃত হয়েছে। চান্দবিনোদের সদ্য বিবাহিত স্ত্রী মলুয়ার দেহসৌন্দর্য কাজির মনে রূপলালসার সৃষ্টি করে। কাজি ক্ষমতার অপব্যবহার করে গ্রামের এক কুটনীর মাধ্যমে মলুয়াকে প্রলোভন দেখিয়ে কার্যসিদ্ধি করার চেষ্টা করে এভাবে–

নিখা যদি করে মোরে ভাল মত চাইয়া।
আমার ঘরের যত নারী রইব বান্দি হইয়া॥
সোনা দিয়া বেইরা দিবাম সর্ব্বাঙ্গ শরীর।
সাতখুন মাপ তার বিচারে কাজীর॥ (মৈমনসিংহ গীতিকা-পৃ:৭৪)

কাজির ঘরে একাধিক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও সে মলুয়াকে স্ত্রী হিসাবে লাভ করতে আগ্রহী। কিন্তু মলুয়া প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে কাজির অপমানিত হৃদয়ে জাগ্রত হয় প্রতিশোধস্পৃহা। চান্দবিনোদের উপর এই মর্মে এক পরওয়ানা জারি করা হয় যে, বিবাহ -উত্তর ছয় মাসকাল অতিবাহিত হলেও সে বিবাহজনিত কর সরকারী তহবিলে জমা দেয় নি। তাই এক সপ্তাহের মধ্যে এই কর জমা না দিলে জমি ও বাড়ির স্বত্ব লুপ্ত হবে।

'আজি হইতে হপ্তা মধ্যে আমার বিচারে।
বাজেয়াপ্ত হইবে তোমার যত বাড়ী জমি।।'(মৈমনসিংহ গীতিকা-৭৭)

কাজির ষড়যন্ত্রের শিকারে চান্দবিনোদ সর্বস্বহারা হলেও তার প্রতিশোধস্পৃহা ক্ষান্ত হয়নি। কাজি মলুয়াকে জোড়পূর্বক দেওয়ানের তত্ত্বাবধানে নিয়ে যায় এবং চান্দবিনোদের উপর মৃত্যুদণ্ড জারি করে। কাজির এই আচার-আচরণের মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয়েছে সেই সময়ের ক্রূর-কুটিল অপরাধ প্রবণতার সামগ্রিক রূপ।

রূপলালসা,ক্ষমতার অপব্যবহার, অন্যায়, অত্যাচার ও নির্যাতনের আর একটি ভিন্নরূপ চিত্রায়িত হয়েছে 'শ্যাম রায়ের পালা' গাথায়। পুত্রের পরকীয়া প্রেমের জন্য জমিদার পুত্রকে শাসন না করে যার প্রতি আসক্ত হয়েছে তার পরিবারের উপর নির্যাতন করেছে- এমন কাহিনী বিবৃত হয়েছে এ গাথায়। জমিদার পুত্র শ্যামরায় এক ডোম-বধুর প্রতি আসক্ত হলে জমিদার পিতা তার ক্ষমতার অপব্যবহার করে সেই ডোমের গৃহ চূর্ণবিচূর্ণ করে ।

কানা কানি জানাজানি লোকমোখে শুনি।
শুসায় জলিল রায় জ্বলন্ত আগুনে॥

Dhaka University Institutional Repository

লোক লাইঠ্যাল ডাকা রায় কোন কাম করিল ।
বাড়ীঘর ভাইঙ্গা ডোমের সায়রে ভাসাইল॥
(পূ:ব:গী:তৃ.খ.দ্বি.স পৃ.২৮৫)

মধ্যযুগীয় শাসকদের রূপলালসার চিত্র লক্ষ্য করা যায় ইসাখাঁ মসনদালি পালায়। ঈশাখাঁ কেদারনাথের বোন সুভ্রদাসুন্দরীর রূপে মুগ্ধ হয়ে প্রেমে পাগল হন। পরবর্তীতে তিনি তার সমর শক্তি ব্যবহার করে কেদারনাথের বোনকে অপহরণ ও ধর্মান্তরিত করে বিয়ে করেন। বোনের প্রতি এহেন আচরণের ফলে কেদারনাথও প্রতিশোধ গ্রহণে ব্রতী হয়। সে ছলে বলে কৌশলে ঈশা খাঁর দুই পুত্রকে বন্দী করে রাখে । অবশ্য পালার শেষে কেদারনাথের পরাজয় ও মৃত্যুই দেখানো হয়েছে।

ফিরোজ খাঁ দেওয়ান পালায় ফিরোজ খাঁ সখিনার রূপে মুগ্ধ হয়ে পিতার অসম্মতি সত্ত্বেও কেবলমাত্র সমরশক্তি প্রয়োগ সখিনাকে অপহরণ করে নিয়ে আসেন। তবে এক্ষেত্রে হিংসা বা প্রতিশোধস্পৃহা নয়,সখিনার অপহরণের মধ্য দিয়ে তার প্রতি ফিরোজ খাঁর প্রেমাবেগই প্রকাশ পেয়েছে।

রূপ লালসার বশবর্তী শাসকগণ কিভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করে অন্যায়-অবিচারের পথ বেছে নেন তার এক সচিত্র রূপ দেখতে পাওয়া যায় কিশোরগঞ্জের গীতিকাগুলোতে। মোগল শাসকগণ এই এলাকায় অবস্থান করেছিলেন বলে এখানকার প্রাণ্ড সাহিত্যে তাদের সদর্প উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। মধ্যযুগীয় শাসকদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এখানকার গীতিকাগুলোতে নাটকীয়তা আনতে যথেষ্ট সহায়তা করেছে।গীতিকার বর্ণনা থেকে জানা যায়,শাসকদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান। বিশেষত প্রশাসনে ও বিচার ব্যবস্থায় মুসলমানদেরই আধিপত্য ছিল। তাই কোন কোন গীতিকায় তাদের অন্যায়-অত্যাচার ও ক্ষমতার অপব্যবহারের রূপ দেখানো হয়েছে।

রূপলালসা ও অন্যায়াসক্তি ছাড়াও শাসক চরিত্রে যুদ্ধপরায়ণতার বৈশিষ্ট্যও বিদ্যমান ছিল। রাজ্য দখল,আত্মরক্ষা,প্রতিশোধস্পৃহা ইত্যাদি চরিতার্থ করণে তারা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। 'রাজা রঘুর পালা' ,'ফিরোজ খান দেওয়ান' , 'ইসাখাঁ মসনদালি' গীতিকায় যুদ্ধের বিবরণ আছে।

'রাজা রঘু পালায়' বালক রাজা রঘু ঈশা খাঁ কর্তৃক অপহৃত হলে অপমানবোধে তাড়িত আদিবাসী জনগণ তাকে উদ্ধার করার জন্য যুদ্ধযাত্রা করে। তবে শত্রুপক্ষের সঙ্গে মুখোমুখী না হওয়ায় সে যাত্রায় যুদ্ধ সংঘটিত হয় নি। তবে গাথায় যুদ্ধযাত্রার বর্ণনাটি একটি যুদ্ধের বাস্তবচিত্র তুলে ধরে।

মার মার কইরা চলে
জঙ্গলবাড়ীর স'রে॥

তারার দাপটে ভূমি
তরাতরি কাঁপে॥ (পূর্ব বঙ্গ গীতিকা,৪র্থ খন্ড,দ্বি.স.পৃ:৮৭)

যুদ্ধপরায়ণ মনোবৃত্তি শুধু পুরুষ চরিত্রে নয়,নারী চরিত্রেও বিদ্যমান ছিল। 'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান' পালায় উমর খাঁর কন্যা সখিনাকে দেওয়ানের অসম্মতি সত্ত্বেও দেওয়ান ফিরোজ খাঁ অপহরণ করে নিয়ে বিয়ে করেন। অপমানিত দেওয়ান উমর খাঁ দিল্লির বাদশাহর শরণাপন্ন হন। দিল্লীর বাদশার সহায়তায় উমর খাঁর ফিরোজ

Dhaka University Institutional Repository

খাঁর সাথে যুদ্ধ শুরু করে।যুদ্ধে ফিরোজ খাঁর সৈন্যরা যখন পরাজিত হতে চলে,তখন সখিনা দিল্লির বাদশাহ ও পিতার সৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে জয়ী হন।

আড়াই দিন হইল রণ কেউ না জেতে হারে।
আগুন লাগাইল বিবি কেল্লাতাজপুর সরে॥
বড় বড় ঘর দরজা পুইড়া হইল ছাই।
রণে হারে বাদশার ফৌজ সরমের সীমা নাই॥ (পূর্ব বঙ্গ গীতিকা,২য় খন্ড,২য় সংখ্যা,পৃ:১৫৪)

ইশা খাঁ মসনদালি গাথায় কয়েকটি খণ্ড খণ্ড যুদ্ধের চিত্র আছে। এর মধ্যে ঈশাখাঁর বিরুদ্ধে দিল্লির বাদশাহর সেনাপতি মানসিংহের যুদ্ধটি ইতিহাসবিখ্যাত। করপ্রদানে ঈশা খাঁর অস্বীকৃতি এবং দিল্লির বাদশার বশ্যতা স্বীকারে ঈশা খাঁর অসম্মতি এ যুদ্ধের কারণ। করআদায় এবং বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করে মানসিংহকে ঈশাখাঁর বিরূদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য প্রেরণ করা হয়। যুদ্ধে ঈশা খাঁর সাহসিকতা, বীরত্ব, কূটনৈতিক অভিজ্ঞতা ,কৌশলপ্রিয়তা প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

গীতিকার শাসক চরিত্রে রূপলালসা, লাঞ্ছনাপ্রিয়তা, যুদ্ধপরায়ণতার, পররাজ্য গ্রাস, আভিজাত্য লাভের প্রয়াস প্রভৃতির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে প্রজাবৎসলতা, উন্নত চরিত্রগুণ , মানবীয় ঔদার্য্য, সংবেদনশীলতা, আন্তরিক প্রণয়াবেগ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যেরও সমাবেশ ঘটেছে।

শাসক চরিত্রে প্রজাবাৎসল্য ও আন্তরিক প্রণয়াবেগের পরিচয় পাওয়া যায় 'ইশা খাঁ মসনদালি', 'ফিরোজখাঁন দেওয়ান' ও 'শ্যাম রায়ের পালা'য় । 'ইশা খাঁ মসনদালি' পালায় ঈশা খাঁ প্রজা সাধারণের উপর যথাযথ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে শাসক হিসাবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। তাঁর শাসনামলে প্রজাসাধারণ সুখে-শান্তিতে দিন যাপন করতো। পালায় বর্ণিত আছে–

তারপর মালীক অইল ইসাখাঁ দেওয়ান।
জান দিয়া পালে পরজা পুত্রের সমান॥ (পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা,পৃ:৯২)

আবার দেখা যায়, ঈশা খাঁ সুভ্রদাসুন্দরীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তার প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়েছেন এবং নানা রকম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তাকে ধর্মান্তরিত করে বিয়ে করে সুখী দাম্পত্য জীবন যাপন করেছেন।

' ফিরোজ খান দেওয়ান' গাথায় ফিরোজ খাঁন প্রজাহিতৈষণা কাজে জীবন উৎসর্গ করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।তিনি ঘর-সংসার না করে প্রজাসাধারণের কাজেই সারা জীবন নিজেকে নিয়োজিত রাখবেন।পালায় বর্ণিত আছে–

পরতিজ্ঞা করিয়াছি মাও মনেতে ভাবিয়া।
এইত জীবনে আর না করিবাম বিয়া॥
সাধি না করিবাম আমি থাকবাম আবিয়াইৎ।
রাজ্যের যতেক চিন্তা করি দিন রাইত॥ (পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা,পৃ:১২৭)

কিন্তু উমর খাঁ র কন্যা সখিনার প্রতিকৃতি দর্শনের পর তার মধ্যে প্রণয়ানুরাগ জন্মায়।রাজ্য ত্যাগ করে তিনি বনবাসী হন,সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করেন ,সখিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর তার নিকট প্রণয় নিবেদন করেন এবং

Dhaka University Institutional Repository

অনুকূল সাড়া পেয়ে যুদ্ধ করে সখিনাকে তিনি উদ্ধার করেন।আন্তরিক প্রণয়াবেগে উদ্দীপনার ক্ষেত্রে দেওয়ান ফিরোজ খাঁর চরিত্রটি উজ্জ্বল।

'শ্যাম রায়ের পালা'য় জমিদার-পুত্র শ্যাম রায় সাধারণ ডোমবধুর রূপে মুগ্ধ হয়ে তার নিকট প্রণয় নিবেদন করে । সমাজগর্হিত এই প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হয়ে শ্যামরায় ডোম-বধূকে নিয়ে রাজ্য ত্যাগ করে এবং চরম কষ্টকর জীবিকা নির্বাহের উপায় অবলম্বনে বাধ্য হন। প্রতিকূল পরিবেশের সাথে সংগ্রাম করে ডোমবধূকে নিয়ে শ্যাম রায় সুখেই ছিল।কিন্তু অবশেষে গাবর রাজার বিরূদ্ধে যুদ্ধ করে প্রাণ বিসর্জন করতে হয় শ্যামরায়কে । সামান্য ডোম-বধূর প্রতি প্রণয়ানুরাগ শ্যাম রায়ের পরম আত্মত্যাগ তার প্রণয়মহিমাকে উজ্জ্বল করেছে।

রাজা,জমিদার,নবাব,কাজি ইত্যাদি উচ্চশ্রেণীর শাসকচরিত্র ছাড়াও গীতিকাগুলিতে সাধারণ বৃত্তিজীবী মানুষের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। কৃষি এবং কৃষক জীবনের সঙ্গে নিবিড় ভাবে সম্পৃক্ত এই অঞ্চলের মানুষ।তাই কৃষিজীবী মানুষের পরিচয় গীতিকাগুলিতে দেখতে পাওয়া যায়।সম্পদশালী উচ্চবিত্ত কৃষক জীবনের পাশাপাশি সাধারণ পরিশ্রমী কৃষকচরিত্রের চিত্রও এখানে লক্ষ্য করা যায়।'মলুয়া'গাথায় মলুয়ার পিতা উচ্চবিত্ত কৃষক হীরাধর দাসের পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

জাতিতে হালুয়া দাস গাঁয়ের মরল।
মলুয়ার বাপ হয় নাম হীরাধর॥
পাঁচ পুত্র হয় তার অতি ভাগ্যবান।
সরু সশ্যে ভরা টাইল গোলা ভরা ধান,
ঘরে আছে দুধবিয়ানী দশ গোটা গাই।
হালের বলদ আছে তার কোন দু:খ নাই॥
বাইস আড়া জমীন তার সাইল আর আমন।
ধরে পুত্র বর তারে দিছে দেবগণ॥ (মৈমনসিংহ গীতিকা,পৃ:৫৬)

সুখি অবস্থাসম্পন্ন কৃষক হীরাধরের পরিচয়ের পাশাপাশি ভূমিহীন দরিদ্র কৃষক চান্দবিনোদের জীবন-যাত্রার পরিচয়ও বিবৃত হয়েছে। উচ্চবিত্ত কৃষক পরিবার ভূমিহীন কৃষক চান্দ বিনোদের নিকট কন্যা সর্মপণে দ্বিধাগ্রস্ত। গীতিকাগুলিতে এর পরিচয় পাওয়া যায়।

এক চিন্তা করে বাপে শিরে হাত দিয়া।
কেমন কইরা এমন ঘরে কন্যা দিবাম বিয়া॥
এক কাঠা ভুই নাই খলা পাতিবারে।
কেমন কইরা বিয়া দিবাম কন্যা এই ঘরে॥ (মৈমনসিংহ গীতিকা,পৃ:৬৪)

সমাজে আর্থিক সচ্ছলতার বিষয়টি নির্ভর করে ধানী জমির উপর। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে ক্ষেতের ফসল নষ্ট হলে তারা পতিত হয় দারুণ অর্থকষ্টে।'মলুয়া'গাথায় চান্দবিনোদের জীবনে আমরা এর স্বরূপ দেখতে পাই।দুর্ভিক্ষতাড়িত বিনোদ অবশেষে পাখি শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করে।

'চন্দ্রাবতী' ও 'দস্যু কেনারামের পালা'য় গান গেয়ে জীবিকা নির্বাহের চিত্র লক্ষ্য করা যায়। চন্দ্রাবতীর পিতা দ্বিজ বংশীদাস বিখ্যাত গায়ক এবং ব্রাহ্মণ। তিনি গানের দল নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে গান করেন। কিন্তু এই

Dhaka University Institutional Repository

দিয়ে তার সংসরে সচ্ছলতা আসে না। চন্দ্রাবতীর বিবাহের সময় উপস্থিত হলে পিতা বংশীদাসের আক্ষেপের মধ্য দিয়ে এর স্বরূপ দেখা যায়।যেমন-

সম্মুখে সুন্দরী কন্যা আমি যে কাঙ্গাল।
সহায় সঙ্গতি নাই দরিদ্রের হাল॥ (মৈমনসিংহ গীতিকা-পৃ:১০৬)

'দস্যু কেনারামের পালা'য় দস্যুবৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহের পরিচয় পাওয়া যায়।এখানে কেনারাম ও তার সঙ্গী-সাথীরা সবাই দস্যুবৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করে।বিখ্যাত গায়ক দ্বিজ বংশীদাস তাকে সৎপথে ফিরিয়ে আনে। দস্যু বৃত্তিই ছিল যার জীবিকা নির্বাহের প্রধান অবলম্বন সেই কেনারাম দ্বিজ বংশীদাসের মুখে মনসার গান শুনে সে দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করে বংশীদাসের মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নেয় এবং সমাজে একজন পরমভক্তরূপে গান গেয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে শুরু করে-

কক্ষেতে ভিক্ষার ঝুলি মুক্তি ভিক্ষা চাই।
এই মুষ্টি চাউল পাইলে খুসী হইয়া যাই॥(মৈমনসিংহ গীতিকা-পৃ:২৩৬)

৪.৪ গীতিকায় নারী চরিত্রের স্বরূপ

পূর্ব ময়মনসিংহ গীতিকার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গীতিকায় বর্ণিত অসাধারণ নারী চরিত্রসমূহ।গীতিকায় প্রস্ফুটিত নারী চরিত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে তাদের বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের সাক্ষাৎ লাভ করা যায়। এসব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রেম, নিষ্ঠা, সংযম, সহিষ্ণুতা,উদ্ভাবনী শক্তি, তেজস্বিতা, সতীত্ব, পতিব্রত্য, আত্মত্যাগ, আত্মসচেতনতা, ব্যক্তিত্ব ও সরলতাই প্রধান। এতে এই অঞ্চলের শাশ্বত পল্লীবালাদের আবহমান কালের প্রকৃত স্বরূপটি আবিস্কৃত হয়েছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে , পূর্ব ময়মনসিংহ অঞ্চলে মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রচলন ছিল। মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় স্ত্রীই প্রধান। এই জন্য এই এলাকার গীতিকাগুলিতে স্ত্রী চরিত্রের একচ্ছত্র আধিপত্য লক্ষ্য করা যায়। প্রেমমূলক গীতিকাগুলিতে প্রেমকে ধারণ করে আছে স্ত্রী চরিত্রসমূহ। এখানকার নায়িকাগণ অতুলনীয় প্রেমশক্তির অধিকারিণী, এই শক্তির দ্বারাই তাদের নারী ধর্ম ও সতীধর্ম রক্ষা পেয়েছে। তাই দেখা যায় গীতিকার নায়িকাগণ পরপুরুষের গৃহে দীর্ঘদিন বন্দী থেকেও একমাত্র প্রেমের শক্তিতে নিজেদের সতীত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হয়েছে। পূর্ব ময়মনসিংহ অঞ্চলের গীতিকাগুলির নারী চরিত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করতে গিয়ে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন " ইহারা যেন একটু স্বতন্ত্র , স্বকীয় মহিমা ও গৌরবে স্বয়ংসম্পূর্ণ নারীর একটি বিশিষ্ট সত্তা ইহাদের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে , ইহারা এই অঞ্চলের নদ-নদী-হাওর-অরণ্য বিধৃত প্রাকৃতিক সত্তারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সেই জন্য স্বভাবের মাধুর্য ও সারল্য , হিংস্রতা ও বিচিত্র হৃদয়াবেগ ইহাদের মধ্য দিয়া নানাভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছে। প্রকৃতি-জগতের সৌন্দর্য ও সংযমের অন্তরালে তাহাদের এক দুর্জয় শক্তির পরিচয় প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। এই শক্তি তাহাদের স্বাধীন প্রেমিক সত্তাকে অবলম্বন করিয়া বিকাশ লাভ করিয়াছে।" (৭)

পূর্ব ময়মনসিংহ গীতিকায় নায়িকা চরিত্রসমূহ সবাই প্রেমের জন্য যে পরিমাণ দুঃখ, যন্ত্রণা ,আত্মত্যাগ স্বীকার করতে পেরেছে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল। পল্লীকবিগণ সহজ-সরল দৃষ্টিতে শাশ্বত নারীর

Dhaka University Institutional Repository

অনাবৃত রূপটি এখানে প্রকাশ করেছেন। আর সেই চরিত্রগুলির পরিচয় পাওয়া যায় 'মলুয়া', 'চন্দ্রাবতী', 'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান', 'শ্যাম রায়ের পালা', প্রভৃতি গাথায়।

কিশোরগঞ্জের গীতিকাগুলিতে নারী চরিত্রের তুলনায় পুরুষ চরিত্রগুলি নিষ্ক্রিয়। দু'একটি গীতিকা ছাড়া অন্যসব গীতিকায় নারী চরিত্রের তুলনায় পুরুষ চরিত্রসমূহ একেবারেই ম্লান।পুরুষ চরিত্রের মধ্যে বড় বেশী সংকীর্ণতা,অহংকার, স্বেচ্ছাচারিতা, বর্বরতা ,নির্মমতা, লাম্পট্য প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। তারা যেন সব দিক থেকে নারীদের তুলনায় দুর্বল, স্থবির, বন্য, ভিলেন, কিংবা অপ্রধান চরিত্র।এমনকি তারা কখনই গীতিকার কাহিনী নিয়ন্ত্রণে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেনি বরং নারীরাই তাদের সংগ্রাম ও শক্তিতে, আচার-আচরণে, উদারতায়-দৃঢ়তায়, প্রত্যুৎপন্নমতিতে, সংযম-সহিষ্ণুতায়, প্রেমে-আত্মত্যাগে,তেজস্ক্রিয়তায়-উদ্ভাবনী শক্তিতে সর্বত্র ঘটনা সমূহের মূলস্রোত নিয়ন্ত্রণ করেছে।

পূর্ব-মৈমনসিংহ গীতিকার প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এখানকার অসাধারণ নারী চরিত্রসমূহ। আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন,দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের গীতিকাসমূহের সঙ্গে পূর্ব-ময়মনসিংহের গীতিকা সমুহের পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয় এই নারী চরিত্র চিত্রায়ণের ক্ষেত্রে।তাঁর মতে, পূর্ব ময়মনসিংহের গীতিকার মতো দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের গীতিকায় প্রেমকে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি।দু'তিনটি গীতিকায় প্রেমকে বিষয় হিসাবে অবলম্বন করলেও ময়মনসিংহের গীতিকার মতো নায়ক চরিত্রকে নিষ্প্রভ করে দেখানো হয়নি।এখানে নায়িকা চরিত্রের পাশাপাশি নায়ক চরিত্রকেও সমমূল্যায়ন করা হয়েছে।দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের গীতিকাসমূহে নায়ক-নায়িকা সকল দিক দিয়েই উপযুক্ত। দৃঢ়তায় ও একনিষ্ঠতায় নায়ক ও নায়িকার চরিত্র যদি সমতুল্য না হয়, তবে কাহিনীর যথার্থ রস-স্ফূর্তি হতে পারে না।পূর্ব-ময়মনসিংহের অধিকাংশ গীতিকার মধ্যে এই ত্রুটি বর্তমান আছে। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গ হতে সামান্য যে কয়টি প্রেমাখ্যানমূলক গীতিকা সংগৃহীত হয়েছে, তাদের মধ্যে নায়ক চরিত্রের এই ত্রুটি লক্ষ্য করা যায় না।

৪.৫ প্রকৃতি ও প্রতিবেশ

পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে, কিশোরগঞ্জ জেলা অসংখ্য নদ-নদী, হাওর-বিল ও জলাশয় বেষ্টিত।তাই এই সমস্ত নদী, বিল, হাওর এখানকার জনজীবনকে প্রভাবিত করে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে।কিশোরগঞ্জের গীতিকাগুলোতে নাটকীয়তা আনয়নে এই সমস্ত নদী, বিল, হাওরের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

কিশোরগঞ্জ জেলা শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে নরসুন্দা নদী।পূর্বে আঞ্চলিক উচ্চারণে এটাকে সুন্দা নদী নামে ডাকা হতো।'চন্দ্রাবতী' পালায় এই নদীর অবস্থান লক্ষ্য করা যায়।জয়চন্দ্রের সাথে মুসলমান রমণীর আকস্মিক সাক্ষাৎ ঘটে এই সুন্দা নদীর তীরে।পালায় বর্ণিত আছে-

পরথমে হইল দেখা দেখা সুন্ধা নদীর কূলে।
জল ভরিতে যায় কন্যা কলসী কাকলে॥ (মৈমনসিংহ গীতিকা-পৃ:১১১)

চন্দ্রাবতী-জয়ানন্দের করুণ স্মৃতিধন্য ফুলেশ্বরী নদীর সামান্যতম চিহ্নও আর নেই। তবে গীতিকায় এর উল্লেখযোগ্য অবস্থান লক্ষ্য করা যায়।চন্দ্রাবতীর সাক্ষাৎ লাভে ব্যর্থ জয়ানন্দ তীব্র অনুশোচনায় ফুলেশ্বরী নদীতে আত্মাহুতি দেয়।গীতিকায় বর্ণিত আছে-

Dhaka University Institutional Repository

জলে গেল চন্দ্রাবতী চক্ষে বহে পানি।
হেনকালে দেখে নদী ধরিছে উজানী॥
একলা জলের ঘাটে সঙ্গে নাহি কেহ।
জলের উপরে ভাসে জয়নন্দের দেহ॥ (মৈমনসিংহ গীতিকা-পৃ:১১৮)

মলুয়া পালায় চাঁদবিনোদের সাথে মলুয়ার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে জলের ঘাটে। বিনোদ ও মলুয়ার প্রথম দর্শনে প্রকৃতি যেন এখানে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

সাত ভায়ের বইন মলুয়া জল ভরিতে আসে।
সন্ধ্যা বেলা নাগর শুইয়া একলা জলের ঘাটে॥ (মৈমনসিংহ গীতিকা পৃ:৫১)

বিস্তার ধলাই কিল পদ্ম ফুলে ভরা।
কোড়া শিকার করতে দেওয়ান যায় দুপুর বেলা॥ (মৈমনসিংহ গীতিকা-পৃ:৯০)

মলুয়া পালায় বিনোদের বাড়ির অবস্থান বর্ণনা করতে গিয়ে সূতী নদীর কথা বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন-

কামলার কাম বিনোদ তাও ভালা জানে।
ভালা কইরা বান্ধে বাড়ী সূত্যা নদীর কানে॥ (মৈমনসিংহ গীতিকা-পৃ:৬৬)

কিশোরগঞ্জ জেলায় সূতী অবস্থান এখনও জাজ্বল্যমান। এসম্পর্কে ইত:পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। কিশোরগঞ্জ জেলার এক বৈচিত্র্যময় ভূ-প্রকৃতি হচ্ছে হাওর। গীতিকাসমূহে হাওরগুলির উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়।'দস্যুকেনারামের পালা'র ঘটনাবলি জালিয়া হাওরে সংঘটিত হয়। এখানে কিশোরগঞ্জের বিখ্যাত 'জালিয়া হাওরের' নাম উল্লেখ আছে।

জালিয়া হাওর নাম ব্যক্ত ত্রিভূবন।
দিনেকের পথ জুড়ি নল খগড় বন॥.(মৈমনসিংহ গীতিকা-পৃ:১৯৮)

পালার শেষে দস্যু কেনারাম তার সমস্ত ধন-সম্পদ যে নদীতে জলাঞ্জলি দিয়েছিল সেটি ছিল ফুলেশ্বরী নদী। উল্লেখ্য কবি দ্বিজ বংশীদাসের বাড়ী ফুলেশ্বরী নদীর তীরে অবস্থিত।

জন্মের কামাই আমি ভাসাইব নদীর জলে।
ডুবিয়া মরিব আমি ঐ না নদীর জলে॥ (মৈমনসিংহ গীতিকা-পৃ:২৩৫)

এইসমস্ত চর-হাওর-জঙ্গল-বিলের কথা এবং ব্রহ্মপুত্র, ফুলেশ্বরী, সূতী এবং ধনু নদীর কথা গীতিকাসমূহে বার বার উল্লেখিত হয়েছে। কারণ এগুলিই এই নিম্নাঞ্চল মানুষের জীবন-নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে এবং তারই বাস্তব রূপ গীতিকায় প্রতিফলিত হয়েছে।

তবে প্রকৃতি এখানে শুধু পটভূমি আসেনি, কোথাও কাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে,কোথাও চরিত্রসমূহের হৃদয়ানুভূতির সঙ্গে একান্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। মানব-হৃদয়ের বৈচিত্রময় অনুভূতিকে যথাযথরূপে উপস্থাপনের জন্য প্রকৃতিকে ব্যবহার করা হয়েছে চমৎকারভাবে। যেমন - মলুয়া গাথায় একমাত্র পুত্র বিনোদের গৃহ প্রত্যাবর্তনে

Dhaka University Institutional Repository

বিলম্ব ঘটায় নি:সঙ্গ বৃদ্ধা মাতার যে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও উদ্বেগাকুল মানসিক অবস্থা তা প্রকৃতির মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন এভাবে –

আশ্বিনে পূর্বের মেঘ পশ্চিমে যায়
ঘরে থাকা কাইন্দা মরে অভাগিনী মায়। (মৈমনসিংহ গীতিকা-পৃ:৫৪)

একমাত্র পুত্রের অনুপস্থিতিতে বৃদ্ধা মাতার অসহায়তার চিত্র ও প্রকৃতির ভয়ংকর রূপ অঙ্কনের মধ্য দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

গুরু গুরু দেওয়ায় ডাকে জিল্কি ঠাডা পরে
অভাগী জননী দেখ ঘরে পুইরা মরে। (মৈমনসিংহ গীতিকা-পৃ:৫০)

বজ্রপাতের বিদ্যুৎ দহনের সাথে পুত্রের জীবনে দুর্ঘটনার বিষয়টি এখানে প্রতীকায়িত করা হয়েছে।

চান্দবিনোদের সাথে মলুয়ার প্রথম দেখা হয় জলের ঘাটে, তারপর মলুয়ার মনেযে পূর্ব রাগের সঞ্চার হয়েছিল আষাঢ় মাসের কানায় কানায় পূর্ণ নদীর উচ্ছলতার মধ্য দিয়ে তার প্রকাশ ঘটানো হয়েছে। সেই এমন দুর্যোগপূর্ণ রাতে বিনোদের রাত্রি যাপনের বিষয়টিও তাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলেছে।

আসমানে থাকিয়া দেওয়া ডাকছ তুমি কারে ।
ঐ না আষাঢের পানি বইছে শতধারে॥
গাং ভাসে নদী ভাসে শুকনায় না ধরে পানি।
এমন রাতে কোথায় গেল কিছুই না জানি॥ (মৈমনসিংহ গীতিকা-পৃ:৫৭)

মলুয়া জীবনযুদ্ধে নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করে এগিয়ে যায়। কিন্তু এক পর্যায়ে সীমাহীন ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে সে আত্মবির্সজনে উদ্যোগী হয়। আত্মবিসর্জন কালে মলুয়ার ব্যর্থতাক্লিষ্ট জীবনের অসীম শূণ্যতাকে কূলহীন সমুদ্রের প্রতীকে আভাসিত করা হয়েছে এভাবে–

"পূর্বেতে উঠিল ঝড় গর্জিয়া উঠে দেওয়া।
এই সাগরে কূল নাই ঘাটে নাই খেওয়া॥
ডুবুক ডুবুক নাও আর বা কত দূর।
ডুইব্যা দেখি কতদূরে আছে পাতালপুর॥ (মৈমনসিংহ গীতিকা- পৃ.৯৯-১০০)

লক্ষ্য করা যায়,গীতিকায় প্রকৃতিকে ব্যবহার করা হয়েছে বিভিন্ন চরিত্রের মানসিক অবস্থাকে পরিস্ফুট করার জন্য।প্রকৃতির এই ব্যবহারে চরিত্রসমূহের হৃদয়ানুভূতি অত্যন্ত শৈল্পিকভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে। প্রকৃতির বিচিত্র রূপ এখানকার মানুষকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে।এর নদ-নদী বিধৌত ভাটি অঞ্চল ও তার স্বাভাবিক পরিবেশে মানুষ পেয়েছে এক উদাস মনোভাব।এর আকাশে-বাতাসে একটি সুমধুর বৈরাগ্যভাব মানুষের মনকে মোহাচ্ছাদিত করে রেখেছে।এজন্য এখানকার মানুষ কালি-কলম-পুথি-পুস্তকের শিক্ষার চেয়ে প্রকৃতির শিক্ষায় শিক্ষিত হয় বেশী। প্রকৃতি এদের জীবনকে যেমন করেছে বিচিত্র,তেমনি মহত্তর।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনিদের্শ

১.দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত-মৈমনসিংহ গীতিকা'র ভূমিকাংশ।
২.দীনেশ চন্দ্র সেন সম্পাদিত 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র ভূমিকাংশ।
৩.আশুতোষ ভট্টাচার্য বাংলার লোক-সাহিত্য[১ম খণ্ড,৩য় সংস্করণ,গীতিকা]
৪.সৈয়দ আজিজুল হক-ময়মনসিংহের গীতিকা জীবন ধর্ম ও কাব্যমূল্য,বাংলা একাডেমী,ঢাকা:পৃ:৩৫।
৫.আশরাফ সিদ্দিকী-লোক সাহিত্য,গীতিকাংশ।
৬.দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'মৈমনসিংহ গীতিকা'[ভূমিকা] পৃষ্টা-১৬-১৭
৭.আশুতোষ ভট্টাচার্য বাংলার লোক-সাহিত্য,১ম খন্ড,পৃ:৪২৭-৪২৮।

Dhaka University Institutional Repository

৫.গীতিকার সাহিত্যিক মূল্যায়ন

গীতিকাগুলিতে নিরক্ষর পল্লীকবিগণ তাদের কবিপ্রতিভার নিদর্শন দেখিয়েছেন।এখানে পল্লীকবিগণ তাদের কবিত্বের যে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন মধ্যযুগের কাব্যসাহিত্যের বিস্তৃত পরিসরে তার দৃষ্টান্ত বিরল।মধ্যযুগের কবিদের আধ্যাত্মিক ভাব,ভাষা,দর্শন ইত্যাদি নিরক্ষর পল্লীকবির রচনার মধ্যে পাওয়া যায়না। কিন্তু তাদের সহজ-সরল অমার্জিত ভাষায়,ছন্দহীন রচনায় দেখা যায় অপূর্ব কবিত্বের নিদর্শন।পল্লীকবিগণ মূলত নায়ক-নায়িকার প্রেমে মশগুল হয়েই এই সমস্ত পালা রচনা করেছেন।চরিত্র চিত্রণ,ঘটনাবিন্যাস ইত্যাদির প্রতি মনোযোগ খুব একটা দেখা যায় না।এরপরেও কাহিনীকে আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত করার জন্য চরিত্র চিত্রণ ও ঘটনাবিন্যাসে কবিগণ যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তা অপূর্ব। কিশোরগঞ্জে প্রাপ্ত গীতিকাগুলির আখ্যান,ঘটনাবিন্যাস এবং চরিত্রসমূহ বিশ্লেষণ করলে এর সত্যতা প্রমাণিত হবে।

৫.১ আখ্যান ও ঘটনাবিন্যাস

মধ্যযুগে রচিত হওয়া সত্ত্বেও গীতিকাসমূহ ছিল সম্পূর্ণ ধর্মীয় প্রভাব মুক্ত এবং মানবতাবোধে উজ্জীবিত।চরিত্র-চিত্রণ,ঘটনা-বিন্যাস ও রস পরিণতিতে গীতিকাসমূহ মধ্যযুগের সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল।গীতিকাসমুহের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর নাটকীয়তা, সংলাপ রচনা ও চমৎকার চিত্রময়তা। গীতিকার কাহিনীগুলিকে আকর্ষণীয় করে দর্শক-শ্রোতার কাছে সার্থকভাবে উপস্থাপনের জন্য উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যের অপূর্ব সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। রচয়িতাগণ প্রকৃতিকে ব্যবহার করে গীতিকার কাহিনীকে আরো জীবন্ত ও বাস্তবমুখী করে তুলেছে। ঘটনাবিন্যাসের ক্ষেত্রেও রচয়িতাগণ অসাধারণ সংযমের পরিচয় দিয়েছেন।গীতিকাসমূহে মধ্যযুগীয় কায়দায় অসংখ্য শ্লোকের ক্লান্তিকর বর্ণনাকে পরিহার করে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় ও ইঙ্গিতপূর্ণ সংলাপ ব্যবহার করেছেন।

আখ্যানভাগ নির্মাণে রচয়িতাগণ যথেষ্ট সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রথমে মলুয়া গীতিকাটি নিয়ে আলোচনা করা যাক।কাহিনীগত দিক থেকে 'মলুয়া' দশর্ক শ্রোতাকে প্রচণ্ড আকৃষ্ট করে।এই গাথার আখ্যান ভাগ প্রধানত দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশের সাথে পরবর্তী অংশের ভাবগত ও গঠনগত ভিন্নতা সহজেই লক্ষণীয়। দ্বিতীয় অংশে গাথার মূল সংকট ঘনীভূত হয়েছে। মলুয়ার সাথে চান্দবিনোদের সাক্ষাৎ, উভয়ের মধ্যে প্রণয়-বাসনার উদ্রেক এবং তা দাম্পত্য জীবনে পরিণতি লাভের মধ্যদিয়ে প্রথমাংশের সমাপ্তি। গাথার মূল সংকট শুরু হয়েছে এর দ্বিতীয় অংশে। তবে মূল সংকট শুরুর পূর্বেই গাথার অর্ধেক অংশ জুড়ে কেবল দাম্পত্য জীবন সূচনার কাহিনী বর্ণিত হওয়ায় আখ্যান ভাগের নৈয়ায়িক শৃংখলা ক্ষুণ্ন হয়েছে ।কাহিনীটি সঠিক ভাবে গ্রন্থিত হয়নি।' মলুয়ার গল্প গ্রন্থনে ত্রুটি আছে। আরোও পরিস্কার করে বলা যেতে পারে , কোন সচেতন কবির হাতের ছাপ এতে পড়েনি, বহুজনের হাতের চাপে এর অঙ্গ-বিকৃতি ঘটেছে। গল্পে ঐক্য নেই,ভাবলক্ষ্য বহু-দীর্ণ, সমাপ্তির মুখোমুখী নতুনতর সমস্যা যোজনার চেষ্টা আছে-সর্বসাকুল্যে মৈমনসিংহ গীতিকায় কাব্যগঠনের যে সাধারণ নৈপুণ্য, মলুয়ায় তার সাধর্ম লক্ষিত হয় না।'[১] ।চান্দবিনোদের চরিত্র চিত্রণে রচয়িতা ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারেনি।প্রথমাংশে চান্দ বিনোদের চরিত্রে কিছুটা সক্রিয়তা লক্ষ্য করা গেলেও দ্বিতীয় অংশে সে ছিল পুরোপুরি নিষ্ক্রিয়।দ্বিতীয় অংশে বিনোদের নির্লিপ্ততা কাহিনীর ট্র্যাজিক পরিণামকে অনিবার্য করে তুলেছে।বরং দ্বিতীয় অংশে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মলুয়ার চরিত্র। বুদ্ধিমত্তা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সক্রিয়তা,প্রণয়বাসনায় একনিষ্ঠা প্রভৃতি দ্বারা এখানে মলুয়া চরিত্রটি বীরাঙ্গনাতুল্য হয়ে উঠেছে। তবে মলুয়া চরিত্রটিকে উজ্জ্বল করে তোলার প্রচেষ্টায় চরিত্রের কোন কোন দিক বাস্তবতার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে।স্বামী বিনোদ বিনাদোষে মলুয়াকে ত্যাগ

Dhaka University Institutional Repository

করে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করে। স্বামীর এই আচরণ তার মনে কোন দু:খ-যন্ত্রণা বা ক্ষোভের সৃষ্টি করতে পারেনি।সে প্রাণপণে স্বামী এবং সতীনের সেবা করে যায়।সমাজ জীবনে এ ধরনের চরিত্র দুর্লভ।

আখ্যানভাগের প্রথম অংশে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি বর্ণিত হয়েছে প্রাকৃতিক বির্পযয় এবং এর ফলে সাধারণ মানুষের দু:খ-দুর্দশার করুণ চিত্র। অন্য দিকে দ্বিতীয় অংশে আছে সামন্তশক্তির অত্যাচার-নির্যাতন ও হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণ্য শাসনের প্রভাব।দ্বিতীয় অংশে গল্পের- দ্বন্দ্ব-সংকট চরম গতিশীল হয়েছে।গাথার অধিকাংশ ঘটনাই ঘটেছে এ অংশে।দ্বন্দ্ব-সংকটে এ অংশের আখ্যানভাগ গতিশীল হলেও ঘটনার আধিক্যে কিছুটা ক্লান্তিকর মনে হয়েছে।

'মলুয়া' গাথাটি কিছুটা বাহুল্য-দোষে দুষ্ট।মলুয়ার বাড়ীতে চান্দবিনোদের অতিথি গ্রহণকালে বহুবিধ রান্নার বর্ণনা,বিবাহ-অনুষ্ঠানের একটি বিস্তারিত বর্ণনা,বাসর রাতের কথোপকথন,পুত্র ও পুত্রবধু বরণের দৃশ্য প্রভৃতি অংশের বর্ণনা কাহিনীর কেন্দ্রীয় সংকটের ক্ষেত্রে বিচার করলে বাহুল্য দোষে দুষ্ট।তবে এ সকল অংশের বর্ণনায় যে চমৎকারিত্ব,গতিময়তা এবং আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের যে স্বাক্ষর পাওয়া যায় তা অপূর্ব।

'চন্দ্রাবতী' গাথাটির আখ্যানভাগ নিখুঁত।সংক্ষিপ্ত পরিসরে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় ঘটনাবলীকে নাটকীয়ভাবে উপস্থাপন করে কাহিনীটিকে সম্পূর্ণ করা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত পরিসরে রচয়িতা একটি সংকটকে যেভাবে উপস্থাপণ করে এর বিকাশ ও পরিণাম দেখিয়েছেন তা প্রশংসনীয়।'চন্দ্রাবতী' গাথা সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য নিম্নরূপ ঃ

"নিরবচ্ছিন্ন ধারায় জীবনের কাহিনী বর্ণনার পরিবর্তে জীবনের কতগুলো নাটকীয় মুহুর্তকে চকিত বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত করিয়া লইয়াই গীতিকা রচিত হইয়া থাকে,'চন্দ্রাবতী' গীতিকার মধ্যে এই গুণটির সর্বোত্তম বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।প্রথমেই ফুল তোলা , তারপরেই প্রেমের প্রকাশ এবং অতিদ্রুত বিবাহের প্রস্তাব ও আয়োজন -সব মিলিয়ে খণ্ড-খণ্ড ঘটনা একটি অখণ্ড জীবন-শ্রোত ফুটাইয়া তুলিয়াছে।পূর্বেই বলিয়াছি ,ইহা সার্থক গীতিকার লক্ষণ।"(২)

চন্দ্রাবতী' গাথার নাটকীয়তা অপূর্ব। জয়ানন্দ চন্দ্রাবতীকে প্রণয় নিবেদন করে পত্রপ্রেরণ করে, পত্রপড়ে চন্দ্রাবতীর মনে পূর্বরাগের সঞ্চার হয় এবং তাদের বিয়ের সমস্ত আয়োজন যখন সম্পন্ন হয় ঠিক তার পূর্বমুহূর্তে হঠাৎ জয়ানন্দের পরনারীগামিতার সংবাদে চন্দ্রাবতীর সমস্ত স্বপ্নসাধ ভেঙ্গে যাওয়ার দৃশ্যগুলি চমৎকার নাটকীয়ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। শেষ দৃশ্যে নাটকীয়তার সাথে চিত্রময়তা ও করুণ রসের সঞ্চার ঘটেছে। প্রেমে বিশ্বাসঘাতক জয়ানন্দ চন্দ্রাবতীর সাক্ষাৎ লাভে ব্যর্থ হয়ে অনুশোচনাদগ্ধ হৃদয়ে নদীর জলে আত্মহত্যা করে।জয়ানন্দের মৃতদেহ-দর্শনে নির্বাক চন্দ্রাবতীর মূর্তি অঙ্কনের মধ্যদিয়ে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে।শেষ দৃশ্যের নাটকীয়তা ও চিত্রময়তার সাথে ট্রাজেডী কল্পনার সমন্বয় হওয়ায়, নতুনতর মাত্রায় তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে।

'চন্দ্রাবতী'র কাহিনীনির্মাণে গাথারচয়িতা অসাধারণ সংযমের পরিচয় দিয়েছেন।গাথাটির সম্পূর্ণ বাহুল্য-দোষ-মুক্ত।সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে রচয়িতা চরিত্রের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব,ঘটনা-সঙ্কুলতা,সংকটের উদ্ভব,বিকাশ ও পরিসমাপ্তি টেনে কাহিনীর একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করেন। মধ্যযুগের কাহিনী কাব্যের মত শ্লোকের পর শ্লোক গেঁথে নায়িকার রূপ বর্ণনা করার কোন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়না এবং কাহিনীর প্রয়োজনেই তা পরিত্যাজ্য হয়েছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে কিশোরগঞ্জ জেলা ঐতিহাসিক ঘটনায় সমৃদ্ধ। তাই এখানে ঐতিহাসিক ঘটনাবলম্বনে রচিত হয়েছে নানা রকম গীতিকা। 'দেওয়ান ইশাখাঁ মসনদালি' গীতিকাটি ঐতিহাসিক

Dhaka University Institutional Repository

ঘটনা অবলম্বনে রচিত হওয়ায় এর আখ্যানভাগ চমৎকারিত্ব হারিয়েছে। গাথায় একমাত্র ঈশা খাঁ চরিত্রটি ছাড়া অন্য কোন চরিত্র বিকশিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেনি। ঈশা খাঁ চরিত্রটিতে বীরত্ব,সাহসিকতা,রণনৈপুণ্য,প্রজাবাৎসল্য ইত্যাদি বৈশিষ্টের সমন্বয় ঘটেছে। শুধুমাত্র কাহিনীর প্রয়োজনে আখ্যানভাগে দুটি প্রণয়সম্পর্ক অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে বিবৃত হয়েছে। তাই অন্যান্য গীতিকার মতো এখানে নারী চরিত্র বিকশিত হতে পারে নি। ঈশা খাঁর উত্তরাধিকার নির্ণয় , দিল্লীর বাদশার বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ এবং তজ্জাত যুদ্ধ-বিদ্রোহের বর্ণনা ইত্যাদি ঐতিহাসিক ঘটনাই এখানে প্রাধান্য লাভ করেছে। কিন্তু এসব বর্ণনা একেবারে সাদামাটা,অলঙ্কারবর্জিত এবং বিশেষত্বহীন। মমিনা খাতুন ও সুভ্রদার রূপবর্ণনা অংশে অলঙ্কার ব্যবহার করা হলেও সমগ্র নিস্প্রভ আখ্যানভাগের তুলনায় তা অকিঞ্চিৎকর হয়ে উঠেছে। কাহিনীর ঘটনাবিন্যাসে ঐক্যসূত্রতা রক্ষা করা হয়নি। কাহিনীর উৎপত্তি--বিকাশের সঙ্গে পরিণতির সমন্বয় রক্ষা করা হয়নি। খণ্ড খণ্ড কয়েকটি কাহিনী এখানে বর্ণিত হওয়ায় মূলকাহিনীটি বিশেষত্ব হারিয়ে ফেলেছে। এই সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য "-এই গীতিকাখানি কেবল ঘটনার তালিকামাত্র , ইহাতে কবিত্বের স্পর্শ নাই।-----দেখা যাইতেছে যে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব অবলম্বন করিবার ফলে পল্লী কবির প্রতিভা বিকাশের বাধা হইয়াছে; কারণ তাহাদের পরিকল্পিত সমাজ -ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত চরিত্রসমূহের কর্ম ও চিন্তার ধারা এক , ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির কর্মের ধারা অন্য; সেইজন্য ইহাদের মধ্যে সহজ সামঞ্জস্য স্থাপন করা সম্ভব হয় নাই। (৩)

ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত 'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান' গাথাটির নায়ক ফিরোজ খাঁ হলেও অন্যান্য গীতিকার মতো এখানে সখিনা চরিত্রটি পতিভক্তি ও বীর্যবত্তায় তাকে অতিক্রম করে গেছে। ফিরোজ খাঁ চরিত্রটিতে ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায় না।গাথার প্রথমদিকে তাঁর চরিত্রে যে বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় শেষ পর্যন্ত তা অক্ষুণ্ন থাকে নি।গাথায় অন্যান্য চরিত্রগুলি বিকশিত হওয়ার সুযোগ নেই বললেই চলে। তবে এই গাথায় আখ্যানভাগে ঐতিহাসিক চরিত্রের সমাবেশ ঘটলেও এর গল্পগ্রন্থন সম্পূর্ণরূপে গাথাধর্মী। এখানে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে তার উদ্ভব বিকাশ এবং পরিণতি দান করা হয়েছে। অপ্রধান ঘটনাবলিকে কেন্দ্রীয় সংকটের সঙ্গে চমৎকারভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে সাজানো হয়েছে। আখ্যানভাগের গল্পগ্রন্থণ ও ঘটনার সুনিপণ ঐক্যের কারণে এ গাথার রসপরিণাম সার্থকতর হয়েছে। সখিনার করুণ পরিণতির জন্য দায়ী তার পিতা ও স্বামীর তীব্র অনুশোচনার মধ্য দিয়ে এই গাথার সমাপ্তি ঘটেছে। গাথায় আখ্যানভাগে ঘটনাপ্রবাহ এমনভাবে বিন্যস্ত হয়েছে যে, এখানে সাখিনার মৃত্যু অনিবর্য হয়ে উঠেছে। উমরখাঁ ও ফিরোজ খাঁর চারিত্রিক ত্রুটির কারণেই সখিনার এই বিয়োগান্তক পরিণতি সংঘটিত হয়েছে, তাই কাহিনীর ট্রাজিক বেদনাও ধারণ করে আছে এই দুই চরিত্র। সখিনার মৃত্যুর পর তাদের তীব্র অনুশোচনার মধ্য দিয়ে এই বেদনার প্রকাশ ঘটে:

আস্যা দেখে সোনার চাঁদ জমীনে লুটায়
তারে দেখ্যা উমর খাঁ করে হায় হায়।
(দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক সঙ্কলিত পূর্ব্ববঙ্গ:মৈমনসিংহ-গীতিকা,দ্বিতীয় খণ্ড,দ্বিতীয় সংখ্যা,পৃ:১৫৬)

ফিরোজ খাঁর অনুশোচনার প্রকাশ ঘটেছে এইভাবে-

দেওয়নকিতে কাজ নাই ফকীর হইব
তোমার গান গাইয়া আমি ভিক্ষা মাগ্যা খাইব।'
(পূর্ব্ববঙ্গ:মৈমনসিংহ গীতিকা,প্রাগুক্ত,পৃ:১৫৬)

পল্লী কবি এখানে ট্রাজিক রস সৃষ্টিতে যথেষ্ঠ সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

কিশোরগঞ্জ হতে সংগৃহীত গীতিকাগুলোর মধ্যে ' দস্যু কেনারামের পালা' সম্পূর্ণ ভিন্ন । নর-নারীর প্রেম নয়, আধ্যাত্মিক প্রেমই এর মূল ভিত্তি। দ্বিজ বংশীদাসের মুখে বেহুলার গান শুনে নরঘাতক দস্যু কেনারাম কিভাবে পরম ভক্তরূপে সমাজে পরিচিত হল তার কাহিনী এখানে বর্ণিত হয়েছে। গাথার মূল কাহিনীটি খুবই সংক্ষিপ্ত কিন্তু মনসামঙ্গলের দীর্ঘ কাহিনী এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় মূল কাহিনীটি কিছুটা ম্লান হয়ে পড়েছে।আশুতোষ ভট্টাচার্য এ সম্পর্কে অভিমত দিয়েছেন,একজন বিশিষ্ট কবির রচিত মনসামঙ্গলের আনুপূর্বিক কাহিনীটি এর মধ্যে অর্ন্তভূক্ত হওয়ায় মূল কাহিনীর রসটি নিবিড় হতে পারেনি এবং আখ্যানভাগে ঘটনাবিন্যাস দৃঢ়বদ্ধতা লাভ করেনি।

কেনারামেই এই কাহিনীর একমাত্র উল্লেখযোগ্য চরিত্র এবং তার চরিত্রের উত্থান-পতনের মধ্য দিয়েই গাথার শুরু এবং শেষ। তবে গাথার কাহিনীর মধ্যে কেনারামের আকস্মিক পরিবর্তন আদৌ বাস্তবসঙ্গত ও স্বাভাবিক কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য"দেখিতে পাওয়া যায় যে,মনসার বরে কেনারামের জন্ম হইয়াছে।অপুত্রক ব্রাহ্মণ দম্পতি যখন সন্তান কামনা করিয়া দেবতার নিকট কাতর প্রার্থনা জানাইতেছিল,তখন এক রাত্রিতে দেবতা স্বপ্নে আবির্ভূত তাঁহাদিগকে পুত্রবর দিয়েছিলেন,তাহারই ফলে কেনারামের জন্ম। অতএব মনসার বরে তাহার প্রথম জন্ম হইয়াছিল, দ্বিজ বংশীর মুখে মনসার গান শুনিয়া তাহার পুনর্জন্ম হইল,গীতিকার মধ্যে এই ইঙ্গিতটির একটি উচ্চাঙ্গ কবিত্বমূল্য আছে।(৪)

দ্বিতীয়ত কেনারাম ব্রাহ্মণ সন্তান, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করেছে, সুতরাং তার এই অভ্যাস অবশ্যই পরিত্যাজ্য। দ্বিজবংশীর মুখে মানুষের জীবনের নিয়তির নিষ্ঠুর দৌরাত্ম্যের কাহিনী শুনে তার মানবিক গুণাবলী বিকশিত হয়ে চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটেছে-এতে অস্বাভাবিকতা বা অসঙ্গতির কিছু নেই। এই গীতিকায় অর্জিত ও সহজাত সংস্কারের মধ্যে দ্বন্দ্ব নির্দেশ করে পরিণামে সহজাত সংস্কারেরই জয় ঘোষণা করা হয়েছে বলে আশুতোষ ভট্টাচার্যের ধারণা।

'শ্যামরায়'পালাটি বর্ণনা প্রধান।ঘটনার পরিবর্তে এখানে বর্ণনার আধিক্য লক্ষ্য করা যায়।এ গাথায় আখ্যানভাগে স্পষ্টতই দুটি অংশ লক্ষ্য করা যায়। প্রথম ভাগে ডোম বধূর প্রতি শ্যাম রায়ের প্রেমাসক্তির জন্ম এবং প্রেম নিবেদন, বিবাহিত ডোমবধূর হৃদয়ে প্রণয়াসক্তি জন্ম নিলেও শ্রেণী ও জাতিভেদের কারণে প্রথমে তার মধ্যে শ্যাম রায়কে নিবৃত্ত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু শ্যাম রায়ের সুগভীর একনিষ্ঠ প্রণয়বাসনায় শেষ পর্যন্ত ডোমনারীকে সাড়া দিতেই হয়েছে। এমনকি স্বামীর অবর্তমানে শ্যামরায়কে নিয়ে রাত্রিযাপন করার মতো দু:সাহসী তার দ্বারা সম্ভব হয়েছে। এই সমস্ত ঘটনায় শ্যামরায়ের পিতার মনে জন্ম নিয়েছে প্রতিশোধের আগুন এবং সেই আগুনে পুড়ে গেছে ডোম বধুরসংসার। শেষ পর্যন্ত ডোম-নারীকে নিয়ে শ্যাম রায় দেশান্তরী হয়েছে।

দ্বিতীয় অংশে রয়েছে ডোমবধূকে নিয়ে শ্যাম রায়ের গাবর রাজার দেশে উপস্থিতি এবং অতি কষ্টে দিনযাপন। রূপ-লালসার কারণে গাবর রাজা কর্তৃক ডোমবধূকে অপহরণ,শ্যাম রায়কে মৃত্যুদন্ডাদেশ, কিন্তু ডোমনারীর বুদ্ধিমত্তার বলে তাদের মুক্তি, শ্যামরায় কর্তৃক যুদ্ধ আয়োজন,যুদ্ধে গাবর রাজার পতন ও শ্যামরায় নিহত এবং মৃত শ্যামরায়ের সঙ্গে ডোম বধূর সহমরণ যাত্রার মধ্য দিয়েই কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

' ঘটনার চেয়ে বর্ণনাপ্রধান এ গাথার কাহিনীর গতি সরলরৈখিক, পরিণতিমুখী ও বাহুল্যবর্জিত , এ গাথার পরিণতি বিয়োগান্তক ।শ্যামরায়ের মৃত্যু এবং ডোমনারীর সহমরণ যাত্রার মধ্য দিয়ে এই ট্রাজিক পরিণতি সাধিত হয়েছে। এই বিয়োগান্তক পরিণতির মূলে ছিল গাবর রাজা কর্তৃক ডোমনারীকে অপহরণ। তাছাড়া সামাজিক অবস্থানও শ্যামরায় ও ডোমনারীর মিলনের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। উল্লেখ্য যে, উভয়

Dhaka University Institutional Repository

চরিত্রের চিত্তগত কোন আচরণ, কোনো প্রবণতা, কোনো চারিত্রিক ত্রুটি এ গাথার ট্রাজিক পরিণতি সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি। বরং পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ততায়, প্রণয়ে একনিষ্ঠায় তারা যে মহত্ত্বের প্রকাশ ঘটিয়েছে, তাতে তাদের জীবনের করুণ পরিণতির কারণ বহি:সংঘাত হলেও, শ্যামরায় ডোম-বধুর প্রতি পাঠক হৃদয় সহানুভূতিশীল ওএকাত্ম। এদিক থেকে এ গাথার ট্রাজিক পরিনতিতে ভিন্নমাত্রা সংযোজিত হয়েছে।'(৫)

'সোনাই বিবি' গাথায় কাহিনীর মধ্যে ঐক্য রক্ষা করা হয়নি। এর আখ্যানভাগে গল্প -গ্রন্থনে শিথিলতা লক্ষ্য করা যায়।আখ্যানভাগটি বর্ণনায় অতিরঞ্জিত এবং বাহুল্যদোষে আক্রান্ত। বানিয়াচঙ্গের নবাব সূজা কর্তৃক সোনাইকে স্ত্রী হিসাবে লাভের আগ্রহ এবং সোনাই কর্তৃক সূজাকে পতি হিসাবে গ্রহণে অসম্মতি ও বাল্যপ্রণয়ী ছৈয়দ বিরামের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়া -এ দুই ঘটনার দ্বন্দ্বই এ গাথার মূল বিষয়বস্ত। কিন্তু গাথার এই সংকটকে উপস্থাপন করার জন্য প্রথম দিকে শিকারযাত্রার যে দীর্ঘকাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে তা ছিল নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়। যদিও শিকার যাত্রায় তৃষ্ণা নিবারণ করতে গিয়েই নুরা সোনাইয়ের দর্শন পেয়েছিল এবং মূল কাহিনীর সঙ্গে এর সংযোগ আছে তবুও শিকারযাত্রার এত দীঘ ও অবাস্তব বর্ণনায় কাহিনী বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। গাথার আখ্যানভাগের অধিকাংশ স্থানে অলৌকিক ঘটনা বর্ণনার ফলে রচয়িতার বাস্ত ববোধের পরিচয় ক্ষুণ্ন হয়েছে। বর্ণনার অতিরঞ্জন, ফেরেশতার আবির্ভাব ও তন্ত্র-মন্ত্রের আশ্রয়গ্রহণ প্রভৃতি অলৌকিক ঘটনার ফলে কাহিনী তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। যেমন বানিয়াচঙ্গের নবাব ভ্রাতৃদ্বয় সুজা ও নূরার শিকারযাত্রায় সহযাত্রীর সংখ্যা ছিল নয় লক্ষ। শিকারাবস্থায় তাদের সাথে খাদ্যসামগ্রী হিসাবে নেওয়া হয় চার হাজার ছাগল ও তের হাজার ঘোড়া। তাদের বাহক ছিল দু শত হাতি। সোনাই ও নুরার সাক্ষাতের পেছনে স্বয়ং ঈশ্বর ও তার দূত ফেরেশতা জিবরাইলের ভূমিকাই প্রধান । ঈশ্বর জিবরাইলের মাধ্যমে সোনায়ের শরীরে হঠাৎ এমন উষ্ণতার সৃষ্টি করে যে , প্রথম বারের মতো চৌদ্দ বছর বয়সে পুকুরে স্নান করতে যেতে বাধ্য হয় । এমন সময় জিবরাইল পুকুরের অপর তীরে নিদ্রামগ্ন নুরার নিদ্রাভগ্ন করলে সে সোনাইকে দেখতে পায়।সোনায়ের রূপে নুরা মুগ্ধ হলেও তার মধ্যে কোন প্রণয়বাসনার উদ্রেগ হয়নি। এরকম অলৌকিকতার উপাদান গাথার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায় । এছাড়াও ছৈয়দ বিরাম একা বারুল্লার ময়দানে নয় লক্ষ লোকের সঙ্গে লড়াই করে অর্ধ ঘন্টার মধ্যে লক্ষ লোকের প্রাণনাশের বর্ণনায় অতিরঞ্জন স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

"বর্ণনার অতিরঞ্জন, অলৌকিকতার সমাবেশ, যাদুমন্ত্রের প্রয়োগ অদৃষ্টের অমোঘতা সম্পর্কে নিশ্চিত বাণী প্রচার প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এ গাথার কাহিনী যেমন বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে, তেমনি গাথার করুণ পরিণতিও সর্বাংশে তাৎপর্যময় হয়ে উঠতে পারেনি।"(৬)

সমগ্র গাথার মধ্যে কেবলমাত্র সোনাই চরিত্রটি বিকশিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। মানবিক গুণাবলী সমন্বিত হওয়ায় নানাবিধ অবিশ্বাস্য ঘটনাপ্রবাহের মধ্যেও সোনাই চরিত্রটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো জাজ্বল্যমান।

'গকুলচান ও আইধর চান' গাথাও 'সোনাই বিবি'র মতোই অলৌকিক ঘটনায় ভরপুর।। গকুল চানের স্ত্রী দুধরাণীর দেহসৌন্দর্যের প্রভায় পুকুরের জল অগ্নিবর্ণ ধারণ করা এবং গকুল চান কর্তৃক যুদ্ধে নয়শত হাজার সৈন্যকে নিহত করা কিংবা মৃত গকুল চানের পুনর্জীবন লাভ প্রভৃতি ঘটনায় কাহিনী রূপকথাধর্মী হয়ে উঠেছে। পরীর রাজ্যের বিবরণ ও পরীর আগমন প্রভৃতিও রূপকথারই উপাদান। এখানেও রূপকথা ধর্মিতার কারণে কাহিনী তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। ফলে এর মিলনান্তক পরিণতিও অলৌকিকতার আশ্রয়ে হয়ে উঠেছে গুরুত্বহীন। গাথার চরিত্রসংখ্যা অল্প , এর মধ্যে এক মাত্র নবাব চরিত্র ছাড়া অন্য কোন চরিত্র অঙ্কনে রচয়িতার বাস্তবতাবোধের পরিচয় পাওয়া যায় না। অন্যান্য চরিত্রে অলৌকিকত্ব আরোপের ফলে চরিত্রগুলো মনুষ্যধর্মে বিশিষ্ট হতে পারেনি। এই প্রসংঙ্গে মো: শহীদুর রহমান 'ময়মনসিংহ গীতিকায় নারী চরিত্রের স্বরূপ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ;

Dhaka University Institutional Repository

"এ গুলোর পরিমণ্ডল যেন ধীরে ধীরে জীবননির্ভরতা পরিত্যাগ করে অলৌকিক ও অবিশ্বাস্য শিশুতোষ রূপকথা হয়ে উঠছে।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ড. দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' ও বাংলা একাডেমী কর্তৃক মুদ্রিত ও অমুদ্রিত 'মোমেনশাহী-গীতিকা' সমুহের তুলনামুলক পর্যালোচনায় একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সেই ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন প্রাচীন পূর্ব ময়মনসিংহ অঞ্চলে সৃজিত 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র বস্তুনিষ্ঠ জীবননির্ভরতা 'মোমেনশাহী-গীতিকা'য় ক্রমান্বয়ে আরব্য উপন্যাসের অলৌকিকতায় আবৃত হয়েছে।এর যথার্থ কারণ বোধকরি পরবর্তীকালে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে ধীরে ধীরে অপরাপর অঞ্চলের সঙ্গে পূর্ব-ময়মনসিংহের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ও সম্পর্কস্থাপন। এজন্যই মনে হয় মুসলিম ঐতিহ্য এবং তারও পরে ইংরেজ আমলের আদর্শিক-স্থানিক-কালিক বৈশিষ্ট্য বাংলা একাডেমী কর্তৃক সংগৃহীত মুদ্রিত ও অমুদ্রিত মোমেনশাহী-গীতিকা সমূহে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখানে একটি কথা স্বভাবতই মনে পড়ে যে, মৈমনসিংহ-গীতিকার কবিগণ যেন কোন কোন ক্ষেত্রে অলৌকিক ঘটনাকেও আশ্চর্যকৌশলে বস্তুজগৎ স্পর্শে মহিমান্বিত করে তুলেছেন। কিন্তু মোমেনশাহী-গীতিকায় তার সম্পূর্ণ উল্টোপিঠ পরিদৃষ্ট হয়। সেখানে কবিগণের বাস্তব উপলব্ধি ক্রমান্বয়ে অলৌকিক জগতে অন্তর্ধানের প্রয়াস পেয়েছে। অথার্ৎ 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'য় বস্তুনির্ভরতা প্রাধান্য পেয়েছে, পক্ষান্তরে 'মোমেনশাহী-গীতিকা' বস্তুকে ছাপিয়ে অতিপ্রাকৃত রোমান্সের দিকে ধাবিত হয়েছে। এ যেন পুথিসাহিত্যের প্রভাবজড়িত গীতিকার নবতর সংস্করণ"[৭]

৫.২ চরিত্রায়ণ

চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে রচয়িতাগণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কোন প্রকার ধর্মীয়বোধে আচ্ছন্ন না হয়ে কেবলমাত্র বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই রচয়িতাগণ চরিত্র সৃজন করেছেন।গ্রামীন পটভূমিতে রচিত এই সমস্ত গীতিকায় বিভিন্ন শ্রেণী ও বৃত্তিজীবী মানুষের চরিত্র উপস্থাপিত হয়েছে।জমিদার,নবাব,দেওয়ান থেকে শুরু করে এখানে কৃষক,ডোম,কুটনী,দস্যু প্রভৃতি নানা শ্রেণীর চরিত্রের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে।প্রত্যেকটি চরিত্রই তাদের নিজ নিজ বলয় থেকে গীতিকাসমূহে চিত্রায়িত হয়েছে।এই সমস্ত চরিত্রের সংবেদনশীলতা,প্রণয়াকাঙ্ক্ষা,সুখ-দুঃখ,হাসি-কান্না,ভীরুতা-সাহসিকতা,ক্রোধ,ক্ষমাশীলতা,রূপলালসা,পতিভক্তি-পত্নী-প্রেম ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য গাথাসমূহে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।গীতিকার প্রতিটি চরিত্রে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যবোধ পরিস্ফুট হয়েছে। মধ্যযুগের কালপরিধিতে রচিত হওয়া সত্ত্বেও গীতিকা রচয়িতাগণ কোন প্রকার ধর্মীয়বোধে আচ্ছন্ন না হওয়ায় এখানে ব্যক্তিত্বের জাগরণ স্পষ্ট হয়েছে।এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আজিজুল হকের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য "ময়মনসিংহের গীতিকায় চরিত্র উপস্থাপনের ক্ষেত্রে রচয়িতাগণের নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব কিংবা কারও প্রতি প্রতিকূল মনোভাব ব্যক্ত না করে,সকল চরিত্রের নিকট থেকে সমান দূরত্ব বজায় রেখেছেন গীতিকার রচয়িতাগণ। চরিত্রের গুণাবলি কিংবা ত্রুটি-দুর্বলতা বিশ্লেষণ করেননি,চরিত্রসমূহের আচরণ ও উচ্চারণের মধ্যদিয়েই রচয়িতাগণ তাদের বৈশিষ্ট্যকে উন্মোচন করেছেন।"(৮)

প্রথমেই মলুয়া গাথার চরিত্রসমূহকে নিয়ে আলোচনা করা যাক।'মলুয়া গাথা'র কেন্দ্রীয় মলুয়া চরিত্রটি একনিষ্ঠ প্রেম ,সক্রিয়তা, বুদ্ধিমত্তা ,পতিভক্তি, আচরণের দৃঢ়তা ও আত্মগৌরবের মাহাত্ম্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কোন প্রকার সংকীর্ণতা,ভীরুতা , নিশ্চেষ্টতা তার চারিত্রিক ঔজ্জ্বল্যকে ম্লান করতে পারেনি। মলুয়া চরিত্রে যে সতীত্ব ও পতি প্রেমের নিদর্শন লক্ষ্য করা যায় , তা কোন প্রকার সমাজ বা ধর্মচিন্তাপ্রসূত নয়, বরং এগুলি তার ব্যক্তিত্বরই বহি:প্রকাশ ।

চান্দবিনোদের সাথে মলুয়ার প্রেম এবং এই প্রেমকে পরিণতি দানের জন্য তার চরিত্রে যে সচেষ্টতা লক্ষ্য করা যায় তার দৃষ্টান্ত বিরল। তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে প্রথম দিকে চান্দ বিনোদের সক্রিয়তা অধিক মাত্রায় লক্ষ্য করা গেলেও পরবর্তীতে দাম্পত্য সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখার জন্য

Dhaka University Institutional Repository

মলুয়ার প্রাণপণ প্রচেষ্টা সত্যিই লক্ষণীয়।বিশেষ করে কাজীর অন্যায় প্রস্তাব প্রত্যাখান করলে সর্বস্বহারা চান্দবিনোদের পরিবারে যে চরম দু:খ-দুর্দশা নেমে আসে, সেই দারিদ্রের মধ্য দিয়েই সে জীবন যাপন করে,আবার স্বামী দ্বিতীয়বার বিয়ে করলেও সর্পদংশিত স্বামীর জীবন লাভের জন্য তার যে প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়,এর মধ্য দিয়ে তার প্রবল পতিপ্রেমেরই বহি:প্রকাশ ঘটে। তেমনি কাজি কর্তৃক স্বামী চান্দবিনোদের প্রাণ সংহারের আয়োজন ,পাঁচ ভাইকে খবর পাঠিয়ে এনে তার উদ্ধার প্রচেষ্টায় কিংবা ব্রত পালনের কথা বলে দেওয়ান গৃহে সতীত্ব রক্ষা ও পলায়নের সুযোগ সন্ধান , কাজিকে শূলে চড়ানো প্রভৃতি ঘটনায় তার বুদ্ধিমত্তা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। স্বামীর প্রতি তার একনিষ্ঠ প্রেমই তার এই উপস্থিতবুদ্ধি ও মানসিক শক্তি জোগাতে সাহায্য করেছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ সমাজপতিদের নির্মম অবিচারে মলুয়া স্বামীকর্তৃক পরিত্যক্ত হলেও হতাশাগ্রস্ত হয়নি।বরং স্বামীগৃহে দাসীবৃত্তির জীবন গ্রহণ করে তার সেবায় নিয়োজিত হয়ে সে যে পরম ধৈর্য ও পতিপ্রেমের পরিচয় দিয়েছে বাংলা সাহিত্যে তা বিরল।শুধু কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্রাহ্মণ্য সমাজের চরম প্রতিক্রিয়াশীল ও নির্দয় অমানবিক আচরণের ফলেই যে শেষ পযর্ন্ত মলুয়া নদীতে আত্মবিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছিল তা নয়,তার প্রতিকূল পরিস্থিতিতে স্বামীর নির্লিপ্ত অবস্থানও তাকে আত্মহত্যার পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।স্বামীর সর্বময় মঙ্গল কামনা করে সে এই পথ বেছে নিয়েছে।তার চরিত্রের মধ্যে যে তেজোদীপ্ত প্রখর ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পেয়েছে , নারীত্বের এই দুর্লভ রূপ আর কোন গীতিকার মধ্যেই এমন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। মলুয়ার চরিত্রটি সম্পর্কে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য :- " নারীর সতীত্ব যে নারীরই একটি বিশিষ্ট শক্তি , ইহা সমাজ - শাসনের যে কোন অপেক্ষাই রাখে না, মলুয়ার চরিত্রটি তাহার প্রমাণ।" (৯)

মলুয়া গাথায় নায়ক চান্দ বিনোদের চরিত্রে ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায় না। তার চরিত্রের সক্রিয়তা গাথার প্রথম অংশে লক্ষ্য করা গেলেও শেষ পর্যন্ত তা অক্ষুণ্ন থাকেনি।নানারকম প্রতিকূল পরিস্থিতিতে চান্দবিনোদের নিষ্ক্রিয়তাই কাহিনীকে ট্র্যাজেডির দিকে ঠেলে দিয়েছে।ডক্টর আশুতোষ মতে,বিনোদের চারিত্রিক দৃঢ়তার অভাবের মধ্যেই এই কাহিনীর ট্র্যাজিডির বীজ নিহিত।চাঁদবিনোদের প্রেম রূপজ মোহজাত , তার প্রেমে যদি সত্য থাকত, তার চারিত্রিক বল যদি সুদৃঢ় হত , তবে ব্রাহ্মণ্য শাসন এই ক্ষেত্রে কিছুই করতে পারত না। নারীর প্রেমের শক্তি যে কত প্রবল, পুরুষ তার তুলনায় যে কত দুর্বল , এই কাহিনীর নায়ক চাঁদ বিনোদই তার প্রমাণ।যার প্রেমের জন্য তার প্রাণ বাঁচল সমাজের কথায় সে তাকেই বিসর্জন দিল।যে শক্তি দ্বারা মলুয়া অত্যাচারীর হাত থেকে নিজের সতীত্ব রক্ষা করেছিল, সে শক্তি দ্বারাই সে তার স্বামীর এই অপমান জয় করল।সে তার স্বামীর ঘরে সতীনের দাসী-বৃত্তি করে যে গৌরবের অধিকারী হয়েছে তাতে প্রকৃত পরাজয় তার স্বামীরই হয়েছে, মলুয়ার নয়।গীতিকার এই কাহিনীতে চাঁদবিনোদের চরিত্রের যে নিচেষ্টতা ও নিষ্ক্রিয়তা লক্ষ্য করা যায় তা তার নায়কোচিত মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করেছে।

'চন্দ্রাবতী' পালাটিতেও নায়িকা চন্দ্রাবতীর একনিষ্ঠ প্রেমের পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে। রূপ ও গুণ এ উভয় বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটেছে চন্দ্রাবতীর চরিত্রটিতে। বাল্যবন্ধু জয়ানন্দের পত্রপাঠে চন্দ্রাবতীর মনে পূর্বরাগের সঞ্চার হয়। নারীসুলভ সংকোচ থাকা সত্ত্বেও সে জয়ানন্দের প্রেমে সাড়া দেয়।তারপর জয়ানন্দের সাথে বিবাহ উদ্যোগের মধ্য দিয়ে চন্দ্রাবতীর হৃদয় যখন উল্লাসে উজ্জ্বল ,ঠিক তখনই জয়ানন্দের কাছ থেকে আসে মর্মান্তিক আঘাত। পরনারীগামী জয়ানন্দ ধর্মান্তরিত হয়ে এক মুসলমান রমণীকে বিয়ে করে।জয়ানন্দের এই আচরণ চন্দ্রাবতীর নিকট এতই অপ্রত্যাশিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল যে, সে বেদনায় মূক হয়ে যায়। যন্ত্রণাদগ্ধ , প্রণয়-লাঞ্ছিত, অপমানিত হৃদয়ে চন্দ্রাবতী আজীবন অনূঢ়া থাকার সংকল্প করে এবং পিতার আদেশে ব্যর্থ প্রেমের জ্বালা বিস্মৃত হতে শিবপূজায় মগ্ন থাকে। কিন্তু শিবপূজায় নিমগ্ন চন্দ্রাবতী জয়ানন্দকে মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারে নি। পরবর্তী কালে জয়ানন্দের প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়েই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা অনুশোচনাদগ্ধ জয়ানন্দ যখন চন্দ্রাবতীর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে, তখন চন্দ্রাবতী জয়ানন্দকে সাক্ষাৎ প্রদানের জন্য পিতার অনুমতি কামনা করে। চন্দ্রাবতী কঠিন তপস্যার মধ্যেও জয়ানন্দকে ভুলতে পারেনি। বাস্তবিক

Dhaka University Institutional Repository

প্রেমের জন্য চন্দ্রাবতী যে কৃচ্ছতাসাধন করেছে তার তুলনা মেলা ভার। বিশেষত জয়ানন্দ তাকে আঘাত দেওয়া সত্ত্বেও জয়ানন্দের প্রতি তার দৌর্বল্য শেষ পর্যন্ত অটুট ছিল। ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য যথার্থই মন্তব্য করেছেন " আহত প্রেম নীরব সহিষ্ণুতার ভিতর দিয়া এক নিরস্ত্র কঠোর অভিমানের রূপ লাভ করিয়া কিরূপে 'Sublimity'স্পর্শ করিতে পারে চন্দ্রাবতী তার উজ্জ্বল নিদর্শন।প্রেম এখানে বর্হিজগতকে রুদ্ধ করে আত্ম তন্ময় হয়েছে । মোহভঙ্গের পর জয়ানন্দের করাঘাতও তার তপোভঙ্গ করতে পারেনি। জয়ানন্দের মতো জীবন বিসর্জন না দিয়াও চন্দ্রাবতী তাহার প্রেমের নিষ্ঠার জন্য যে গৌরবের অধিকারিনী হয়েছে , হতভাগ্য চঞ্চলমতি জয়ানন্দ মৃত্যুর মধ্যেও তাহার একাংশের অধিকারী হইতে পারে নাই।"(১০)গাথাটিতে নারীর শক্তি ও পুরুষের দুর্বলতার পরিচয়ই প্রকাশিত হয়েছে।নারীর প্রেমে যে পবিত্রতা আছে,একান্ত নিষ্ঠা আছে,দৃঢ়তা আছে এবং তা দিয়ে সে জীবনের সকল আঘাত জয় করতে পারে চন্দ্রাবতী তার জলন্ত নিদর্শন।জয়ানন্দের চরিত্রে সেই দৃঢ়তা নেই,তার প্রেমে নিষ্ঠা নেই,তাই সে অতি সহজেই পরনারীতে আসক্ত হতে পেরেছিল।অনুতপ্ত জয়ানন্দ শেষ পযর্ন্ত জীবন বিসর্জন দিলেছিল ঠিকই,কিন্তু জীবন বিসর্জন না দিয়েও চন্দ্রবতীর প্রেম পাঠক হৃদয়কে যেভাবে অনুরণিত করেছিল,জীবন বিসর্জন দিয়েও হতভাগ্য জয়ানন্দ তাকে স্পর্শ করতে পারেনি।

কিশোরগঞ্জের গীতিকায় আর এক বীরাঙ্গনা নারীর পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি 'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান' পালায় । দেওয়ান উমর খাঁর কন্যা সখিনা জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান ফিরোজ খাঁর প্রেমে মুগ্ধ হয়ে পিতার অসম্মতিতে তাকে বিয়ে করে। যার ফলে পরবর্তী সময়ে উমর খাঁর সঙ্গে ফিরোজ খাঁর তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ফিরোজ খাঁ পরাজিত হয়ে উমর খাঁর সৈন্যদের হাতে বন্দি হন।বন্দি স্বামীকে উদ্ধার করার জন্য সখিনা পুরুষের বেশ ধারণ করে পিতার রণশক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে তিন দিন অবিরাম যুদ্ধ করে। যুদ্ধের ময়দানে সখিনা যে অলৌকিক শৌর্য্য প্রদর্শন করে তা শুধু বীরত্বের নয় , রমনী হৃদয়ের প্রেমের অমোঘ শক্তির নিদর্শনও বটে। স্বামীকে উদ্ধার করার জন্য সখিনা শত্রুর আগ্নেয়াস্ত্রের সম্মুখীন হয়ে সিংহের ন্যায় বিক্রমে রাতদিন অবিরাম যুদ্ধ করে যে শক্তি ও সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন , পরবর্তীতে স্বামীর তালাকনামা পেয়ে তার সে শক্তি ও সাহস সাথে সাথে চূর্ণ -বিচূর্ণ হয়ে গেল। ভগ্নহৃদয়া সখিনা জ্ঞানশূন্য হয়ে ভূতলে লুটিয়ে পড়ে ইহকালের লীলা সাঙ্গ করল। প্রেমের জন্য আত্মত্যাগ ময়মনসিংহ গীতিকার প্রায় সব নারী চরিত্রে লক্ষ্য করা যায়।কিন্তু স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত হওয়ার ঘটনা একটিই।

সখিনা চরিত্রটি কেবল এ গাথার উৎকৃষ্ট চরিত্রই নয়, সমগ্র ময়মনসিংহ গীতিকায় তার মতো বীর্যবতী রমণীর সাক্ষাৎ দ্বিতীয়টি পাওয়া যায় না। বন্দি স্বামীকে উদ্ধার করার জন্য তিন দিন অবিরাম পিতার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালনা করে সে এমনই পতিভক্তি,বীর্যবত্তা ও সাহসিকতার উদাহরণ সৃষ্টি করেছে যা বাঙালি নারীসমাজের গৌরবের ধন।সখিনার বীর্যবত্তা ও সাহসিকতার সঙ্গে কোমলতার সুসমন্বয়ে তার চরিত্র উচ্চ মহিমায় উন্নীত হয়েছে।

'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান' গাথায় ফিরোজ খাঁ কেন্দ্রীয় চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও নায়িকা সখিনার নিকট তাকে ম্লান মনে হয়েছে। গীতিকার প্রথম পর্যায়ে তার চরিত্রে শাসকসুলভ শৌর্য- বীর্য ও রণ নৈপুণ্য এবং সাহসিকতা প্রদর্শিত হয়েছিল।তিনি তাঁর রণনৈপূণ্য এবং সাহসিকতার পরিচয় দিয়েই উমর খাঁর সঙ্গে যুদ্ধে লড়াই করে সখিনাকে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই বীরত্ব শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ন থাকেনি। কারণ উমর খাঁ যখন দিল্লীর বাদশার সহায়তায় তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালনা করেছে, তখন সে প্রত্যুত্তর দিতে ব্যর্থ হয়েছে। তবে যুদ্ধের জয়- পরাজয় দিয়ে নয়, তার চরিত্রে ত্রুটির প্রকাশ ঘটেছে অন্যভাবে,যে স্ত্রী তাকে মুক্ত করার জন্য ঘর থেকে বের হয়ে পিতার বাহিনীর বিরুদ্ধে তিনদিন অবিরাম যুদ্ধ করেছে,ফিরোজ খাঁ স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারের জন্য শত্রুর সঙ্গে সন্ধি করে সেই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে চরম হীনমন্যতার পরিচয় দিয়েছে। বিশ্বাসঘাতকতার তীব্র আঘাতজনিত কারণে সখিনার মৃত্যু গাথার ট্র্যাজিক পরিণতি যেমন সম্ভব করেছে তেমনই ফিরোজ খাঁ চরিত্রকে করেছে হীন ও কাপুরুষ।

Dhaka University Institutional Repository

একমাত্র 'শ্যামরায়' পালার নায়িকা চরিত্র নায়ক চরিত্র অপেক্ষা কিছুটা অনুজ্জ্বল । তবে ডোম্বী বিবাহিতা নারী । স্বামী ও শাশুড়িকে গোপন করে সে শ্যামরায়ের প্রণয় নিবেদনে যেভাবে সাড়া দিয়েছে তাতে তার সাহসিকতারই পরিচয় মেলে। গাবর রাজার ঘরেও সে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। বুদ্ধি দিয়ে গাবর রাজাকে বশ করে সে প্রণয়ীর দণ্ড প্রত্যাহার করিয়েছে এবং তার প্রতি গাবর রাজার যৌনলালসা চরিতার্থ করার উদ্যোগকে করেছে বিলম্বিত। অন্যদিকে নিচু কূলে জন্ম এবং নিজ অবস্থান সম্পর্কে সচেতনতার ফলেই ডোম বধু শ্যামরায়কে তার প্রণয়বাসনা থেকে প্রথমে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেছে এভাবে :–

"আমিত ডোমের নারীরে বন্ধুরে হাত দিওনা গায়।
ছোটর সঙ্গে বড়র পিরীত বড়র জাতি যায়রে বন্ধু॥"(পূর্ববঙ্গগীতিকা,৩য় খণ্ড,পৃ:২৭৭)

তার মনে স্বাভাবিক আশঙ্কা ছিল যে ধনীর বা উচ্চ শ্রেণীর প্রণয় হয়ত ক্ষণিকের রূপমোহেই সীমাবদ্ধ । কিন্তু শ্যাম রায় তার প্রেম দিয়ে সে আশঙ্কা দূরীভূত করে। ভালবাসায়, অনুরাগে, কল্যাণ-কামনায় ডোম্বীনারী তার সামাজিক অবস্থান ও মানসিকতাকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে। ডোম্বী নারী হয়েও চারিত্রিক মহত্ত্বে , মর্যাদায় সে গৌরবদীপ্ত।সমাজের নীচুশ্রেণীতে অবস্থানরত এ ধরনের নারীর মধ্যে বর্ণ-বিভক্ত সমাজসৃষ্ট সংকীর্ণতা,স্বার্থপরতা ,লোভ লালসা স্বাভাবিকভাবে লক্ষণীয় , কিন্তু এই নারীর ভালবাসা এমনই মহৎ যে উল্লিখিত আচরণসমূহ তার চরিত্রকে কলুষিত করতে পারেনি। স্থূল প্রলোভনে সে গাবর রাজাকে স্বামী হিসাবে বরণ করতে পারত কিংবা যৌন সম্ভোগের স্পৃহায় সে নিহত শ্যামরায়ের সঙ্গে চিতাগ্নিতে সহমরণে নাও যেতে পারত। কিন্তু প্রণয়ে আত্মবিসর্জনের পথই সে নির্বাচন করে। স্বামীর অবর্তমানে যে শ্যামরায়ের সঙ্গে সে একদা রাত্রি যাপন করেছিল এবং তারই সঙ্গে চিতাগ্নিতে সহমরণের মধ্য দিয়ে ডোম্বী নারীর প্রণয়ধর্মে বিস্ময়কর বিশ্বস্ততার পরিচয়ই দিয়েছে।

গীতিকার কোন কোন চরিত্র পুরুষোচিত বীরত্বে উজ্জ্বল। এর মধ্যে শ্যাম রায় ও ঈশা খাঁ চরিত্রটি প্রধান। শ্যাম রায় জমিদারপুত্র হয়ে সাধারণ ডোম বধূর রূপে মুগ্ধ হয়ে তার নিকট প্রণয় নিবেদন করে। সমাজগর্হিত এই প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শ্যাম রায় ডোমবধূকে নিয়ে রাজ্য ত্যাগ করে এবং চরম কষ্টের মধ্য দিয়ে জীবন-যাপন করে। অবশেষে গাবর রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয় শ্যাম রায়কে। সামান্য ডোমবধূর প্রতি প্রণয়ানুরাগ শ্যাম রায়ের এই পরম আত্মত্যাগ, তার প্রণয় মহিমাকে উজ্জ্বল করেছে। অন্যান্য গীতিকায় নারী চরিত্রগুলি অপেক্ষা পুরুষ চরিত্রগুলিকে ম্লান করে দেখানো হয়েছে । কিন্তু শ্যাম রায়ের পালায় কেন্দ্রীয় চরিত্র শ্যামরায় আদ্যন্ত সক্রিয়। শ্যামরায় তার সাহসিকতায়, বীরত্বে,বুদ্ধিমত্তায়,বিশ্বস্ত তায়,আন্তরিকতায়,অনুরাগের দীপ্ততায়,আত্মত্যাগে সবদিক থেকেই ডোম্বী নারীকে অতিক্রম করে গেছে।

'ইশাখাঁ মসদালি' পালায় একমাত্র ঈশাখাঁ চরিত্রটি ছাড়া অন্য কোন চরিত্র বিকশিত হওয়ার সুযোগ ছিল না।ঈশাখাঁ ঐতিহাসিক চরিত্র। তাঁর চরিত্রে শৌর্য-বীর্য এবং বীরত্বের সঙ্গে প্রেমের সমন্বয় দেখানো হয়েছে। সুভ্রদাসুন্দরী রূপ ঈশাখাঁর মনে প্রণয়বাসনার উদ্রেক করে। তিনি সকল প্রতিকূল অবস্থাকে অতিক্রম করে সুভ্রদাসুন্দরীকে ধর্মান্তরিত করে বিয়ে করেন।

'সোনাই বিবি' গাথায় পুরুষ চরিত্র ছৈয়দ বিরাম, চরিত্রে বীরত্ব, সাহসিকতা, কাপুরুষতা, প্রণয়ে একনিষ্ঠতা ও অদূরদর্শিতা প্রভৃতির সমাহার ঘটেছে। প্রণয়ে একনিষ্ঠতার কারণেই সে সোনাই বিবির পত্র পেয়ে দ্রুত তাকে উদ্ধারের জন্য সক্রিয় হয়।নবাব সুজা-নুরার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তার বীরত্ব ও সাহসিকতার যেমন প্রমাণ মেলে তেমনি এ ক্ষেত্রে তার চরিত্রের অদূরদর্শিতার, বাগাড়ম্বতা ও কাপুরুষতারও প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।নিরস্ত্র হাতে সুজা-নুরার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে যাওয়ার মধ্যে , তার আস্ফালনের মধ্যে,অবশেষে নিরস্ত্র লড়াইয়ে অধিক সময় তিষ্ঠাতে না পেরে প্রণয়িনী স্ত্রীকে শত্রুর মুখে ফেলে পলায়নের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

তার ঐ সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়েছে। তবে তুলনামুলকভাবে এখানে সোনাই চরিত্রটি একমাত্র স্বাভাবিক এবং বাস্তবসম্মত হয়েছে।

গীতিকাসমূহে চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে রচয়িতাগণ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ করেছেন।সমাজের বিভিন্ন স্তরের নানা বৈচিত্র্যময় চরিত্রের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে পূর্ব মৈমসিংহের গীতিকা সমূহে। গ্রামীণ পটভূমিতে লালিত রক্তমাংসের মানুষের চরিত্রই গীতিকাগুলোতে উপস্থাপিত হয়েছে।এই সমস্ত বাস্তব ও জীবন্ত চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে গীতিকাগুলোর আবেদন আরো আকর্ষণীয় হয়েছে।

৫.৩ অলঙ্কার প্রয়োগ

গীতিকাগুলোতে পল্লীকবির কবিত্বের ছাপ অপূর্ব। বহু প্রাচীন কাল থেকেই কাব্য বা সাহিত্যে অলঙ্কার প্রয়োগের স্বরূপ দেখতে পাওয়া যায়। যদিও বৈষ্ণব কবিতার লালিত ছন্দ,অপূর্ব শব্দমাধুর্য, শিল্পীর কৌশলযুক্ত গাঁথুনি,প্রভৃতি শিক্ষালব্ধ গুণ নিরক্ষর পল্লীকবির রচনার মধ্যে পাওয়া যায় না,তথাপি অতি সহজ-সরল অমার্জিত ভাষায় ,ছন্দহীন রচনার মধ্যেই পাওয়া যায় অপূর্ব কবিত্বের নিদর্শন। প্রাচীন ও মধ্য যুগের সাহিত্যে ব্যবহৃত অলঙ্কারের উপর নির্ভরশীল না হয়ে পল্লীকবিগণ সমকালীন সমাজ, প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং রচয়িতাগনের স্বীয় জীবনাভিজ্ঞতালব্ধ বস্তু-উপাদান থেকে অলঙ্কার সংগ্রহ করে তারা যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা অপূর্ব মণ্ডিত হয়েছে। নানা রকম উপমা-রূপকের মাধ্যমে কবিগণ মানুষ,মানুষের বহিঃসৌন্দর্য কিংবা অন্তঃসৌন্দর্য, তাদের জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার কথা ব্যক্ত করেছেন।

সাহিত্যে দুই প্রকার অলঙ্কারের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার।শব্দের ধ্বনিমাধুর্যকে আশ্রয় করে যে অলঙ্কারের সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় শব্দালঙ্কার। শব্দালঙ্কার ব্যবহারেও গাথা-রচয়িতাগণের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। ধ্বন্যুক্তি,ধ্বন্যাত্মক শব্দ কিংবা সফল অনুপ্রাস ব্যবহারের মাধ্যমে গীতিকার কাব্যদেহে অর্থদ্যোতনা ও ভাবব্যঞ্জনা সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। গীতিকায় শব্দালঙ্কার প্রয়োগে কবিগণ যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন এখন তা আলোচনার প্রয়াস পাব।

শব্দালঙ্কারঃ কাব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অর্থালঙ্কারের পাশাপাশি শব্দালঙ্কারের গুরুত্বও অনস্বীকার্য। মধ্যযুগীয় সাহিত্যে শব্দালঙ্কারের ব্যাপক বিচিত্র ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। অনুপ্রাস,ধ্বন্যুক্তি,যমক-শ্লেষ ইত্যাদি শব্দালঙ্কারেই অধিক পরিমাণে লক্ষণীয়। তবে বলাবাহুল্য,অনুপ্রাসের বৈচিত্র্যময় ধ্বনিব্যঞ্জনায় গীতিকাসমূহের দেহাবয়ব সুষমাণ্ডিত।শব্দালঙ্কারের মধ্যে প্রধান হল অনুপ্রাস। একটা বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ যদি বারবার বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত হয় তবে তাকে অনুপ্রাস বলে। অনুপ্রাস তিন প্রকার-অন্ত্যানুপ্রাস, বৃত্তানুপ্রাস ও ছেকানুপ্রাস।

গীতিকাসমুহে সব ধরনের অনুপ্রাসের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কবিতার চরণের শেষের শব্দটির সঙ্গে দ্বিতীয় চরণের শেষের শব্দটির ধ্বনি মিল থাকলে অন্ত্যানুপ্রাস হয়। গাথাগুলি পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত বলে অন্ত্যানুপ্রাসের অস্তিত্ব সর্বত্রই বিরাজমান। যেমন-

কি কর লো চন্দ্রাবতী ঘরেতে বসিয়া।
সখিগণ কয় কথা নিকটে আসিয়া। (মৈমনসিংহ গীতিকা,পৃ:১১৩)

Dhaka University Institutional Repository

অথবা,

শুনশুন কুড়া আরে কহি যে তোমারে
পরিচয় কথা কন্যার আন্যা দেও আমারে। (মৈমনসিংহ গীতিকা,পৃ:৫৩)

কিশোরগঞ্জের প্রায় সব গাথা-গীতিকাগুলির আঙ্গিকে এইরূপ অন্ত্যানুপ্রাসের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।গীতিকা সমূহে অন্ত্যানুপ্রাসের প্রভাব এত ব্যাপক ও সাবিক যে উদ্ধৃতি উল্লেখ অপ্রয়োজনীয়। প্রতিটি পংক্তিতেই অন্ত্যানুপ্রাসের স্পষ্ট চিহ্ন বর্তমান।

বৃত্তানুপ্রাসের ব্যবহারও দুর্লক্ষণীয় নয়।বৃত্তানুপ্রাসে একটি ব্যঞ্জন বর্ণ বা একটি ব্যঞ্জনগুচ্ছ একাধিকবার ক্রমানুসারে সংযুক্ত বা বিযুক্ত ভাবে ধ্বনিত হয়। যেমন-

বনের কোড়া মনের কোড়া জন্মকালের ভাই। (মৈমনসিংহ গীতিকা,পৃ:৮৮)
অথবা
কিসের ছান কিসের পানি কিসের জল ভরা।(মৈমনসিংহ গীতিকা,পৃ:৫৮)

প্রথম উদাহরণটিতে 'র' ধ্বনি এবং 'কোড়া' শব্দটি পরপর দু'বার এবং দ্বিতীয় উদাহরণটিতে 'কিসের' শব্দটি পরপর তিনবার ক্রমানুসারে ব্যবহৃত হয়ে চমৎকার ধ্বনিমাধুর্যের সৃষ্টি করেছে।
দুটো বা তার বেশী বর্ণগুচ্ছ যদি পর পর মাত্র দু'বার ধ্বনিত হয় তবে তাকে ছেকানুপ্রস বলে। যেমন-

টিক্কা না জ্বালাইয়া বিনোদ হুক্কায় ভরে। (মৈমনসিংহ গীতিকা,পৃ:৪৯)

এখানে 'ক্ক' বর্ণগুচ্ছ পর পর দুবার ব্যবহৃত হয়েছে।

আবার কবিতার প্রথম পংক্তির প্রথম শব্দের সাথে দ্বিতীয় পংক্তির প্রথম শব্দের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হলে তাকে আদ্যানুপ্রাস বলে। গীতিকাগুলিতে আদ্যানুপ্রাসও লক্ষ করা যায়।

যেমন-আমার সোয়ামী সে যে পবর্বতের চূড়া।
আমার সোয়ামী যেমন রণ-দৌড়ের ঘোড়া॥ (মৈমনসিংহ গীতিকা,পৃ:৭৫)

তাছাড়া গীতিকাগুলিতে কবিগণ একই শব্দ বা শব্দগুচ্ছকে বারংবার ব্যবহার করে চমৎকার অর্থদ্যোতনার সৃষ্টি করেছেন।যেমন-

১.পৌষ মাসে পোষা আন্ধি দেশাচারে দোষ।(মৈ.গী.পৃ:৬২)
২.কিবা মুখ কিবা সুখ ভুরুর ভঙ্গিমা। (মৈ.গী.পৃ:৬৯)
৩.একবার দুইবার তিনবার করি।
পত্রপড়ে চন্দ্রাবতী নিজ নাম স্বরি॥ (মৈ.গী.পৃ:১১৬)
৪.এক দিন দুই দিন তিন দিন যায়। (মৈ.গী.পৃ:১১৩)
৫.আধা কলসী ভরা দেখি আধা কলসী খালি।(মৈ.গী.পৃ:৫৫)
৬.দেব পূজার ফুল তুমি তুমি গঙ্গার পানি। (মৈ.গী.পৃ:১১৭)

Dhaka University Institutional Repository

৭.কান্দিয়া কান্দিয়া তবে যায় খেলারাম। (মৈ.গী.পৃ:১৯৫)

এরূপ বহু উদাহরণ গীতিকাগুলি থেকে উদ্ধৃত করা যাবে।যেখানে একই শব্দ বা শব্দগুচ্ছের বারংবার ব্যবহারের ফলে অর্থদ্যোতনার সঙ্গে সঙ্গে চমৎকার ধ্বনিমাধুর্যের সৃষ্টি হয়েছে।

কাব্যে অর্থকে আশ্রয় করে যে অলঙ্কার হয় তাকে বলা হয় অর্থালঙ্কার।এই অলঙ্কারে শব্দ বা শব্দাবলীর অর্থই প্রথম এবং প্রধান। সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও ভাবসৌন্দর্য সৃজনে অর্থালঙ্কারের ভূমিকাই প্রধান। উপমা,রূপক,উৎপ্রেক্ষা,সমাসোক্তি,ব্যতিরেক,অপহ্নুতি ইত্যাদি অলঙ্কারের প্রয়োগ সর্বাধিক। অর্থালঙ্কারের বৈচিত্র্যময় প্রয়োগ গীতিকাগুলির ভাবসৌন্দর্য সাধনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। গীতিকায় অর্থালঙ্কারের প্রয়োগ উজ্জ্বলতর নান্দনিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। গীতিকায় অর্থালঙ্কার প্রয়োগে কবিগণ যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন এখন তা আলোচনা করার প্রয়াস পাব।

উপমা : সাহিত্যকে মধুর,হৃদয়গ্রাহী, সরস ও জীবনানুগ করার ক্ষেত্রে উপমার ভূমিকা নি:সন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। উপমার যর্থাথ প্রয়োগে একদিকে যেমন রচয়িতার সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি; জগৎ ও জীবন সর্ম্পকে গভীরতর বাস্তব উপলব্ধি ও শৈল্পিক দক্ষতার প্রমাণ মেলে তেমনি সফল উপমার ব্যবহারে একটি নির্দিষ্ট এলাকার জনগোষ্ঠীর জীবন-যাত্রা, সমাজ-সংস্কৃতির পরিচয়ও পরিস্ফুট হয়। তাই উপমা সাহিত্যের অত্যন্ত প্রভাবশালী অলঙ্কার। কিশোরগঞ্জের প্রাপ্ত গীতিকাগুলিতে উপমা ব্যবহারের চমৎকারিত্ব,উৎকর্ষ ও প্রভাবময়তা সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

গীতিকায় রচয়িতাগণ তাদের প্রাত্যহিক জীবনাভিজ্ঞতা থেকে উপমান সংগ্রহ করেছেন। তাই উপমা প্রয়োগের মধ্য দিয়েই তাদের জীবন-যাত্রার পরিচয় বিধৃত হয়ে ওঠে। গাথা-গীতিকার অধিকাংশ উপমাই ব্যবহৃত হয়েছে নায়িকার রূপ বর্ণনায়। দেখা গেছে প্রায় প্রতিটি গীতিকায়ই নায়িকার রূপ বর্ণনায় কবিগণ নানা রকম উপমা প্রদান করেছেন। যেমন-

১দেখিল সুন্দর কন্যা জল লইয়া যায়।
মেঘের বরণ কন্যার কেশ গায়েতে লুটায়।
এইত না কেশ কন্যার লাখ টাকার মূল।
শুকনা কাননে যেন মহুয়ার ফুল॥
(মৈমনসিংহ গীতিকা-৫৩)

২.আবে করে ঝিলিমিলি সোনায় ঢাকা।
প্রভাত কালে আইল অরুণ গায়ে হলুদ মাখা॥
(মৈমনসিংহ গীতিকা-১০৫)

৩.চলনে খঞ্জন নাচে বলনে কুকিলা।
জলের ঘাটে গেল কন্যা জলের ঘাট লালা।(মৈমনসিংহ গীতিকা-১১১)

৪.সোনার বরণ কন্যা চম্পক বরণী। (পূর্ববঙ্গ গীতিকা,২য় খণ্ড,২য় সংখ্যা-৮৬)

Dhaka University Institutional Repository

৫.মমিনা খাতুন তার কন্যা একজন।
এমন সুন্দর যেন আসমানের চান। (পূর্ববঙ্গ-গীতিকা,২য় খণ্ড,পৃ:৮৬)

৬.মুখখান যেমন তার পুন্নমাসীর চাদঁ।
চৌক জিনিয়া যেন মিড়কের নয়ান॥ (পূর্ববঙ্গ-গীতিকা,২য় খণ্ড,২য় সংখ্যা,পৃ:৮৬)

৭.চিকচিক কালা কেশ আঠুভারাইয়া।
শরীরের রং যেমন পাক্না সরবী কলা।
(পূর্ববঙ্গ-গীতিকা,২য় খণ্ড,২য় সংখ্যা,পৃ:১৩০)

৮.পরথম যৈবন কন্যা অঙ্গ ঢলঢল।
বয়ান শোভিছে যেমন ফুটা পউদের ফুল। (পূর্ববঙ্গ গীতিকা,পৃ:১৩০)

৯.বইয়া আছে সখিনা বিবি পালঙ্ক উপর।
চান্দ জিনিয়া রূপ দেখিতে সুন্দর।
মেঘ ভাঙ্গা চুল কন্যার পালঙ্কে লুটায়।
সেই রূপ দেখ্যা দরিয়া করে হায় হায়। (পূর্ববঙ্গ গীতিকা,পৃ:১৩৮)

১০.দেব পূজার ফুল তুমি তুমি গঙ্গার পানি।
আমি যদি ছুই কন্যা হইবা পাতকিনী। (মৈমনসিংহ গীতিকা,পৃ:১১৭)

উপর্যুক্ত চরণগুলোতে নায়িকার রূপবর্ণনায় পল্লীকবিগণ যে অপূর্ব নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তার প্রমাণ পওয়া যায়। প্রথম উদাহরণে মলুয়ার রূপের বর্ণনা করা হয়েছে। মলুয়ার ঘন-কালো চুলকে তুলনা করা হয়েছে মেঘের সঙ্গে এবং এই চুলকে কবি লক্ষ টাকার মূল্য বলে মনে করেন।চুলের রূপ বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে মলুয়াকে শুকনা কাননে মহুয়ার ফুল বলে অভিহিত করেছেন। এখানে দুর্ভিক্ষতাড়িত চাঁদবিনোদ শিকারের উদ্দেশ্যে আড়ালিয়া গ্রামে এসে উপস্থিত হয়। ক্ষুর্ধাত ও ক্লান্ত বিনোদ মলুয়ার গ্রামে পুকুর ঘাটে এসে নিদ্রা যায়।মলুয়ার জলভরনের শব্দে বিনোদের নিদ্রা ভঙ্গ হলে মলুয়াকে দেখতে পায়। দুর্ভিক্ষতাড়িত বিনোদের অবস্থাকে এখানে শুকনা কানন এবং মলুয়াকে মহুয়া ফুলের সাথে তুলনা করা হয়েছে।অন্যত্র মলুয়ার রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বলেছেন-

কিবা মুখ কিবা সুখ ভুরুর ভঙ্গিমা।
আন্ধাইর ঘরেতে যেমন জ্বলে কাঞ্চাসোনা॥ (মৈমনসিংহ গীতিকা,পৃ:৬৯)

এখানে কাঁচা সোনার দীপ্তির সঙ্গে নায়িকার দেহবর্ণের উজ্জ্বলতার তুলনা করা হয়েছে। কিন্তু অভিনবত্ব ঘটেছে এর প্রথম পংক্তির বাচনভঙ্গিতে।ভ্রুভঙ্গিকে কোনো কিছুর সঙ্গে তুলনা করা হয়নি, কিন্তু বলার ভঙ্গিতে আমরা তার অপূর্ব সৌন্দযের দীপ্তি যেন প্রত্যক্ষ করি।

দ্বিতীয় উদাহরণটিতে প্রভাত কালে পূজার ফুল তুলতে আসা চন্দ্রাবতীকে অভ্রভেদ করা সূর্যের হলুদ রঙের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

তৃতীয় উদাহরণটিতে চমৎকার একটি উপমার প্রয়োগ করা হয়েছে। এখানে খঞ্জনা পাখির চঞ্চলতার সঙ্গে নায়িকার চলা এবং কোকিলের মধুর কণ্ঠের সঙ্গে নায়িকার কণ্ঠস্বরের তুলনা করা হয়েছে।পঞ্চম

Dhaka University Institutional Repository

উপমাটি গতানুগতিক।সুন্দরী রমণীর মুখের সঙ্গে চাঁদের তুলনা মধ্যযুগীয় কবিদের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল।মধ্যযুগীয় গীতিকাগুলিতে এর ব্যতিক্রম হয়নি।'ইসা খাঁয়ে মসনদালি' পালায় মমিনা খাতুনের রূপকে এখানে আকাশের চাঁদের সাথে তুলনা করা হয়েছে।সপ্তম উদাহরণটিতেও তারেই পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়।এখানে মমিনা খাতুনের মুখকে পূর্ণিমার চাঁদ এবং তার চোখকে হরিণের চোখের সাথে তুলনা করা হয়েছে।অষ্টম উদাহরণটি কিছুটা অভিনব।এখানে সাখিনার গায়ের রংকে কবি তুলনা করেছেন পাকা সরবী কলার সাথে এবং তার মুখকে তুলনা করেছেন ফুটন্ত পদ্ম ফুলের সাথে। দশম উদাহরণে নায়িকার রূপ নয়, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তার শুভ্রতা ও পবিত্রতাকে উপমিত করা হয়েছে দেব পুজার ফুল ও গঙ্গার পানির সঙ্গে। পূর্বেই উল্লেখ করা হযেছে, পল্লী কবিগণ তাদের পল্লীজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বিভিন্ন উপাদানকে উপমান হিসাবে ব্যবহার করেছেন। তাই এখানে উপমান হিসাবে সরবী কলা এবং পদ্ম ফুলের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

উপর্যুক্ত উদাহরণসমূহে নারীর রূপ-মাধুর্য স্বল্পশিক্ষিত পল্লীকবির স্বভাবসুলভ সাদামাটা ভাষায় বর্ণিত হয়েছে-যা আমাদের হৃদয়-মনকে খুব সহজেই আকৃষ্ট করে।এই সব সাধারণ পল্লীকবিগণ কখনোই ধ্রুপদী কলাকৈবল্যবাদে পারদর্শী ছিলেন না। কিন্তু দেখা যায় যে, কবিগণ তাদের অজান্তেই মাঝে মাঝে অলঙ্কার শাস্ত্র সম্মত উপমা ব্যবহার করে নারীর অনুপম সৌন্দর্যকে বর্ণনা করেছেন।

পল্লীকবিগণ সহজ-সরল নিরাভরণ অকৃত্রিম ভাষায় মধ্যযুগের গীতিকাগুলিকে অধিকতর অলংকৃত করে সাহিত্য মর্যাদায় তাদেরকে উচ্চাসনে উপবিষ্ট করিয়েছেন। নায়িকাবৃন্দের সৌন্দর্যবর্ণনায় কবিগণ যে কেবল উন্নত সাহিত্যিক রুচিবোধের পরিচয় দিয়েছেন তা নয় , বরং তার প্রচ্ছায়ায় বাংলার পল্লী প্রকৃতিও শিল্প সম্মতভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে ঃ

১. জলের যে ঘাট তাতে হইল পশর।
চান্দ যেমন ঝিলমিল করে পানির ভিতর রে॥ (পূর্ববঙ্গ গীতিকা,পৃ:১৩৪)

২. পরথম যৌবন কন্যা অঙ্গ ঢলঢল।
বয়ান শোভিছে যেমন ফুটা পউদের ফুল।(পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা,২য় খন্ড,২য় সংখ্যা,পৃ:১৩০)

শুধু নায়িকার রূপবর্ণনাতেই কবিগণ উপমার ব্যবহার করেননি, কোন কোন ক্ষেত্রে নায়কের সৌন্দর্য বর্ণনা করতেও কবিগণ চমৎকার উপমার প্রয়োগ করেছেন। যেমন – মলুয়া পালায় নিদ্রমগ্ন বিনোদের রূপে প্রথম দর্শনের মলুয়ার মনে প্রেমানুভূতির জন্ম দেয়।

ভিন দেশী পুরুষ দেখি চান্দের মতন।
লাজ রক্ত হইল কন্যার পরথম যৌবন॥ (মৈমনসিংহ গীতিকা,পৃ:৫৪)

পুরুষের সৌন্দর্য তার শৌর্য-বীর্য ও বীরত্বে। তাই তাদের সেই সৌন্দর্য বর্ণনা করতে কখনো কখনো পৌরাণিক চরিত্র কার্ত্তিকের সঙ্গে উপমিত করা হয়েছে।

চম্পাতলার সোনাধর এক পুত্র তার।
দেখিতে সুন্দর পুত্র কার্ত্তিক কুমার॥ (মৈমনসিংহ গীতিকা,পৃ:৬৩)

'চন্দ্রাবতী' পালায় মৃত জয়ানন্দের দৈহিক সৌন্দর্য বণর্না করার জন্য চমৎকার উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগ করেছেন-

Dhaka University Institutional Repository

দেখিতে সুন্দর নাগর চান্দের সমান।
ঢেউয়ের উপরে ভাসে পুন্নমাসীর চান॥ (মৈমনসিংহ গীতিকা,পৃ:১১৮)

নর-নারীর দেহসৌন্দর্য ও রূপময়তাকে অধিকতর অনুভূতিময় করে তোলার জন্য পল্লীকবিগণ তাদের প্রাত্যহিক জীবন থেকে ,কখনো কখনো পুরাণ উৎস থেকে এইভাবে নানারকম উপাদনের শরণাপন্ন হয়েছেন।

উপমা ও রূপক পর্যায়ের আলোচনায় আমরা ইতিমধ্যে চাঁদের বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহার লক্ষ্য করেছি। উল্লিখিত উপমাগুলি ছাড়াও চাঁদের আরো ব্যাপক ব্যবহার গীতিকাগুলিতে লক্ষ্য করা যায়।যেমন-

১.মুখখান যেমন তার পুন্নমাসীর চান। (পূর্ব্ববঙ্গ:মৈমনসিংহ-গীতিকা,পৃ:৮৬)
২.জলের যে ঘাট তাতে হইল পশর।
চান্দ যেন ঝিলমিল করে পানির ভিতরে।
(পূর্ববঙ্গ গীতিকা,২য় খণ্ড,২য় সংখ্যা,পৃ:১৩৪)

৩. আস্যা দেখে সোনার চাঁদ জমীনে লুঠায়।
তারে দেখ্যা উমর খাঁ করে হায় হায়।। (পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা,প্রাগুক্ত,পৃ:১৫৬)

৪.ভাঙ্গা ঘরে চান্দের আলো আন্ধাইর ঘরের বাতি। (মৈমনসিংহ গীতিকা,পৃ:৯৮)

বাড়ী-ঘরের সৌন্দর্য বর্ণনায়ও চাঁদের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়–

চাঁদের সমান পুরী ঝলমল করে।
এমন সর না আইল দুনিয়া মাঝারে॥ (পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা,প্রাগুক্ত,পৃ:৯৪)

চাঁদের ভিন্নরূপ ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়,যেমন-চাঁদের চিত্রকল্পময় ব্যবহার

দেখিতে সুন্দর নাগর চান্দের সমান।
ঢেউয়ের উপরে ভাসে পুন্নমাসীর চান॥ (মৈমনসিংহ গীতিকা,প্রাগুক্ত,পৃ:১১৮)

নদীজলে ঢেউয়ের ওপর পূর্ণিমার চাঁদের প্রতিবিম্ব ও তার আলোর ঝিকিমিকি যে চমৎকার চিত্রকল্প রচনা করেছে, তার বর্ণনা রয়েছে উপর্যুক্ত পংক্তিতে। "জয়ানন্দের[চন্দ্রাবতী] মৃতদেহের সৌন্দর্য বর্ণনায় চাঁদ উপমিত হয়ে এই উপমান চিত্রকল্পের সৃষ্টি করেছে। দেহসৌন্দর্য রূপায়িত করার জন্য চাঁদের উজ্জ্বলতা, সৌন্দর্য প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু এই ব্যবহারের মধ্যেও প্রকারভেদ লক্ষণীয়। চাঁদের সৌন্দর্য দুর্লভ এবং ধরা-ছোঁয়ার বাইরে,কেননা তার অবস্থান মর্ত্য থেকে বহুদূরে। একারণে চাঁদ কোন কোন ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের শাসকশ্রেণীর আভিজাত্যেরও প্রতীক হয়ে উঠেছে। লোকায়ত মানুষের বাস মর্ত্যে। মর্ত্যের মানুষ যেমন আকাশের চাঁদ ধরতে পারে না, লোকায়ত মানুষের সঙ্গে উচ্চবিত্ত জমিদার পরিবারের সঙ্গে সম্বন্ধস্থাপনের বিষয়টিও বৈষম্যমূলক সামাজিক ব্যবস্থার কারণে অসম্ভব।'(১১) আর কেউ যদি সে অসম্ভবকে সম্ভব করার প্রয়াস চালাল তার জন্য তাকে অস্বাভাবিক মূল্য দিতে হয়। 'শ্যামরায়'গাথায় ডোম-বধূর নিকট জমিদার পুত্র শ্যাম রায় প্রণয় নিবেদন করলে ডোম-বধূর মুখ থেকে এই অসম্ভবের কথা উচ্চারিত হতে দেখা যায়:

Dhaka University Institutional Repository

রাজার ছাওয়াল বন্ধুরে পুন্নমাসীর চান
আসমান ছাইড়া কেন বন্ধু জমিনে বিছানরে বন্ধু॥"
(পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা,৩য় খণ্ড,২য় সংস্করণ,পৃ:২৭৮)

চান্দের সঙ্গে সাফলার পিড়ীত রে বন্ধু উজাত সুতে ভাসা।
ছোটর সঙ্গে করলে পিরীত জাতিকূল নাশারে বন্ধু॥
(পুর্ব্ববঙ্গ গীতিকা,৩য় খণ্ড,২য় সংস্করণ,পৃ:২৭৮)

এমন সহজ-সরল-নিরাভরণ গ্রাম্য ভাষায় সরলা পল্লীবালার এই যে আকুতি তা নিশ্চযই যে কোন মানুষের হৃদয়ে আঘাত করবে।

গীতিকায় নর-নারীর দেহ-সৌন্দর্য, রংয়ের উজ্জ্বলতা, দুর্লভ সামগ্রী, দুর্লভ সৌন্দর্য প্রভৃতি নির্দেশ করার জন্য চাঁদের উপমান হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। তৎকালীন সমাজে গ্রামীন পটভূমিতে অন্ধকার রাতে চাঁদের আলো ছিল দুর্লভ এবং আকর্ষনীয়। তাই পল্লীকবিগণ যে কোন মূল্যবান বস্তুর উপমা প্রদানে চাঁদের ব্যবহার করেছেন।

উপমার সঙ্গে সঙ্গে রূপক অলংকারের প্রয়োগ গীতিকাগুলিতে দেখতে পাওয়া যায়। রূপক অলংকারে উপমেয় বস্তু পুরোপুরি অস্বীকার্য না হলেও অপ্রধান করে তোলা হয় এবং উপমানকেই প্রধান করে কেবল তার ধর্ম প্রকাশ করা হয়। গুণ বা ক্রিয়ার বর্ণনা থেকেই এই প্রাধান্য পরিস্ফুট হয়। অধিকাংশ গাথায় প্রাত্যহিক জীবনমূল্য থেকেই রূপকালঙ্কারে উপমান বস্তু আহৃত হয়েছে। যেমন মলুয়া পালায় কাজির কর্মপ্রবৃত্তিকে কুকুরের লোভের সঙ্গে রূপকায়িত করা হয়েছে ঃ

দুষমন কুকুর কাজি পাপে দিল মন ।
ঝাটার বাড়ী দিয়া তারে করতাম বিরম্বন। (মৈমনসিংহ গীতিকা,পৃ:৭৬)

রূপক অলঙ্কারের মতো গীতিকাগুলিতে সমাসোক্তি অলঙ্কারের প্রয়োগও কিছু কিছু লক্ষ্য করা যায়। সমাসোক্তি অলঙ্কারের চেতন বস্তুর উপর অচেতন বস্তুর বা অচেতন বস্তুর উপর চেতন বস্তুর ধর্মারোপ করা হয়। যেমন –

পবনের মত কোশা পংখী উড়া দিলা।
(পূর্ব্ববঙ্গ:মৈমনসিংহ গীতিকা,প্রাগুক্ত,পৃ:১১৩)

উপমেয় বস্তু ও উপমান বস্তু অভেদ সিদ্ধ হওয়ার ফলে উপমেয় বস্তু পুরোপুরি লুপ্ত হলে, কিংবা এরূপ বর্ণনা কল্পনাশ্রয়ে যে কোন প্রকার লৌকিক সীমা অতিক্রম করলে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হয়। মলুয়া পালায় এমন একটি উদাহরণ পাওয়া যায় –

রাজার দোসর সেই আমার সোয়ামী॥
আমার সোয়ামী সে যে পর্ব্বতের চূড়া।
আমার সোয়ামী যেমন রণ দৌড়ের ঘোড়া॥
আমার সোয়ামী যেমন আসমানের চান। (মৈমনসিংহ গীতিকা,পৃ:৭৫)

Dhaka University Institutional Repository

গীতিকাগুলিতে নারীর দেহসৌন্দর্য বর্ণনা , নর-নারীর প্রণয়ঘন সংলাপ উচ্চারণ, কিংবা তাদের প্রণয়াবেগ ও প্রণয়যন্ত্রণা, পূর্বরাগ-অনুরাগ ও বিরহ-মিলনের প্রকাশের ক্ষেত্রে রচয়িতাগণ যে ভাষাভঙ্গি ব্যবহার করেছেন, তা কেবল অলংকার সমৃদ্ধই নয়, গভীরতর ভাবব্যঞ্জনামূলক ও অর্থদ্যোতনাময়। ব্যঞ্জনাধর্মী উক্তির কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হল-

১.ভিন দিশী পুরুষ দেখি চান্দের মতন।
লাজ-রক্ত হইল কন্যার পরথম যৌবন॥ (মৈমনসিংহ গীতিকা,পৃ:৫৪)

২. লাজেতে হইল কন্যার রক্তজবা মুখ।
পরথম যৌবন কন্যার এই পরথম সুখ॥(পূর্ব্ববঙ্গ:মৈমনসিংহ গীতিকা,প্রাগুক্ত,পৃ:৩৯)

৩.ভাঙ্গা ঘরের চান্দের আলো আন্ধাইর ঘরের বাতি।
তোমারে না ছাইড়া থাকিতাম এক দিবারাত্রি॥ (মৈমনসিংহ গীতিকা,পৃ:৯৮)

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে জানা যায়, পল্লীকবিগণ প্রকৃতি-প্রেম ও নারীর সৌন্দর্যকে আরো প্রাণময় করে তোলার জন্যই নানারকম অলংকারের প্রয়োগ করেছেন।সাধারণ পল্লীকবির স্বাভাবিক কবিত্বস্পর্শে পল্লী উপাদানে অলংকৃত হয়ে তা বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব ঐশ্বর্যে পরিণত হয়েছে।গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে,উপমা,উৎপ্রেক্ষা,সন্দেহ,রূপক,অতিশয়োক্তি ইত্যাদি অথার্লঙ্কার এবং অনুপ্রাস,যমক,শ্লেষ,বক্রোক্তি ইত্যাদি শব্দালঙ্কারের অনুসন্ধানও লাভ করা যায়।তবে অর্থালঙ্কারের ক্ষেত্রে উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও রূপক ব্যবহারে গাথা রচয়িতাগণ যত সিদ্ধহস্ত,সমাসোক্তি, ভ্রান্তিমান, ব্যতিরেক, অপহ্নুতি,অতিশয়োক্তি প্রভৃতি নির্মাণে তত সফল নন।

৫.৪ *গীতিকায় প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার* ঃ

গীতিকাসমূহে প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার বহুলাংশে লক্ষ্য করা যায়।শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার ব্যবহারে গীতিকা রচয়িতাগণ যেমন সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন,তেমনি গীতিকায় প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহারেও রচয়িতাগণ যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।লোকায়ত জীবনপ্রবাহের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে জড়িত এসব প্রবাদ-প্রবচনকে গীতিকা রচয়িতাগণ কখনো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে পরিস্ফুট করার জন্য, কখনো তাদের মনোজাগতিক চিন্তাসমূহকে প্রকাশ করার জন্য,কখনও কোন একটি ঘটনাকে আরও সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করার জন্য ব্যবহার করেছেন। নিম্নোদ্ধৃত তালিকা থেকে এসব প্রবাদ-প্রবচনের পরিচয় পাওয়া যায়।

১.বাড়ীর শোভা বাগবাগিচা ঘরের শোভা বেড়া। (মৈমনসিংহ গীতিকা,পৃ:৭১)
কুলের শোভা বউ-শাশুড়ীর বুক জুড়া

২.আসমান ভাঙ্গিয়া পড়ে মাথার উপরে। (মৈমনসিংহ গীতিকা,পৃ:৭৭)

৩.কাটা ঘায়ে লুনের ছিটা আর কত সয়। (মৈমনসিংহ গীতিকা,পৃ:৮১)

৪.হরিণা পড়িল যেমন বাঘের কামরে । (মৈমনসিংহ গীতিকা,পৃ:৮৫)

Dhaka University Institutional Repository

৫.শুন্য ঘর পইড়্যা রইছে নাহিক সুন্দরী। (মৈমনসিংহ গীতিকা,পৃ:৮৭)
রাবণে হরিয়া নিছে শ্রীরামের নারী॥

৬.বিনা মেঘে হইল যেন শিরে বজ্রাঘাত। (মৈমনসিংহ গীতিকা,পৃ:১১৩)

৭.অমৃত ভাবিয়া আমি খাইয়াছি গরল। (মৈমনসিংহ গীতিকা,পৃ:১১৫)

৮.চোরা নাহি শুনে দেখ ধর্মের কাহিনী।
পিশাচে না শুনে রাম অন্তরেতে গ্লানি॥ (মৈমনসিংহ গীতিকা,পৃ:২০১)

৯.বড়র মান বড়য় জানে অন্যে জানব কি। (পূর্ব্ববঙ্গ:মৈমনসিংহ-গীতিকা,পৃ:৮৩)
কুত্তায় না জানে ভাইরে কিবা চিজ ঘি॥

১০.যার ভয়ে বাঘে ভৈষে এক ঘাটে খায় পানি রে॥(পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা,পৃ:১২৩)

উদ্ধৃত প্রবাদসমূহ সংক্ষিপ্ত কথায় অত্যধিক ভাব ব্যক্ত করে সাহিত্যগুণসম্পন্ন হয়ে উঠেছে।কারণ প্রবাদের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যই হলো যে তা সরল,সরস,সংক্ষিপ্ত,অভিজ্ঞতাসম্ভূত ও বস্তুনিষ্ঠ ব্যঞ্জনাময়। পল্লীকবি গণ গ্রামের সহজ-সরল মানুষের জীবনের অন্তর্নিহিত সুখ-দু:খ-আনন্দ-বেদনা প্রকাশনার্থে গ্রাম্য প্রবাদ-প্রবচন ও বিশিষ্টার্থক শব্দকেও অভিনব কৌশলে প্রয়োগ করে একদিকে যেমন ভাষায় সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছেন -অন্য দিকে পল্লীকেন্দ্রিক সমাজ-জীবন ও নানা সমস্যা উদঘাটিত করে আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন।

গীতিকাসমূহে ছন্দপ্রয়োগের ক্ষেত্রে কবিগণ এখানে লোক-সাহিত্যের ঐতিহ্যপূর্ণ পয়ার ছন্দের আশ্রয় নিয়েছেন।তবে কখনো কখনো পয়ারের ছন্দমিল রক্ষা করতে তারা ব্যর্থ হয়েছেন।কারণ,স্বল্পশিক্ষিত কবিগণ একটি বিশেষ আঞ্চলিক ভাষার সীমাবদ্ধ শব্দভাণ্ডার থেকে প্রয়োজনীয় শব্দ আহরণ করতে না পারায় অনিচ্ছাকৃত ছন্দপতন ঘটেছে বলে মনে করা হয়।আর এর মধ্যদিয়েই গীতিকাসমূহের অকৃত্রিমতা ও প্রামাণিকতা আর একবার প্রমাণিত হয়।

তথ্যনির্দেশ

১ ক্ষেত্রগুপ্ত-প্রাচীন কাব্য:সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন,গ্রন্থ নিলয়,কলিকাতা,প্রথম প্রকাশ,১৩৬৬,পৃ:১৬৫
২.আশুতোষ ভট্টাচার্য,বাংলার লোক-সাহিত্য,১ম খণ্ড,পৃ:৪১৩।
৩.আশুতোষ ভট্টাচার্য,বাংলার লোক-সাহিত্য,১ম খণ্ড,পৃ:৪৩৬।
৪.আশুতোষ ভট্টাচার্য,বাংলার লোক-সাহিত্য,১ম খণ্ড,পৃ:৪১৮।
৫.সৈয়দ আজিজুল হক-ময়মনসিংহের গীতিকা জীবন ধর্ম ও কাব্যমূল্য,পৃ:২৭৩-২৭৪।
৬.সৈয়দ আজিজুল হক-ময়মনসিংহের গীতিকা জীবন ধর্ম ও কাব্যমূল্য,পৃ:৩৩০।
৭.মো:শহীদুর রহমান -ময়মনসিংহ গীতিকা নারী চরিত্রের স্বরূপ,পৃ:৭৫।
৮.সৈয়দ আজিজুল হক-ময়মনসিংহের গীতিকা জীবন ধর্ম ও কাব্যমূল্য,পৃ:১৬২।
৯.আশুতোষ ভট্টাচার্য -বাংলার লোক-সাহিত্য,১ম খণ্ড,পৃ:৪১০।
১০.আশুতোষ ভট্টাচার্য,বাংলার লোক-সাহিত্য,১ম খণ্ড, পৃ:৪১
১১.সৈয়দ আজিজুল হক ,ময়মনসিংহের গীতিকা জীবন ধর্ম ও কাব্যমূল্য,পৃ:৪০৩

Dhaka University Institutional Repository

৬ .লোকসাহিত্যের অন্যান্য ধারার সাহিত্যিক মূল্য

লোকসংগীত ঃ কিশোরগঞ্জের লোকসংগীতের খ্যাতি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত । জারি , সারি , ভাটিয়ালি, ঘাটু , ইত্যাদি নানা রকম গানে কিশোরগঞ্জের লোকসংগীতের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ। তবে ভাটিয়ালিগানই এখানকার লোকসংগীতকে বহুদূর পর্যন্ত নিয়ে গেছে।আশুতোষ ভট্টাচার্য ভাটিয়ালি গানকে লোকসংগীতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করেছেন। (১)

এই ভাটিয়ালি গানের জন্মই হয়েছে নদী-নালা বেষ্টিত কিশোরগঞ্জের হাওর অঞ্চলে। নদীর তীরে বাস করে যে সমস্ত চাষী বা মাঝি , তারা তাদের আনন্দ বেদনার সকল কথাই এই ভাটিয়ালি গানের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করে থাকে। নিরক্ষর চাষী ও মাঝির, সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা, প্রেম- ভক্তি, ভালবাসার কথা একেবারেই সাদা-মাটা ভাষায়, সহজ- সরল সৌন্দর্যে ভাটিয়ালি গানে ফুটে ওঠে।এ গানে কোন তত্ত্বকথা বা দর্শন থাকে না, থাকে কেবল গায়কের মনের কিছু আবেগ। গায়ক নিজের খেয়াল-খুশিমতো কথা বসিয়ে দিয়ে তার সে আবেগকে প্রকাশ করে। তাই ভাটিয়ালি গান প্রায়ই নিরলংকৃত হয়ে থাকে। বহু তত্ত্বকথা সমৃদ্ধ বাউলগানের কাব্যসৌন্দর্য এখানে অনুপস্থিত।তবে এ গানের ভাব ও ভাষা নিরলংকৃত হলেও এর প্রাণ খুঁজে পাওয়া যায় সুরে। ভাটিয়ালি গানের সুর মন-প্রাণ কেড়ে নেওয়ার মত। কোন প্রকার ছন্দের বন্ধনে এই সুরকে আবদ্ধ করা যায় না।অশিক্ষিত লোক-মুখের জীবনঘেষাঁ ভাব ও আবেগ , তাদের জীবনের গড়ন-ভাঙ্গন , তারই নির্যাস এই সুর। এই সুর মাঠের , নদীর , বাতাসের সঙ্গে একান্ত নিবিড় ভাবেই কল্লোলিত।

কথা,সুর ও গঠনগত দিক থেকে জারি ও সারিগানগুলি ভাটিয়ালিগান থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র। এই গানগুলির কথা যাই হোক না কেন,এর সুর ও ছন্দে থাকে চমৎকার ধ্বনিমাধুর্য। জারি ও সারিগানের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল এগুলি ঠাস্‌বুননো ছন্দে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে। ভাটিয়ালি গানের মতো ছন্দহীন মন্থরগতি এদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। ভাটিয়ালি ও সারি- দুই গানই মাঝিরা গেয়ে থাকে, কিন্তু এদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় সুর ও তালে। ভাটিয়ালি গান গায় এক জন,এর ভাবও হয়ে থাকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং নির্জন পরিবেশের নির্লিপ্ত সুর এই গানে এক গভীর ধ্যানের সৃষ্টি করে । বিরহ ভাবই এই গানের সুরে প্রাণ খুঁজে পায়। আর সারিগান বহুজনের সম্মিলিত কণ্ঠ সংগীত বলে এবং বিশেষ ছন্দোবদ্ধ কাজের সঙ্গে সংযুক্ত বলেই এর মধ্যে তাল কেবল অপরিহার্যই নয় বিচিত্রতায় সমৃদ্ধ।

সারিগানের মতো জারিগানও সুর ও তালপ্রধান। যারা জারিগান পরিবেশন করে অর্থাৎ জারিয়াল দলের প্রত্যেক সদস্যই পায়ে নুপুর ব্যবহার করে এবং নুপুরের তালের সঙ্গে সঙ্গে তালরক্ষা করে চলে।তবে বিষয়ানুসারে জারি গানের সুর এবং তাল কিছুটা পরিবর্তিত হয়। যেমন- সখিনার বিয়ে , ইমাম হোসেনের নিহত হওয়া , ইত্যাদি ঘটনা বর্ণনার সময় করুণ এবং কান্নাবিজড়িত সুরে দর্শক শ্রোতাকে বিমোহিত করা হয়।জারি গানের মতো ব্যথার সুর অন্য কোন গানে ধ্বনিত হয় নি।

কিশোরগঞ্জের লোকসংগীতের একটি প্রধান অংশ পারিবারিক বা ব্যবহারিক সংগীত। পরিবারের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব-পার্বণে কেবলমাত্র মেয়েদের দ্বারা এই সংগীত গীত হয় বলে এদের মেয়েলি গীতও বলা হয়। আচার-অনুষ্ঠান ব্যতীত স্বাধীন চিত্তবিনোদনের জন্য এই সংগীতগুলি কখনো গীত হয়না। তাই এই সংগীতগুলির আবেদন সমাজে খুব একটা নেই। অন্তঃপুরের মেয়েরা কেবল তাদেও নিজস্ব প্রয়োজনে এই গানগুলি রচনা করে থাকে। সেজন্য মেয়েলি গীতগুলি প্রায়ই নিরাভরণ হয়ে থাকে। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে "ইহার বহিরঙ্গে কোন অলঙ্কার নাই, ভাবের দিক দিয়াও বিশেষ কোন গভীরতা নাই .....যেখানে চিত্ত

Dhaka University Institutional Repository

বহিরঙ্গে কোন অলঙ্কার নাই, ভাবের দিক দিয়াও বিশেষ কোন গভীরতা নাই .....যেখানে চিত্ত বিনোদনের প্রয়োজন , সেখানেই অলঙ্কারের আবির্ভাব হয়; কিন্তু যেখানে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয়তার তাগিদ, সেখানে অলঙ্কার ভাব-স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়।ব্যবহারিক বা মেয়েলি গীত এই প্রকার ভাবযুক্ত।"(২)

পারিবারিক বা মেয়েলি গীতের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল , এই সমস্ত গানে ঐ সমাজের একটি চমৎকার চিত্র ফুটে ওঠে। ঐ অঞ্চলের পারিবারিক , সামাজিক নানা উৎসব-পার্বণাদির পরিচয় মেয়েলিগীতসমূহে দেখতে পাওয়া যায়।

কিশোরগঞ্জের লোকসংগীতের মধ্যে ঘাটু গান উল্লেখযোগ্য । ঘাটু গানগুলি উচ্চাঙ্গের প্রেম-সংগীত , এর বিষয়বস্তু প্রধানত রাধাকৃষ্ণের প্রেম ও বিরহ। ঘাটু গানগুলিতে উচ্চাঙ্গ সংগীতের বৈশিষ্ট্যাবলী বিদ্যমান থাকে। এ সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য "ঘাটু গানগুলি গাইবার একটি বিশেষ সুর আছে । সুরের অন্তরালে ইহার কথা গুলি প্রায়ই প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। সুরই ইহাতে প্রধান, কথা প্রধান নহে। সেই জন্য অধিকাংশ ঘাটু গানই পদান্তে মিল দেখিতে পাওয়া যায় না। মিলের ইহাতে প্রয়োজনও বোধ হয় না। কথাগুলি সুর করিয়া এমন ভাবে টানিয়া টানিয়া গাওয়া হয় যে , তাহাতে মিলের স্থানটিও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না।'(৩)

ঘাটুগানও নৃত্যসম্বলিত গান। কখনো ঘাটু বালক একাই নৃত্য-গীত পরিবেশন করে,আবার কখনো দলের অন্যান্য সহযোগীরা গান গায় আর ঘাটু বালক সে গানের তালে তালে নৃত্য পরিবেশন করে। নৃত্যের তালে তালে পরিবেশিত হয় বলে ঘাটু গানের তাল-লয় দ্রুত হয়ে থাকে।

ছড়া ঃ ছড়াকে লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম ধারা বলে মনে করা হয়।কারণ ছড়া হচ্ছে শিশুর হৃদয়ের আনন্দ ভান্ডার। ছড়ায় কথা ও সুর আছে কিন্তু সবসময় তা অর্থপূর্ণ হয়না,ভাব আছে ভাবের অখণ্ডতা নেই।সুর আর ছন্দের স্পন্দনই ছড়ার মূল আর্কষণ,ছড়ার অর্থ সন্ধান করা তাই অবান্তর মাত্র। কিশোরগঞ্জের লোকসাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল এখানকার ছড়া। ছড়ার মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলের মানুষের সুখ-দু:খ,আচার-আচরণ ও নানা রকম অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

ঘুম পাড়ানি ছড়া বা ছেলে ভুলানো ছড়াগুলি শিশুতোষ ছড়া হলেও এগুলির রচয়িতা শিশুর মা । তাই এই সমস্ত ছড়ায় শিশুকে ভুলানোর ছলে নারী মনের অনেক কথাই ব্যক্ত হয়ে যায়। ছড়ার বিষয়বস্তু বা বক্তব্য থেকেই নারী মনের ছাপ লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

নিন্দাওয়ালী মা গো
মোদের বাড়ী এসো
খাট নয় পালং নয়
পিঁড়ি পেতে বসো
বাটা ভরা পান দেবো
গাল ভরে খেয়ো॥

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য যে গ্রামের মেয়েরা কোন নতুন অতিথিকে পিড়ি পেতে বসতে দিয়ে , বাটা ভরা পান দিয়ে অভ্যর্থনা করে। ছড়াতে এর স্বরূপ দেখতে পাওয়া যায়।

ছেলে ভুলানো ছড়াগুলি মায়েদের রচনা বলে এর মধ্যে পরিণত বুদ্ধির ছাপ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ছেলে খেলার ছড়াগুলি অল্পবয়স্ক ছেলে মেয়ের মুখে মুখে রচিত হয় বলে এগুলি অর্থযুক্ত হয় না। ছন্দ এবং তাল রক্ষা করাই তাদের প্রধান উদ্দেশ্য । তালে তালে অনেক অসংলগ্ন কথা চলে আসে।

শিশু ভুলানো ছড়া, ছেলে খেলার ছড়া ব্যতীত আর এক প্রকার ছড়া আছে , যেগুলি মেয়েলি ছড়া বলে পরিচিত। নারী মনের সুখ-দুঃখ , আনন্দ- বেদনার কথা এই সমস্ত ছড়াসমূহে প্রকাশিত হয়।নারীর ব্যবহারিক জীবনের নানা দিকের কথা এই সমস্ত ছড়ায় বর্ণিত হয়।তাই এই ছড়াগুলিকে লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বলে দাবী করা যায়। এই সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য " ইহাদের সম্পর্কে একটি কথা এই যে , ইহাদের প্রকাশ অত্যন্ত সহজ ও প্রত্যক্ষ। ইহাদের আঙ্গিকের মধ্যে অনাবশ্যক জটিলতা নাই। আঙ্গিকের যে আবশ্যক বিস্তারের মধ্যে ছেলেভুলানো ছড়ার রস সৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহাদের সেই বিস্তার নাই বলিয়াই ইহাদের মধ্যে রস জমাট বাধিতে পারেনা। তথাপি ছড়ার স্বাভাবিক ধর্ম ইহাদের মধ্যে সকল সময় পরিত্যক্ত হয় না।"(৪)

কিশোরগঞ্জের কোন কোন ছড়াতে সমাজের চিত্র চমৎকারভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। জলাভূমিবেষ্টিত কিশোরগঞ্জে জেলে সম্প্রদায়ের উপস্থিতি লক্ষণীয়। এদের কথাও ছড়াসমূহে লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

শুনরে ভাই জাল্‌লুর দাদা
মাছ মারলা আধা মাধা
এখন বুঝি বউয়ের তোমার খরচ চলে না।
জাল্‌লুয়ার বাড়ী উচিতপুর,
মাছ মারে গা বাজিতপুর।
বেচে নিয়ে ফতেপুর,মূল্য চাইর আনা।

ডক্টর ওয়াকিল আহমদের মতে,ভাব,ভাষা,ছন্দ,রস,রুচি,রূপশৈলী মিলে ছড়ার নিজস্ব ভুবন সৃষ্টি হয়। লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখার মধ্যে এত বিচিত্র উপাদানের সমন্বয় লক্ষ্য করা যায় না। ইতোমধ্যে ছড়াসমূহের ভাব বা বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে। তবে সম্পুর্ণ ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা সব ছড়ায় থাকে না। কেবল অন্ত্যমিল রক্ষা করার জন্য অনেক সময় অবান্তর শব্দ জুড়ে দেওয়া হয়। তাই ভাবপ্রকাশে অসংলগ্নতা দেখা দেয়। তবে অসংলগ্নতা থাকলেও ছড়ার মূলরস উপলব্ধি করতে কখনো সমস্যা হয় না। ছড়ার মূল রস বলতে বাৎসল্য রসকে বোঝায়। এখানকার অধিকাংশ ছড়া শিশুতোষ ছড়া। এই ছড়াগুলিতে বাৎসল্য রসের ছড়াছড়ি লক্ষ্য যায়। তবে মেয়েলি ছড়াগুলিতে করুণ রসের আধিক্যই বেশী। যেমন–

মায়ে কান্দে,মাসি কান্দে, অক্কই ঘাটে বইয়া
মায়ের পেটের বইনে কান্দে পড়ে গড় গড়াইয়া।

হাস্যরসের উপস্থিতিও ছড়াসমূহে লক্ষণীয়। বিশেষকরে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ছড়াসমূহে হাস্যরসের প্রাধান্য থাকে। এসমস্ত ছড়ায় প্রতিপক্ষকে আঘাত করার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

Dhaka University Institutional Repository

উড়িগুড়া ঝন্‌ঝন্‌
জামাই আইয়ে তিনজন
জামায়ের নাম রইস্যা
জুতা মার কইস্যা।

তবে ব্যঙ্গাত্মক ছড়াগুলি নৈর্ব্যক্তিক বলে এখানে আঘাতের তীব্রতা প্রকাশ পায় না,কৌতুক ও রঙ্গ রসই প্রাধান্য পায়। ছড়ার ভাষা হয়ে থাকে সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা। অধিকাংশ ছড়ার রচয়িতা শিশু-কিশোর এবং মেয়েরা। তাই ছড়াসমূহের ভাষাও হয়ে থাকে তাদের মতো সহজ-সরল কিন্তু কোমল এবং মধুর।

ছড়ার প্রধান বৈশিষ্ট্য এর ছন্দে। স্বরবৃত্ত ছন্দকে সাধারণত ছড়ার ছন্দ বলে অভিহিত করা হয়। কিশোরগঞ্জে প্রাপ্ত অধিকাংশ ছড়াসমূহই এই ছন্দের অন্তর্ভুক্ত। এই ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য,এটি শ্বাসাঘাত প্রধান। এই জন্য একে শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দও বলা হয়।স্বরবৃত্তে রচিত ছড়ার ছন্দ গতিশীল ও শ্রুতি সুখকর।

ছড়ার যেমন নির্দিষ্ট ভাব-ভাষা-রস-রুচি ও ছন্দ রয়েছে তেমনি আছে নির্দিষ্ট রূপ ও গঠন প্রকৃতি। বিভিন্ন ছড়ায় ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও গঠন প্রকৃতি দেখতে পাওয়া যায়।কোন কোন সময় ছড়া রচয়িতা নিজের মনের সুখ-দু:খের কথাগুলি নিজেই ব্যক্ত করে থাকে।যেমন-

কত পোড়া পুড়লো গো আল্লাহ্‌
পুড়াইয়া করলা ছাই
কার কাছে করবাম নালিশ
জগতে আর নাই।

সংলাপ বা প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে অনেক ছড়া রচিত হয়।এই সমস্ত ছড়ায় একজন প্রশ্ন করে এবং অন্যজন উত্তর দেয়।যেমন-

গাছুয়ারে গাছুয়া
গাছ কেরে?
বাঘের ডরে।
বাঘ কই?
মাডির তলে।

এই সমস্ত ছড়ায় একটা অভিনয়ের ভাবও থাকে।মানুষ,মানবেতর প্রাণী ,এমনকি নৈর্সগিক বস্তুকে সম্বোধন করে অনেক ছড়া রচিত হয়েছে। স্ত্রী সমাজে প্রচলিত গো,লা ইত্যাদি সম্বোধনসূচক শব্দ এসমস্ত ছড়ায় ব্যবহার করা হয়। যেমন-

Dhaka University Institutional Repository

সই গো সই

নাইল্যা ক্ষেতে বই
নাইল্যা ক্ষেতে বইয়া বইয়া
দু:খের কথা কই।

ছড়ার শ্রুতিমাধুর্যের জন্য ছন্দলালিত্য ও ধ্বনিসৌন্দর্য অত্যাবশ্যক। চোখের তৃপ্তির জন্য চিত্রসৌন্দর্য এবং শ্রুতির জন্য ধ্বনিমাধুর্যের আবশ্যক হয়।এই শ্রুতিসুখকর ধ্বনিচেতনার জন্য ছড়ায় অন্ত্যমিল, অনুপ্রাস অলঙ্কার সৃষ্টি হয়।যেমন-

চিকা আইয়ে চিক চিকাইয়া
চাচা আইয়ে লাডি লইয়া
ধর চিকা মার চিকা
চিকার দাম পাঁচসিকা।

শব্দ বা শব্দগুচ্ছের পুনরুক্তি দ্বারা কোন কোন ছড়ার কায়া গঠন করা হয়।এই সমস্ত ছড়ায় একই শব্দ বা একই চরণ একাধিকবার ব্যবহার করা হয়েছে।যেমন-

যখন মেন্দির একটি পাতা ধরিছে
তখন সাধুর বিয়ার কুকিল ডাকিছে।
যখন মেন্দির দুইটি পাতা ধরিছে
তখন সাধুর বিয়ার কুলা কিনেছে।

সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন ঘটনাবলির আলোকে এসমস্ত ছড়া রচিত হয়েছে। নানারকম রসে সিক্ত কিশোরগঞ্জের ছড়াগুলিতে বিশিষ্টার্থক শব্দের ঝংকার,সুর,ছন্দ এবং অপূর্ব বাক্যশৈলী পাওয়া যায় যা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।এই জন্যে এখানকার ছড়াসমূহ স্বতন্ত্র সাহিত্যিক মর্যাদায় ভূষিত।

প্রবাদ-প্রবচন: লোকসাহিত্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য শাখা হল প্রবাদ-প্রবচন। ডক্টর ওয়াকিল আহমদের মতে,"প্রবাদের ব্যুপত্তিগত অর্থবিশেষ উক্তি বা কথন;'প্র' পূবর্ক 'বাদ'{বদ্ +অ}প্রবাদ।বদ্ ধাতুর অর্থ বলা।যেসব প্রাজ্ঞ উক্তি লোক পরম্পরায় জনশ্রুতিমূলকভাবে চলে আসছে,তা-ই প্রবাদ।"(৫)সমাজ জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলির আলোকে প্রবাদসমূহ রচিত হয়েছে বলে এর সামাজিক মূল্য অনেক বেশী। প্রবাদসমূহ যেমন অল্প কথায় অধিক ভাব প্রকাশ করে থাকে,তেমনি তা ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতেও সাহায্য করে। তাই সামাজিক মূল্যে সঙ্গে সঙ্গে প্রবাদসমূহের সাহিত্যিক মূল্যও উল্লেখযোগ্য। কিশোরগঞ্জে প্রাপ্ত প্রবাদ-প্রবচন সমূহে এই এলাকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় প্রতিফলিত হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার আলোকে সমাজের সাধারণ জনগণ প্রবাদসমূহ রচনা করেছিল। অশিক্ষিত গ্রাম্য জনসাধারণের রচনা হলেও প্রবাদসমূহের উপস্থিতি এখন কেবল গ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধনেই,গ্রামে-গঞ্জে-শহরে সর্বত্রই প্রবাদের সদর্প বিচরণ লক্ষ্য করা যায়।

এ সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য, "প্রবাদ লোক সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ততম বাহন। বিস্তৃত জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার পরিচয় ইহাতে একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যের মধ্যে সংহত হইয়া থাকে। সংক্ষিপ্ততা ও সার্বজনীন মানবিক ভিত্তির জন্যেই ইহা যেমন নিজস্ব সমাজের মধ্যে সহজেই ব্যাপক প্রচার লাভ করে,তেমনই

Dhaka University Institutional Repository

দেশান্তরেও ইহা সহজেই বিস্তার লাভ করিতে পারে। ইহাদের সংক্ষিপ্ততার গুণের জন্যই ইহারা নিরক্ষর লোক - সমাজের স্মৃতির উপর কোন অনাবশ্যক ভার স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইতে পারে না।অতি সংক্ষিপ্ততার জন্য ইহাদের অর্থবোধ কদাচ লুপ্ত হইতে দেখা যায় না। কারণ ইহারা নিরাভরণ বলিয়া ইহাদের অর্থ অত্যন্ত প্রত্যক্ষ।"(৬)

প্রবাদের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন- বক্রোক্তি ও রূপকই এর প্রধান অবলম্বন। প্রবাদ সাধারণত প্রত্যক্ষ ভাবে সমাজ- জীবনের কোন ঘটনা ব্যক্ত করার পরিবর্তে অপ্রত্যক্ষ ভাবে ব্যক্ত করে থাকে। যেমন-

১/ মরা গরুর গাঙ্গ দিগালে হাতার।

২/ কি গাঁয়ের গাঁ , অর্ধেকটা নামা পাড়া।

প্রথম প্রবাদটিতে মরা গরু বলতে গরুকে বোঝানো হয়নি। বরং বোঝানো হয়েছে অতি তুচ্ছ , অপ্রয়োজনীয় কোন কিছুকে , যা কোন কাজে লাগে না কিন্তু সর্বত্র বিচরণ করে। দ্বিতীয় প্রবাদটিও কিছুটা প্রথমটির মতো। যে গ্রাম পরিধিতে ছোট , তার অর্ধেকটা আবার নীচু জমি । অর্থাৎ তুচ্ছ কোন বস্তুকে এখানে আরো তুচ্ছ করা হয়েছে।

কিন্তু সব প্রবাদের মধ্যেই এরূপ রূপক ও বক্রোক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা হয় না। কোন কোন প্রবাদে সমাজ জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতা সহজ ও প্রত্যক্ষ ভাষায় ব্যক্ত করা হয়। যেমন-

১/ যার শেষ ভালা , তার সব ভালা।

২/ বইয়া বইয়া যদি খায় , রাজার ভান্ডার ফুরায়ে যায়।

এখানে কোন প্রকার রূপক ও বক্রোক্তির ব্যবহার করা হয়নি। সহজ সরল নিরাভরণ ভাষায় মূল ভাব ব্যক্ত হয়েছে। প্রবাদে অনেক সময় শ্রুতিমধুর অনুপ্রাসের ব্যবহার করা হয়। যেমন-

অর্ধেক আচার , অর্ধেক বিচার।

কোন কোন প্রবাদে একটি শব্দের পুনরুক্তি দ্বারা উদ্দিষ্ট অর্থের উপর যেমন জোর দেওয়া হয় , তেমনি এর মধ্যে দিয়ে চমৎকার ধ্বনি মাধুর্যেরও সৃষ্টি করা হয়। যেমন-

নিম তিতা , নিশিন্দা তিতা
তিতা মাকাল ফল।
তার চাইতে অধিক তিতা
বোন সতীনের ঘর॥

তবে সাহিত্যমূল্যের চেয়ে বক্তব্যপ্রদানই প্রবাদের মূল উদ্দেশ্য। বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রবাদ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জীবনের নানা খুঁটিনাটি দিককে চমৎকার ভাবে উপস্থাপিত করে। সমাজ জীবনের বিভিন্ন দিক প্রবাদের মধ্যদিয়ে প্রতিফলিত হয়। কিশোরগঞ্জ জেলার অধিকাংশ মানুষ কৃষিজীবী। তাই কৃষি এবং কৃষক জীবনের সাথে জড়িত অনেক প্রবাদ এ অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন–

Dhaka University Institutional Repository

১.সোম শুক্র পরে শাড়ী
ধান হয় আড়াআড়ি।
২.জল ভালা ভাসা
মানুষ ভালা চাষা।
৩.বৈশাখে বুনা,আষাঢ়ে রোয়া
জায়গা হয়না ধান থুয়া।

এমন অনেক প্রবাদ আছে যা এ অঞ্চলের ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে রচিত। তবে অধিকাংশ প্রবাদেই অঞ্চলভেদে পাঠান্তর হয়ে থাকে। সুদূর প্রাচীনকাল থেকে সমাজে প্রবাদ ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং বর্তমানকালেও এর আবেদন অব্যাহত আছে। সমকালের প্রয়োজনীয়তা না থাকলে প্রবাদ কেন,লোকসাহিত্যের যেকোন শাখাই বিলুপ্ত হয়ে যাবে।যে সমাজে এরূপ প্রবাদের জন্ম হয়েছে এবং এর ব্যবহারও অব্যাহত আছে,সে সমাজ প্রাণপ্রাচুর্য ও ভাষাসৌন্দর্যে সমৃদ্ধ বলে ডক্টর ওয়াকিল আহমদের অভিমত।

ধাঁধা : ধাঁধা লোকসাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য শাখা। প্রবাদের মতো ধাঁধাও রূপক এবং বক্রোক্তির আড়ালে লুকায়িত থাকে। " ধাঁধা একটি সংশয়াচ্ছন্ন প্রশ্ন। বর্ণনার কৌশলে রহস্যময় বাগবরন রচনা করা হয়। রূপক , সংকেত , উপমা , তুলনা , অতিশয়োক্তি , শ্লেষ ইত্যাদির সাহায্যে রহস্যপূর্ণ প্রশ্ন রচনা করা হয়। প্রশ্ন ও উত্তর মিলে ধাঁধা পূর্ণাঙ্গ হয়।"(৭)

হাত নাই পাও নাই
গড় গড়াইয়া যায়
কাটলে তার মাংশ নাই
সর্ব লোকে খায়। (পানি)

এর উত্তর পানি । এর উত্তরটি রূপকের আড়ালে আচ্ছাদিত বলে , এর উত্তর দাতাকে গভীর চিন্তা করে উত্তর দিতে হয়। ধাঁধা বলায় বুদ্ধির সাথে কল্পনার মিশ্রণ দরকার হয়। কিন্তু এখানে আবেগের কোন স্থান নেই ।এ জন্য ধাঁধার অবয়ব দীর্ঘ হয় না। দুই থেকে চার চরণের মধ্যে সমাপ্ত হয়। যেমন-

এক ঘরে বাস করি মোরা শত ভাই
এক মায়ের গর্ভ হইতে হই সবে বাইর
সজোরে আঘাত করি মায়ের শরীর
আগুন ধরাইয়া করি নিজেরে জাহির॥{দিয়াশলাই}

কোন কোন ধাঁধা গদ্যাশ্রিত । সাধারণত গদ্যাশ্রিত ধাঁধা একটি বাক্যে সমাপ্ত হয়। যেমন-

কোন মাছের মাথা নাই? - কাঁকড়া।
কোন গাছের পাছা নাই? - সিজ।
কোন পাখীর ডিম নাই? - বাদুর।

Dhaka University Institutional Repository

"মনে হয় এই শ্রেণীর ধাঁধাই প্রাচীনতম। মধ্য ভারতের গড় কিংবা ছোট নাগপুরের ওরাওঁ উপজাতিদের মধ্যে ইহাদের নিজস্ব যে সকল ধাঁ ধা প্রচলিত আছে , তাহাও গদ্যে রচিত একেকটি এই প্রকার বাক্যে সম্পূর্ণ , ইহাতেও মিলের কোন প্রশ্ন নাই। অন্যান্য উচ্চতর জাতির ভাষা হইতে আধুনিক কালে ইহারা মিত্রাক্ষরযুক্ত ধাঁধা গ্রহণ করিয়াছে।"[(৮)

মিত্রাক্ষর প্রবণতা বাংলা লোকসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট ধর্ম । তাই ধাঁধা রচনার ক্ষেত্রে প্রায়ই অন্ত্যমিল রক্ষা করা হয়। যেমন-

উপরে পাতা নিচে দাড়ি
ইজ ছাড়া চলে গাড়ি।
অথবা
কান্দার উপরে কান্দা
লাল কাপর দিয়ে বান্দা।

উল্লিখিত ধাঁধাগুলিতে অন্ত্যমিল রক্ষা ছাড়াও অনুপ্রাসের চমৎকার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তবে গদ্যাশ্রিত ধাঁধাসমূহে এধরনের ছন্দ বা অন্ত্যমিল থাকে না। কিন্তু সেসমস্ত ধাঁধায় বুদ্ধির ও কল্পনার মিশ্রণ থাকায় তা কখনোই শুষ্ক প্রশ্নোত্তরে পরিণত হয় না। বরং রূপক প্রতীক চিত্রকল্পের গুণে তা যথেষ্ট কৌতুহলোদ্দীপক ও রসধর্মী রচনার রূপ ধারণ করে।ডক্টর ওয়াকিল আহমদের মতে, শুক্তির মধ্যে যেমন মুক্তা প্রচ্ছন্ন থাকে , রূপক - প্রতীক -চিত্রকল্পের মধ্যে তেমনি 'উত্তর' প্রচ্ছন্ন থাকে। বুদ্ধি , কল্পনা , কৌতূহল , আনন্দ এবং রসবোধ মিলে ধাঁধায় একটি শিক্ষিত মনের ছাপ বিরাজ করে।

লোক-কাহিনী ও কিংবদন্তি : কিশোরগঞ্জের লোকসাহিত্যে লোককাহিনী ও কিংবদন্তি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।গল্প বলা বা গল্প শোনার প্রবণতা এই এলাকার মানুষের দীর্ঘ দিনের রীতি।এখানকার মানুষ অবসর বিনোদনের উপায় হিসাবে এই সমস্ত কিস্‌সা-কাহিনীর শ্মরণাপন্ন হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে,কিশোরগঞ্জ একটি ঐতিহাসিক জনপদ।তাই এই এলাকার কাহিনীগুলিতে ঐতিহাসিকতার ছাপ লক্ষ্য করা যায়। জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানদের বিভিন্ন কার্যকলাপ এখনো কাহিনী আকারে লোক মুখে শোনা যায়।

ঐতিহাসিকতা,রূপকথাধর্মিতা ছাড়াও এখানকার লোককাহিনীর আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল সরলতা।খেটে খাওয়া সহজ-সরল মানুষের জীবনের নানা ঘটনা কাহিনীগুলিতে ফুটে উঠেছে।সরলতাই এই সমস্ত কাহিনীর প্রধান সম্পদ।প্রকৃতির মতোই সে সকল জটিলতাকে আত্মসাৎ করে সবুজ-সরল হয়ে ওঠে।

কিশোরগঞ্জের বিভিন্ন জলাশয়,স্থান ও তীর্থকে কেন্দ্র করে অসংখ্য কিংবদন্তি প্রচলিত আছে।ঐতিসিক জনপদ কিশোরগঞ্জে একসময় রাজা-রাণী,বাদশা,নবাব,দেওয়ান সাহেবদের সদর্প বিচরণ ছিল। তাদের ব্যক্তিগত জীবন ও পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীকে কেন্দ্রকরে সৃষ্টি হয়েছে নানা কিংবদন্তির। এই সমস্ত কিংবদন্তিগুলিকে এলাকার জনগণ বুকের ধনের মতো আজোও আগলে রেখেছে। স্বপ্নচারিতায়, অলৌকিকতায় এই কিংবদন্তিগুলি আড়ষ্ট হলেও,অসংখ্য মানবিক আলো সেখানে নৃত্যপর। বৃহৎ কিছু ত্যাগের মাধ্যমে মহৎ কিছুর প্রাপ্তির আনন্দ সেখানে কথারূপ পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১.আশুতোষ ভট্টাচার্য,বাংলার লোক-সাহিত্য,১ম খণ্ড,পৃ:৬৭৫
২.আশুতোষ ভট্টাচার্য,বাংলার লোক-সাহিত্য,১ম খণ্ড,পৃ:২২৯ এবং২৩০
৩.আশুতোষ ভট্টাচার্য,বাংলার লোক-সাহিত্য,১ম খণ্ড,পৃ:২৯৫
৪.আশুতোষ ভট্টাচার্য,বাংলার লোক-সাহিত্য,১ম খণ্ড,পৃ:১১৮
৫.ওয়াকিল আহমদ,বাংলা লোক সাহিত্য প্রবাদ-প্রবচন,বাংলা একাডেমী,পৃ:১২
৬.আশুতোষ ভট্টাচার্য,বাংলার লোক-সাহিত্য,পৃ:৫৮৬
৭.ওয়াকিল আহমদ,বাংলা লোক সাহিত্য ধাঁধা,বাংলা একাডেমী।
৮.আশুতোষ ভট্টাচার্য,বাংলার লোক-সাহিত্য,পৃ:৫৩৭

Dhaka University Institutional Repository

৭. উপসংহার

লোকসাহিত্য একটি জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। লোকমুখে সৃষ্ট এ সাহিত্য কেবল মানুষের স্মৃতির উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে এবং পুরুষানুক্রমে প্রচারিত এবং প্রসারিত থাকে। অর্থাৎ কোন সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠীর অলিখিত সাহিত্যই লোকসাহিত্য। লোকজীবন সম্পৃক্ত ভাব-ভাবনা,চিন্তা-চেতনা,ধ্যান-ধারণা,আচার-আচরণ,বিশ্বাস-সংস্কার এর মৌলিক বিষয়।

নদীমাতৃক বাংলাদেশ লোকসাহিত্যের একটি সমৃদ্ধ সুতিকাগার। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি জেলায় তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে জন্ম নিয়েছে এই লোকসাহিত্য এবং উক্ত সাহিত্য সেই নির্দিষ্ট জেলার ভৌগোলিক এবং সামাজিক অবস্থান দ্বারা প্রভাবিত। সাধারণ মানুষের সুকুমার হৃদয়বৃত্তির এই সমৃদ্ধ সমাহার বিভিন্ন জেলার বৈচিত্রময়তাকে ধারণ করে আছে। তাই অঞ্চলভেদে লোকসাহিত্যসমূহ হয়ে থাকে ভিন্ন এবং স্বাতন্ত্র্যধর্মী।

কিশোরগঞ্জের লোকসাহিত্য শুধু এই অঞ্চলকেই নয়,সমগ্র বাংলাদেশ তথা বাংলা ভাষাভাষী প্রতিটি মানুষকেই আত্মমর্যাদার গৌরবে সিক্ত করেছে। এখানকার লোকসাহিত্য প্রকৃত অর্থেই লোকসাহিত্য ধারার এক সুস্পষ্ট প্রবাহ। কি বিষয়বস্তুর বৈচিত্রে,কি প্রকরণগত শৈলীতে এই অঞ্চলের সাহিত্য চিরায়ত আবেদনের উৎস। কিশোরগঞ্জের সমৃদ্ধ ইতিহাস,এর বহুমাত্রিক মানবসংস্কৃতি আর এর দিগন্তপ্রসারী সহজ-সরল প্রকৃতি এইসব লোকসাহিত্য সৃষ্টির সূতিকাগার হিসাবে কাজ করেছে।

কিশোরগঞ্জের লোকসাহিত্যের সবচেয়ে প্রোজ্জল সংগ্রহ এর গীতিকাসমূহ। কাহিনীর বুননে,বর্ণনার সারল্যে,কাব্যময়তার সৌকর্যে,চরিত্র-চিত্রণের নিপুণতায় এই গীতিকাগুলি শুধু কিশোরগঞ্জের নয়, সমগ্র বাংলাসাহিত্যের অনুপম নিদর্শন হিসাবে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। এইসব গীতিকায় তৎকালীন সংগ্রামী মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযুদ্ধ,ধর্মীয় গোঁড়ামীমুক্ত উদার মানবিকতা ও স্বাধীন নারীসত্তার যে পরিচয় মেলে সমগ্র বাংলাসাহিত্যে তার তুলনা বিরল। তবে শুধু আর্থ সামাজিক বা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের বিচারেই নয়,নিখাদ সাহিত্যবিচারেও এই গীতিকাসমূহ বাংলা সাহিত্যের অনবদ্য সৃষ্টি হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। বর্তমান অভিসন্দর্ভে তাই গীতিকাসমূহের আলোচনাই প্রাধান্য পেয়েছে।

কিশোরগঞ্জের গীতিকাসমূহের উজ্জলতম দিক হচ্ছে নারী চরিত্রসমূহ।ব্যক্তিত্বে-বলিষ্ঠতায়,প্রেম-ভালবাসায়, একনিষ্ঠতায় এ সকল নারীচরিত্র বিরল বৈশিষ্ট্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। গীতিকায় প্রতিফলিত সমাজব্যবস্থায় নারী চরিত্রসমূহের সদর্প উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তবে তাদের এই উপস্থিতি কোথাও অন্যায়-অবিচারকারী হিসাবে নয়,বরং ত্যাগে তিতিক্ষায় ও আত্মদানের গৌরবময়তায় সিক্ত এ নারীগণ বিশিষ্টতা অর্জন করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

কিশোরগঞ্জের গীতিকাসমূহে এই অঞ্চলের সামাজিক,সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় জীবনের পরিচয় বিধৃত হয়েছে। গীতিকায় প্রতিফলিত জনসমাজ সুদুর অতীতকাল থেকেই অতি যত্নের সাথে সাহিত্য ও সংস্কৃতির লালন করে আসছে। জলাভূমিবেষ্টিত দুর্গম অরণ্যাঞ্চল বহি:শত্রুর আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকায় এখানে ধর্মীয় স্থিতিশীলতা বিরাজ করেছিল। তাই গীতিকাসমূহে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রতিফলন ঘটেছে। গীতিকাসমূহের মধ্যদিয়ে এই অঞ্চলের মানুষের সামাজিক আচার-আচরণ,ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় বিধৃত হয়েছে বলে এর সামাজিক মূল্য অপরিসীম।

সামাজিক মূল্যের সাথে সাথে গীতিকাসমূহের সাহিত্যিক মূল্যও বিচার্য। গীতিকাগুলিতে পল্লীকবিগণ অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়েছেন। আখ্যান ও ঘটনাবিন্যাস,চরিত্র-চিত্রণ,অলংকার প্রয়োগ ও অপূর্ব শব্দশৈলীর প্রয়োগের মধ্য দিয়ে পল্লীকবিগণ যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন মধ্যযুগের কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল।গীতিকাগুলিতেই সাহিত্যসৃষ্টির বিভিন্ন উপকরণ এবং প্রকরণের সার্থক প্রয়োগ সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। নিরক্ষর কবিগণ অত্যন্ত সহজ-সরল,অমার্জিত ভাষার মধ্য দিয়েই অপূর্ব কাবনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখাসমূহ কি বিষয়বস্তুর আবেদনে,কি কাব্যমূল্যে এই গীতিকাসমূহের তুলনায় অনেক ম্লান।

কিশোরগঞ্জের লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখা নিয়েও বর্তমান গবেষণায় আলোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে লোকসংগীত,ধাঁধা,ছড়া,প্রবাদ,প্রবচন,লোককাহিনী এবং কিংবদন্তিই প্রধান।এই সমস্ত শাখাসমূহের পরিচয় প্রদানের মধ্য দিয়ে কিশোরগঞ্জের লোকসাহিত্যের বহুমাত্রিক সৃষ্টিশীলতার বিষয়টি পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এসব সৃষ্টি দীর্ঘদিন যাবত এই অঞ্চলের মানুষের সহজ,স্বতস্ফূর্ত বিনোদনের খোরাক জুগিয়ে আসছে। বর্ণনার সারল্যে এবং বক্তব্যের চাতুর্যে এগুলি বাংলা লোকসাহিত্যের মূল্যবান উপকরণ হিসাবে গন্য হবে। এই সাহিত্যসমূহের গড়ন,লালন-পালন কিশোরগঞ্জের মাটি ও প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকেই উদ্ভূত।

কিশোরগঞ্জের লোকসাহিত্যের সুবিস্তৃত চারণ ভূমিতে অনুসন্ধিৎসু গবেষকের পদচারণা তেমন একটা ঘটেনি। সমাজ ও প্রকৃতি সঞ্জাত এই লোকসাহিত্যের সৃষ্টি যেমন স্বতস্ফূর্ত ও সহজ,এ নিয়ে গবেষণাধর্মী আলোচনা ততটাই শ্রমসাধ্য ও জটিল। একদিকে থাকে অধুনাবিস্মৃত অতীত জনপদের জীবনচিত্রের যথার্থ অন্বেষণের তাড়না,অন্যদিকে প্রায় হারিয়ে ফেলা সাহিত্যকর্মের নমুনার প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্তের অপর্যাপ্ততা এবং অতীত ও বর্তমানের মধ্যে এক অবোধ্য অন্তরাল। ফলে যে উৎসাহ ও প্রেরণা নিয়ে এই দুর্গম অঞ্চলে গবেষকের অনুপ্রবেশ ঘটে,অবগুণ্ঠিত অতীতের অস্পষ্টতা এবং তাকে উদ্‌ঘাটনের তাড়নাসৃষ্ট এক বুদ্ধিবৃত্তিক টানাপোড়নে পড়ে সেই উৎসাহকে অনেক সীমাবদ্ধতার সাথে আপোষ করতে হয়।

বর্তমান গবেষণাও এর ব্যতিক্রম নয়। কিশোরগঞ্জের লোকসাহিত্যের ভাণ্ডর অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট। এ কথা সত্য যে, কিশোরগঞ্জের লোকসাহিত্য বিষয়ে বর্তমান গবেষণায় যে সকল প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে তাতে কিছুটা অসম্পূর্ণতা রয়েছে। অনেকক্ষেত্রে প্রাপ্ত তথ্যের অভাবে বক্তব্য কিছুটা খণ্ডিতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। তবে এই সব সীমাবদ্ধতার পাঁচিল টপকে বাংলা লোকসাহিত্যের উজ্জ্বল দীপাবলী কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের লোকসাহিত্য নিয়ে উক্ত অভিসন্দর্ভে অনুপুঙ্খ আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি (মূলগ্রন্থ)

মৈমনসিংহ গীতিকা :শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন,রায় বাহাদুর,বি.এ.,ডি.লিট. কর্ত্তৃক সঙ্কলিত,কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩

পূর্ব্ববঙ্গ মৈমনসিংহ-গীতিকা, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা :শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন,রায় বাহাদুর,বি.এ.,ডি.লিট্.,কর্ত্তৃক সঙ্কলিত,প্রথম সংস্করণ,গতিধারা, ৩৮/২-ক বাংলাবাজার,ঢাকা, ২০০০

পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা,তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা : রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন ডি.লিট্.কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং সম্পাদিত,কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৯৩০

প্রাচীন পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা,সপ্তম খণ্ড : সম্পাদক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক,ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা- ১২, ১৯৭৫

মোমেনশাহী গীতিকা : সম্পাদনায় বদিউজ্জামান,বাংলা একাডেমী,ঢাকা, ১৯৭১

সহায়ক গ্রন্থ

আতোয়ার রহমান : লোকসাহিত্যের কথা,বাংলা একাডেমী,ঢাকা,১৯৭৬

আশরাফ সিদ্দিকী : লোকসাহিত্য,১ম খণ্ড, ষ্টুডেন্ট ওয়েজ,১ম প্রকাশ,১৯৬৩

: কিংবদন্তির বাংলা,খান ব্রাদারস্ এন্ড কোম্পানী,১৩৮২

: কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী ১ম খণ্ড, ১৯৬৫ ও ২য় খণ্ড, ১৯৯৫ বাংলা একাডেমী।

আশুতোষ ভট্টাচার্য :বাংলার লোক-সাহিত্য,১ম খণ্ড, ৩য় সংস্করণ,ক্যালকাটা বুক হাউজ,কলিকাতা, ১৯৬২

ওয়াকিল আহমদ : বাংলা লোকসাহিত্য প্রবাদ-প্রবচন,বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪

: বাংলা লোকসাহিত্য ধাঁধা,বাংলা একাডেমী,ঢাকা, ১৯৯৫

: বাংলা লোকসাহিত্য:ছড়া,বাংলা একাডেমী,১৯৯৮

: বাংলার লোক-সংস্কৃতি,বাংলা একাডেমী,১৯৭৪

Dhaka University Institutional Repository

ওহীদুল আলম : চট্টগ্রামের লোকসাহিত্য,বাংলা একাডেমী,ঢাকা,১৯৮৫

কেদারনাথ মজুমদার : ময়মনসিংহের ইতিহাস ও ময়মনসিংহের বিবরণ,পুনমুদ্রণ,জেলা পরিষদ, ময়মনসিংহ,১৯৮৭

খালেক মাসুকে রসুল : নোয়াখালীর লোকসাহিত্য,লোকজীবনের পরিচয়, বাংলা একাডেমী,১৯৯২

জীবন চৌধুরী : পূর্ব ময়মনসিংহের ছড়া,বাংলা একাডেমী,ঢাকা,১ম প্রকাশ নভেম্বর ১৯৯৩

মনিরুজ্জামান : লোকসাহিত্যের ভিতর ও বাহির,গতিধারা,ফেব্রুয়ারী-২০০০

মুহাম্মদ আবদুল জলিল : লোকসাহিত্যের নানাদিক,বাংলা একাডেমী,১ম প্রকাশ নভেম্বর ১৯৯৩

মুহাম্মদ সিরাজ উদ্দীন : বাংলাদেশের লোক ধাঁধা,বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি:চট্টগ্রাম,২০০০

মুহাম্মদ হানিফ পাঠান : বাংলা প্রবাদ পরিচিতি,১ম খণ্ড,১৯৭৬ ও ২য় খণ্ড ১৯৮৫ বাংলা একাডেমী।

মোহাম্মদ শহীদুর রহমান : ময়মনসিংহ গীতিকায় নারীচরিত্রের স্বরূপ,বাংলা একাডেমী,ঢাকা।

মোহাম্মদ সাইদুর : বাংলা একাডেমী ফোকলোর সংকলন:৪৫, ১৯৮৫ ও ৪৯:১৯৮৮
: কিশোরগঞ্জের ইতিহাস,জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৯৩

মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী : লোকসাহিত্যে ছড়া,বাংলা একাডেমীর পক্ষে আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৬২

মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ : বাংলাদেশের লোককাহিনী,সংগৃহীত ও সম্পাদিত, গ্রন্থ সুহৃদ প্রকাশনী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : লোকসাহিত্য,বিশ্বভারতী,কলিকাতা, ১৯৬৪

রওশন ইজদানী : মোমেনশাহীর লোকসাহিত্য, বাংলা একাডেমী,ঢাকা, ১৩৬৪বাং

শীলা বসাক : বাংলা ধাঁধার বিষয়বৈচিত্র ও সামাজিক পরিচয়,কলিকাতা, ১৯৯৪

সৈয়দ আজিজুল হক : ময়মনসিংহ গীতিকা জীবনধর্ম ও কাব্যমূল্য,বাংলা একাডেমী, ১৯৯০